MA-09-BENG-3.3

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
**Gauhati University**
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
**Institute of Distance and Open Learning Learning**

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
**M. A. in Bengali**

তৃতীয় ষাণ্মাসিক

তৃতীয় পত্র **(Paper : 3)**
আধুনিক সাহিত্য-১

## বিষয়সূচী (Contents)

**পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)**

বিভাগ - ১ : পলাশির যুদ্ধ — নবীনচন্দ্র সেন

বিভাগ - ২ : সধবার একাদশী — দীনবন্ধু মিত্র

বিভাগ - ৩ : বিবিধ প্রবন্ধ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(শকুন্তলা-মিরণ্ডা-দেসদিমোনা, বঙ্গদেশের কৃষক, বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন, জয়দেব-বিদ্যাপতি)

বিভাগ - ৪ : কৃষ্ণকান্তের উইল — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**Contributor :**

| | |
|---|---|
| Dr. Sanjay De<br>(Units: 1, 2, 3 & 4) | Department of Bengali<br>Nowgong College, Nagaon |
| Dipanwita Paul<br>(Units: 5, 6, 7 & 8) | Subject Teacher<br>Bengali H.S. School, Guwahati |
| Dr. Binita Rani Das<br>(Units: 9, 10, 11 & 12) | Department of Bengali<br>Gauhati University, Guwahati |
| Dr. Kantar Bhusan Nandi<br>(Units: 13, 14, 15, 16 & 17) | Department of Bengali<br>L.O.K.D. College, Dhekiajuli |

**Course Co-ordination :**

| | |
|---|---|
| Prof. Kandarpa Das | Director, GUIDOL |
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |
| Dipankar Saikia | Editor Study Material<br>GUIDOL |

**Content Editing :**

| | |
|---|---|
| Dr. Amalendu Chakrabarty | HOD, Dept. of Bengali<br>Gauhati University |

**Proof Reading & Language Editing :**

| | |
|---|---|
| Sanjoy Chandra Das | Assistant Professor<br>Department of Bengali<br>Pandu College, Guwahati |

**Format Editing :**

| | |
|---|---|
| Dipankar Saikia | Editor Study Material<br>GUIDOL |

**Cover Page Design**

Bhaskar Jyoti Goswami GUIDOL

ISBN : 978-93-84018-71-9

November, 2014

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset, Mirza, Copies printed 500.

**Acknowledgement**

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

# পত্র পরিচিত

তৃতীয় যাণ্মাসিকের তৃতীয় পত্রে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে উনিশ শতকের সাহিত্য স্থান পেয়েছে। এই উনিশ শতকের বিপুল সাহিত্য-সম্ভারের মধ্য থেকে পড়তে হবে মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ, একটি উপন্যাস, একটি নাটক এবং একটি প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ। বিভাগ বা অধ্যায়কেন্দ্রিক আলোচনায় অংশগ্রহণের আগে আসুন, আমরা উনিশ শতকের সাহিত্য অধ্যয়ন এবং পঠন-পাঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটির সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করে নিই।

গোটা উনিশ শতক জুড়ে ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। বলতে গেলে অষ্টাদশ শতকে ক্লাইভের কূটবুদ্ধি ও সামরিক শক্তির কাছে নতজানু হয়েছিল নবাব সিরাজদ্দৌলার শক্তি। তখনই ভারতবর্ষের মানুষ ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাভব স্বীকার করে তাদের পদানত হয়ে গিয়েছিলেন। পরাধীন হয়ে থাকার যন্ত্রণা সেদিন সমগ্র ভারতবাসীকেই মর্মাহত করেছিল। ব্রিটিশের রক্তচক্ষুর হাত থেকে মুক্তি পেতে চলছিল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। উনিশ শতকে তারই প্রতিফলন ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহ। জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত হল স্বদেশপ্রেমের বোধ। সাহিত্যেও তার ছাপ পড়ল। রাজনৈতিকভাবে ইংরেজ-শাসন উনিশ শতকের ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজকে যেমন প্রভাবিত করেছিল, তেমনি পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ মদতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক কিছু ক্রিয়া, আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনযাপনেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বাঙালির সমাজসংস্কার, ধর্মচেতনার বিপ্লবী পরিবর্তন, শিক্ষার বৈজ্ঞানিকীকরণ, মানবসেবা, চেতনার আধুনিকতা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাদেশিকতা এবং বাংলা সাহিত্যের রূপ-রীতি-ভাববস্তুর অভূতপূর্ব পরিবর্তন গোটা উনিশ শতক ধরে ঝড়ের বেগে বয়ে গেছে। আপনারা এই তৃতীয় সান্মাসিকের তৃতীয় পত্রে তারই কিছু রূপ পাঠ্যান্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলোত খুঁজে পাবেন। এবার আমাদের পাঠ্য-বিষয়ের বিভাগগত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক —

**বিভাগ - ১** : **পলাশির যুদ্ধ — নবীনচন্দ্র সেন**

**বিভাগ - ২** : **সধবার একাদশী — দীনবন্ধু মিত্র**

**বিভাগ - ৩** : **বিবিধ প্রবন্ধ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

**(শকুন্তলা-মিরণ্ডা-দেসদিমোনা, বঙ্গদেশের কৃষক, বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন, জয়দেব-বিদ্যাপতি)**

**বিভাগ - ৪** : **কৃষ্ণকান্তের উইল — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তা ছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক পত্রে আপনাদের ১০ নম্বরের দুটো, মোট ২০ নম্বরের (১০+১০=২০) প্রশ্নের উত্তর বাড়ি থেকে তৈরি করে (Home Assignment) পাঠাতে হবে। এছাড়া, বার্ষিক পরীক্ষায় আপনাদের ১২ নম্বরের ৫ টি প্রশ্ন (১২×৫=৬০) এবং ৫ নম্বরের ৪ টি প্রশ্নের (৫×৪=২০) উত্তর লিখতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার মূল্যমান ৮০ (৬০+২০=৮০) ।

আশা করি এই উপকরণসমূহ আপনাদের কাছে উপযোগী ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

# বিভাগ পরিচিত

তৃতীয় ষাণ্মাসিকের তৃতীয় পত্রের বিভাগ পরিচিতিতে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে আমাদের পাঠ্যান্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে সর্বমোট সতেরোটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম চারটি বিভাগে রয়েছে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য গ্রন্থের আলোচনা। বিভাগগুলি হল —

**বিভাগ - ১ : পলাশির যুদ্ধ : কবি পরিচিতি**

**বিভাগ - ২ : পলাশির যুদ্ধ : কাব্যের বিষয়বস্তু**

**বিভাগ - ৩ : পলাশির যুদ্ধ : চরিত্র বিচার**

**বিভাগ - ৪ : পলাশির যুদ্ধ : কাব্যমূল্যায়ন**

তারপর পরবর্তী আরও চারটি বিভাগে আমরা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। যেমন —

**বিভাগ - ৫ : সধবার একাদশী : দীনবন্ধু মিত্রের পরিচিতি ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি**

**বিভাগ - ৬ : সধবার একাদশী : কাহিনি বিন্যাস, ঘটনা সংস্থাপন,** climax, **নাট্য পরিণতি ও নাটক বিচার**

**বিভাগ - ৭ : সধবার একাদশী : চরিত্র বিচার ও হাস্যরস**

**বিভাগ - ৮ : সধবার একাদশী : সংলাপ ও সমাজ-চিত্র**

এরপর আরও চারটি বিভাগে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের আলোচনা —

**বিভাগ - ৯ : বিবিধ প্রবন্ধ : প্রসঙ্গ-কথা ও পটভূমি**

**বিভাগ - ১০ : বিবিধ প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ - ১**

**বিভাগ - ১১ : বিবিধ প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ - ২**

**বিভাগ - ১২ : বিবিধ প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ - ৩**

তারপর বাদবাকি পাঁচটি বিভাগে স্থান পেয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের আলোচনা —

**বিভাগ - ১৩ : কৃষ্ণকান্তের উইল : বঙ্কিম প্রতিভার সর্বোত্তম সৃষ্টি**

**বিভাগ - ১৪ : বঙ্কিম-মানসের দ্বৈততা, জটিলতা এবং কৃষ্ণকান্তের উইল**

**বিভাগ - ১৫ : 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা**

**বিভাগ - ১৬ : 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র চরিত্র বিচার**

**বিভাগ - ১৭ : 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শিল্পরীতি**

# বিভাগ-১
# পলাশির যুদ্ধ
## পলাশির যুদ্ধ : কবি-পরিচিতি

### বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১.২ নবীনচন্দ্রের কবিপরিচিতি
১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
১.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ১.০ ভূমিকা (Introduction)

নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব উনিশশতকের মধ্যপর্বে। সেসময় ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের বুকে জাঁকিয়ে বসার ফলে ভারতের সনাতন অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জেরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বদল দেখা যাচ্ছে। মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ আমূল উৎপাটিত করে নবজাগরণের ভাবাদর্শ প্রবল আলোড়ন তুলেছে সমাজে। সেই ক্রান্তিলগ্নে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। মধুসূদনের উত্তরসূরি ও হেমচন্দ্রের সমসাময়িক নবীনচন্দ্র উনিশ শতকের মহাকাব্যধারার কবি রূপে আখ্যাত। রামমোহন বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় অন্বিত উনিশ শতকের বাংলায় যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে তারই প্রভাবপুষ্ট সমাজ-সংস্কৃতির পটভূমিতে নবীনচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সিদ্ধিসন্ধান। নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্তি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রচনাধারাকে যে নতুন প্রবাহপথে চালিত করে সেই পথের প্রথম স্পষ্ট দিশারি মধুসূদন এবং মধুসূদনের অনুগামী নবীনচন্দ্রের সাহিত্যভাবনাতেও সেকারণে নবজাগরণের চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার অনিবার্য ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। সুতরাং নবীনচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির যথোচিত উপলব্ধি ও সঠিক মূল্যায়নের জন্য তাঁর সমসাময়িক প্রেক্ষিতটিকে জানা জরুরি। যে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে, যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট, নবীনচন্দ্র বাংলার বায়রন আখ্যা লাভ করেছিলেন সেই উপনিবেশিত সমাজমানসটিকে বোঝা জরুরি। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় মধ্যযুগীয় জাড্য ঘুচিয়ে উনিশশতকের বাঙালি জীবনে নতুন গতি সঞ্চারের জন্য দায়ী ছিল যে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি তার সম্যক পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক।

ব্রিটিশ ধনতন্ত্র এদেশে আসার আগে পর্যন্ত এদেশের গ্রামসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রক্ষণশীল স্থিতাবস্থা। কিছু বাহ্য অদলবদল হলেও অর্থনৈতিক ভিত্তিমূলের কোনও গুরুতর পরিবর্তন হয়নি। কারণ রাজরাজরার যুদ্ধবিগ্রহে রাজ্যের হাতবদল হলেও ভূমিস্বত্বের প্রায় কোনও রূপান্তর হয়নি। দীর্ঘযুগ ধরে ভারতীয় গ্রাম সমাজের এরকম অপরিবর্তিত রূপে টিঁকে থাকার প্রধান কারণ ছিল গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ আত্মনির্ভরতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্বিকার আত্মকেন্দ্রিকতা। এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই ভারতবর্ষের গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্থিতিশীলতা অটুট থাকার কারণ স্বরূপ মার্কস তাঁর *Capital* গ্রন্থে বলেছেন — সহজ সরল উৎপাদন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি। এঙ্গেলসের মতে প্রাচ্য দেশগুলিতে কৃষির অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মাটির উর্বরতাগুণের জন্য টেকনোলজিক্যাল উন্নতির বাস্তব তাগিদ ও উদ্যম দেখা যায় নি। টেকনোলজিক্যাল উন্নতির অর্থ উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন হাতিয়ারের উন্নতি। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন হাতিয়ারের উন্নতিজনিত উৎপাদনী শক্তিবৃদ্ধি হলে পরেই উৎপাদন সম্পর্ক অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু লৌহযুগ অর্থাৎ ঐতিহাসিক যুগের গোড়া থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের হাতিয়ারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এদেশে হয়নি বলেই অর্থনৈতিক কাঠামোরও কোনও উল্লেখযোগ্য বিকাশ দেখা যায়নি। সুতরাং যুগ যুগ ধরে অনড় অটল ভারতীয় সমাজকাঠামোর মূলে ছিল ক্রমবিকাশহীন উৎপাদনব্যবস্থা।

১৯ শতকে প্রথম ভারতের এই স্থবির আর্থসামাজিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের সামন্তপ্রথার ভিত শিথিল হয়ে পড়ে এবং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযোগী এক বাস্তব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অবশ্যই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রয়োজন পূরণের জন্য। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে — ভারতীয় কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি ও রফতানি, ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি ও বাজারিকরণ, কাঁচামাল ও পণ্য চলাচলের সুবিধার্থে যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, রেলপথ নির্মাণ ও আংশিক শিল্পায়ন ইত্যাদি সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণের মধ্যেই নিহিত ছিল ভারতে ধনতন্ত্র বিকাশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ। অর্থাৎ ব্রিটেনে যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে পরিবর্তিত উৎপাদনব্যবস্থার পরোক্ষ ফল হিসেবেই যদিও ভারতীয় আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয় তথাপি সেই পরিবর্তনের ফলেই ভারতবর্ষের সনাতন উৎপাদনব্যবস্থা নির্ভর গ্রামসমাজের অচলায়তনে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী ভাঙন দেখা দিল। যার অনিবার্য পরিণামে একদিকে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের পুরনো ছক বদলে গিয়ে সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। বংশমর্যাদা বা কুলগৌরবের নিরিখে শ্রেণি অবস্থান নিরূপণের পুরনো পদ্ধতি বদলে গিয়ে মুদ্রাপ্রাধান্য হয়ে উঠল সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নতুন মানদণ্ড। পুরুষানুক্রমে পাওয়া পারিবারিক কৌলীন্যের পরিবর্তে বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অর্জিত টাকা হয়ে উঠল আভিজাত্যের নতুন নির্ণায়ক। ফলে উনিশ শতকের প্রারম্ভে নতুন ধনিকশ্রেণি, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত

বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব হল। অন্যদিকে পুরনো ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের পরিবর্তে এক নতুন চিন্তাধারার সূচনা হয়; যার প্রধান অভিব্যক্তি ছিল উদারনৈতিক যুক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক আলফ্রেড ফন মার্টিনের *Sociology of the Renaissance* গ্রন্থে পাওয়া যায় — "the typological importance of the renaissance is that it marks the first cultural and social breach between the Middle Ages and Modern Times : it is a typical early stage of modern age." অর্থাৎ মধ্যযুগের থেকে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার সূত্রে আধুনিক যুগের যে স্ফুরণ তাকে রেনেশাঁস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯ শতক বাংলা তথা ভারতবর্ষের সেই সন্ধিকালীন সময় যখন মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের যুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুক্তির যুগ এসে হাজির হয়েছে। মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে ১৯ শতকের ভাবজগতে সেই বিচ্ছিন্নতার ফলে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলোড়ন হয় তাকেই বাংলার রেনেশাঁস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা; সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ বিষয়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলন; বিজ্ঞানশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার দাবি উত্থাপন; অন্ধ কুসংস্কার ও অন্যায় প্রথার বিরোধাচারণ; জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি সমাজ অনুমোদিত রীতিনীতি লংঘন; গোমাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি সমাজ-নিষিদ্ধ রীতিনীতি পালন; এই জাতীয় বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলার নবজাগরণ প্রকাশ লাভ করে। অবশ্য মানবতাই ছিল নবজাগরণের প্রধান প্রেরণা। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মে, বিদ্যাসাগরের সমাজসেবায়, অক্ষয় দত্তের তত্ত্ব আলোচনায়, মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চায় সেই মানবতারই অনন্য প্রকাশ। সেকালের সাহিত্যচিন্তাতেও যে নবজাগরণের ছাপ পড়েছিল তার সূচনা মধুসূদন দত্তের সাহিত্যকীর্তি। ১৯ শতকের নব্য মানবতার যে প্রাণ গঙ্গার উৎসমুখ রামমোহন-বিদ্যাসাগর তারই সাহিত্যিক প্রতিমা নির্মাণের সূত্রপাত মধুসূদনে। শুধু মধুসূদন নয় রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনাতেও সেই যুগলক্ষ্মণ স্পষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই অত:পর আমরা নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিপরিচয় আলোচনা করব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরে আধুনিক ইউরোপের আবির্ভাব হয়েছিল ভারতে। কারণ যে ইংরেজ বাণিজ্য করতে ভারতে এসেছিল ইতিপূর্বেই তাঁরা রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের পালাবদল প্রত্যক্ষ করেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা ও ফরাসি বিপ-ব সংক্রান্ত আধুনিকতার ঐতিহ্যও তাঁদের সঙ্গে ছিল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তা-চেতনার একটা ঢেউ এসে লেগেছিল ভারতে। আপামর জনসাধারণের মধ্যে না হলেও অন্তত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের

মধ্যে সেই আধুনিকতার ধ্যান-ধারণা একটা প্রবল আলোড়ন তুলেছিল এবং প্রধানত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যেই তার পরিসর সীমাবদ্ধ ছিল। এই সূত্রে উল্লেখ্য নবজাগরণের প্রধান অভিঘাত যদিও সেসময়ের ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যেই নিহিত ছিল তবুও আধুনিক ভাবনাচিন্তা প্রকাশের আরও একটি বড় ক্ষেত্র ছিল সাহিত্য। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগসাধনে বাংলা সাহিত্য নিশ্চিতভাবেই সংকীর্ণতার ঘেরাটোপ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল সেগুলি নির্দেশ করুন। (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২। নবজাগরণের চিন্তাচেতনা যে বহুবিচিত্র রূপে প্রকাশ লাভ করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি কবি নবীনচন্দ্র সেনের রচিত। আমরা প্রথম অধ্যায়ে কবি নবীনচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি-পরিচয় তুলে ধরব। কাব্যটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে তার কবিকে অল্পবিস্তর চেনা প্রয়োজন। বিশেষত উনিশ শতকের কবি, যাঁরা সচেতনভাবে যুগভাবনাকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁদের রচনায়, তাঁদের ব্যক্তিপরিচয় ও অবস্থানভূমি সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকলে তাঁদের কাব্য অনুধাবন করা সহজ হয়। সেকারণেই 'পলাশির যুদ্ধ' ব্যাখ্যা-বিশে-ষণের পূর্বে সে কাব্য-রচয়িতার জীবন ও কর্ম, ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা সংক্রান্ত একটি পূর্বপাঠ প্রাসঙ্গিক ও জরুরি।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কবি নবীনচন্দ্র ও তাঁর সমকালীন সময় সম্পর্কে আলোচনা করব, যাতে—

- আপনারা নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারেন।
- নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে পারেন।
- 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যরচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের মানসিকতা ও সেই যুগের প্রেক্ষাপটের মধ্যস্থিত সংযোগসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারেন।

## ১.২ নবীনচন্দ্রের কবিপরিচিতি

স্বাধীনতার ঠিক ১০০ বছর আগে এবং মহাবিদ্রোহের ঠিক ১০ বছর পূর্বে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের বাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রী গোপীমোহন রায় উপাধি ব্যবহার করলেও তারা ছিলেন বৈদ্যবংশীয় তাঁদের কুলপদবি ছিল সেন। নবীনচন্দ্রের মাতার নাম শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দেবী। তাঁর পিতা চট্টগ্রাম জজ আদালতের পেশকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে পরবর্তীকালে মুন্সেফ ও উকিল হয়েছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ির পর গ্রামের পাঠশালায় কিছুকাল পড়াশোনা করে নবীনচন্দ্র আট বছর বয়সে চট্টগ্রামের স্কুলে ভর্তি হন। ছোটবেলায় দুষ্টুমিতে খ্যাত নবীনচন্দ্র স্কুলে Wicked the great বা দুষ্ট শিরোমণি আখ্যা পেয়েছিলেন বলে নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন। অবশ্য দুরন্তপনা সত্ত্বেও তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে নবীনচন্দ্র বৃত্তিসহ প্রথমশ্রেণীতে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ফার্স্ট আর্টস শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বৃত্তি না পাবার জন্য তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্সটিটিউট অর্থাৎ বর্তমানের স্কটিশচার্চ কলেজের বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এফ.এ পরীক্ষার মাত্র একমাস আগে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মীকামিনী দেবীর বিয়ে হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ পাশ করেন।

বি.এ পাশ করার তিন মাস পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতা দান-ধ্যানে মুক্তহস্ত ছিলেন বলেই তাঁর যথেষ্ট অর্থ উপার্জন সত্ত্বেও প্রচুর দেনা আর সহায়সম্বলহীন একটি সংসারের দায়ভার নিতে হয় নবীনচন্দ্রকে। এই বিপদের দিনে আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য তো তিনি পানইনি উপরন্তু নানারকম পারিবারিক বিরোধ-বিবাদে পর্যদুস্ত ছিলেন। সে যুগে যাঁর সাহায্যের উদারহস্ত সকলের দিকে প্রসারিত ছিল সেই বিদ্যাসাগর অবশ্যই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন নবীনচন্দ্রের এই সংকট সময়ে। সংসারের ব্যায়ভার বহনে বিদ্যাসাগরের অর্থানুকূল্যের পাশাপাশি নবীনচন্দ্র ছাত্র পড়াতেন। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেবের সুপারিশে নবীনচন্দ্র একমাসের জন্য হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্তি পান। অতঃপর লেফটেনান্ট গ্রে সাহেবের সেক্রেটারি

স্ট্যান্সফিল্ডের অনুগ্রহে নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর পদে যোগদান করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদেই তাঁর ৩৬ বছরের চাকুরিজীবন অতিবাহিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি অত্যন্ত দক্ষ কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পদোন্নতি না হওয়ার অন্যতম কারণ তাঁর রচিত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের বিরুদ্ধে উত্থাপিত রাজদ্রোহিতার অভিযোগ। ইংরেজ প্রশাসন অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কাব্যটির অনুবাদ করে এবং অভিযোগ কিছু পরিমাণে সত্য বলেই তাঁদের ধারণা হয়। এমনকি ব্রিটিশ শাসকের চাপে পড়ে পরবর্তীকালে কাব্যের বিভিন্ন অংশ পরিবর্তনেও কবি বাধ্য হন। তথাপি নবীনচন্দ্রের গুণগ্রাহী উচ্চপদের কিছু সহৃদয় ইংরেজ কর্মকর্তার মহানুভবতায় তাঁর চাকুরি বজায় থাকল কিন্তু পদোন্নতির আর কোনও সম্ভাবনা রইল না। লেফটেনান্ট গভর্ণর Woodburn সাহেবের কাছে তিনি একবার পদোন্নতির আবেদন জানালে উত্তরে সাহেব বলেছিলেন — "You say you have a grievance against Government but Government has greater grievance against you. So long I remain Lieutenant Governor, there is absolutely no chance of your promotion. ১৮৭৭-এ তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর রূপে পুরীতে বদলী হন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলা সাহিত্যে যে সকল ব্যক্তি সরকারি চাকরির গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়দায়িত্ব, প্রশাসনিক চাপ, বহুবিচিত্র ব্যস্ততা এবং নানারকম বাধানিষেধের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের পাশাপাশি নবীনচন্দ্রের নামও উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় জীবনেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শ অনুসরণে নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনার সূত্রপাত। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় তিনি কবিতা লেখার সূত্রে শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্যারীচরণ সরকারের সঙ্গে পরিচিত হন। প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে নবীনচন্দ্রের কবিতা 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)। ১৮৭১-এ প্রথম কাব্যগ্রন্থ অবকাশরঞ্জিনী (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হওয়ার পরেই নবীনচন্দ্র যথাযথ কবিপরিচিতি লাভ করেন। অবকাশরঞ্জিনীর প্রথমভাগে ছিল ২১টি কবিতা। ৪৬টি কবিতা সহ অবকাশরঞ্জিনীর ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। অবকাশরঞ্জিনীর ২য় ভাগের অন্তর্গত 'ভারত উচ্ছ্বাস' কবিতাটি রানি ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আগমন উপলক্ষে লিখিত পৃথক ভাবে প্রকাশিত। এই কবিতাটি রচনার জন্য নবীনচন্দ্র ৫০ গিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন। নবীনচন্দ্র তিনটি আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন — 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) এবং 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)। তাঁর রচিত 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) তিনটি পৌরাণিক আখ্যানকাব্য; যেগুলিকে একত্রে ত্রয়ী কাব্য বলে এবং অনেকে একে মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে চান। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' (১৮৮৯), ও 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা' (১৮৮৯)-র তিনি পদ্যানুবাদ করেছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদ্যজীবনী নবীনচন্দ্র রচনা

করেছিলেন — 'খৃষ্ট' (১৮৯১), 'অমিতাভ' (১৮৯৫) ও 'অমৃতাভ' (১৯০৯) নামে। নবীনচন্দ্রের গদ্য রচনা তিনটি — প্রথম 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২), দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভানুমতী' (১৯০০), তৃতীয় 'আমার জীবন' (১৯০৮-১৯১৩) পাঁচখণ্ডে রচিত তাঁর অন্যতম আত্মজীবনী। নবীনচন্দ্র বিভিন্ন ধরনের কাব্য রচনা করলেও গীতিকবিতা রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। অবশ্য তাঁর নিজস্ব সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, আবেগ-অনুভূতির স্বগত ভাষণগুলি আত্মর সীমা অতিক্রম করে বিশ্বগত হতে পারে নি। বেশিরভাগ সময়েই আবেগবহুল উচ্ছ্বাসের বাহুল্যে ঢাকা পড়েছে লিরিকের ব্যঞ্জনাদ্যুতি।

নবীনচন্দ্র চারিত্রিক ভাবে কিছুটা বোহেমিয়ান ও ডনজুয়ানি স্বভাবের ছিলেন। সেকালের *The Englishman* পত্রিকায় বাবু নবীনচন্দ্রের দেহসৌষ্ঠব সম্পর্কে লেখা হয়েছিল — "He has the slim, oval face, the bright dark eyes, the gracious and proudly submissive manners of an Italian or Spaniard of good family." নিজের এই দেহ সৌন্দর্য, ইংরেজি বলার পারদর্শিতা, মহিলা মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জনে সক্ষমতা, 'বাঙাল' ভাষার পরিবর্তে খাঁটি কলকাতার ভাষা নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করতে পারা ইত্যাদি ব্যাপারে নবীনচন্দ্রের এক বিশেষ ধরনের আত্ম-অহংবোধ ছিল। নিজের সম্পর্কে এসব কথা স্পষ্ট ভাবেই তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, এমনকি তাঁর জীবনের অন্ধকার দিকগুলিকেও তিনি গোপন রাখেন নি। পরিহাসপ্রিয়, স্পষ্টবক্তা নবীনচন্দ্র তাঁর লাগামছাড়া ব্যঙ্গবিদ্রুপের জন্য জীবনে বহুজনের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। তবে তাঁর চরিত্রের সারল্য ও সততা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে ১৪ বছরের বয়সে বড় নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মকাণ্ডে নবীনচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। উনিশ শতকের এই প্রাণবন্ত পুরুষ তাঁর মৃত্যু পরবর্তী পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আত্মকথায়। তিনি লিখেছিলেন — '১. বাঁশের কাঠাম করিয়া তাহা নেওয়ারের মার্কিন দিয়া ছাইয়া তাহাতে আমাকে শ্মশানে সংকীর্তন করিতে করিতে নিবে। ২. চন্দন ও বিভূতি মাখাইয়া গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পড়াইয়া, মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ি বাঁধিয়া ও সাথে গেরুয়া রঙ্গের চাদর দিয়া ঢাকিবে।' ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন। (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২। নবীনচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিন। (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

নবীনচন্দ্র ছিলেন সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। বিত্তের প্রাচুর্য না থাকলেও বংশগৌরবের কৌলিক খ্যাতি তাঁদের ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী। নবীনচন্দ্র নিজেও ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সরকারি চাকুরে। সেকালের এই চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেই নবজাগরণ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেদিক থেকে নবীনচন্দ্র ছিলেন সেকালের নবজাগরণের পক্ষে আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তবুও নানারকম মধ্যযুগীয় ধারণা বিশেষত ধর্ম ও ইহকাল-পরকাল কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্কারের বশবর্তী ছিলেন নবীনচন্দ্র। আবার পরাধীনতার গ-ানিবোধ ও স্বদেশানুরাগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আধুনিক চিন্তাবিশিষ্ট। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে এই দেশাত্মবোধের প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর সেই স্বদেশপ্রেমেরই অনিবার্য পরিণাম 'পলাশির যুদ্ধ', যে কাব্যরচনার জন্য তাঁকে রাজরোষও সহ্য করতে হয়েছে আজীবন।

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে নবীনচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করুন। (সংকেতসূত্র ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

## ১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা আমাদের প্রথম অধ্যায়ে নবীনচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিবরণসহ তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, ও মানসিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরলাম। প্রসঙ্গত তাঁর সমকালীন যুগের প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম উনিশ শতক এক যুগসন্ধিক্ষণ। যখন ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতির

চাপে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট পালাবদল সূচিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনকে কেন্দ্র করে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তা-চর্চার যে নতুন ধারার সূত্রপাত হয়েছিল তার ফল হিসেবেই মধ্যযুগীয় সংস্কার ও মূল্যবোধের পরিবর্তে এক নতুন ভাবাদর্শ সমাজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন তোলে। যার অনিবার্য পরিণামে এদেশে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল। এই নতুন চিন্তাদর্শের গভীর প্রভাব পড়েছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির উপরেও।

আমাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই নবজাগরণের পটভূমিতেই নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব এবং মধুসূদন, হেমচন্দ্রের ঐতিহ্যপথেই তাঁর পদচারণা। অত্যন্ত বিত্তশালী না হলেও আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেও সমাজের চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন। সমকালীন যুগপ্রভাবে এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখের সান্নিধ্যে নবীনচন্দ্র দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে এই স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনার জন্য তিনি রাজরোষের সম্মুখীনও হয়েছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধ' রচনাসুত্রে বাংলার বায়রন আখ্যা পাওয়া নবীনচন্দ্র একাধিক কাব্য ও গদ্যসাহিত্যের রচয়িতা। 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' তাঁর এই ত্রয়ীকাব্য মহাকাব্যিক বিস্তৃতিতে রচিত, অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কাব্যে গীতিকবিতার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অতিরিক্ত আবেগের উচ্ছ্বাস কখনো কখনো লিরিকের ব্যঞ্জনাদ্যুতিকে আবৃত করেছে। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনার জন্যই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে চোদ্দ বছরের বড় নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন।

## ১.৪. প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

**নবজাগরণ :**

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং মধ্যযুগীয় সংস্কার ও মূল্যবোধ অতিক্রম করে আধুনিক যুক্তি-বুদ্ধি চিন্তার জগতে ঢেউ তুলেছিল। উনিশ শতকের বাংলায় সমাজ-সংস্কৃতিতে যে নতুন প্রেরণা ও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তাকেই নবজাগরণ বলে।

**শিবনাথ শাস্ত্রী :**

পিতা হরচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা গোলকমণি দেবী। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি মজিলপুরে জন্ম। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মাচার্য। হরিনাভির স্কুল, ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন স্কুল এবং হেয়ার স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং আজীবন

সেকাজেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রবল পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিবনাথ শাস্ত্রী সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাঁর রচিত 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', তাঁর 'আত্মচরিত' অত্যন্ত সুলিখিত গ্রন্থ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্যারীচরন সরকার :

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। বারাসত স্কুলে ও হেয়ার স্কুলে প্রধানশিক্ষকতা করার পর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এডুকেশন গেজেট, হিতসাধক প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সুরাপান নিবারণের জন্য Bengal Temperance Society স্থাপন করেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

## ১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নের তালিকা চতুর্থ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

## ১.৬. প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

চতুর্থ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ-২

## পলাশির যুদ্ধ

## পলাশির যুদ্ধ : কাব্যের বিষয়বস্তু

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের বিষয়বস্তু

২.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ২.০ ভূমিকা **(Introduction)**

'পলাশির যুদ্ধ' একটি ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ক্লাইবের হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত হন— এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবীনচন্দ্র তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে সে যুদ্ধের ঐতিহাসিক কারণ ও পটভূমি আলোচিত হল।

১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে ক্রমওয়েল সনদ, ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের সনদে যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা প্রদান, ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের সনদে মুদ্রা তৈরী ও সামরিক দণ্ডবিধিসহ নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকার প্রদান ইত্যাদি সনদের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করে তুলেছিল। অতঃপর বাদশা আওরঙজেবের নির্দেশে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ এদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার দিয়ে ইংরেজকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। আওরঙজেবের ফর্মানে লেখা ছিল বার্ষিক তিনহাজার টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে ইংরেজরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। এই আদেশনামার ভিত্তিতে জোব চারনক তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ সুতোনুটি ঘাটে যেদিন নোঙর ফেললেন সেদিনটা ছিল ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট। ইব্রাহিম খাঁর নবাবি শাসনের দুর্বলতার ফলে স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল। ইংরেজরা ক্রমে বুঝতে পারছিল ব্যবসা টিঁকিয়ে রাখতে হলে একদিকে এইসব ছোটখাট যুদ্ধবিগ্রহ ও লুঠতরাজের হাত থেকে প্রাণ ও সম্পত্তি বাঁচাতে হবে; দ্বিতীয়ত এইসব

রাজনৈতিক বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ব্যাবসায়িক ফায়দা তুলতে হবে। বিদ্রোহের উৎপাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য ইংরেজরা কেল্লা বানাবার পরিকল্পনা করলেন, কিন্তু তার জন্য জমি ও কেল্লা বানাবার সরকারি অনুমতি প্রয়োজন। ১৬৯৫-তে বর্ধমান রাজের বিরুদ্ধে শোভাসিংহের বিদ্রোহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহীদের হাত থেকে ব্যাবসা বাঁচাবার নাম করে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি সমস্ত বিদেশী বণিকরা কেল্লা বানাবার অনুমতি আদায় করে নিলেন। সুতোনুটির দক্ষিণদিকে কলকাতা গ্রামে গঙ্গার ধারে একটা উঁচু টিলার মত জায়গায় ইংরেজদের দুর্গ উঠল। ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা উইলিয়াম দি থার্ড এর নামানুসারে দুর্গের নাম হল ফোর্ট উইলিয়াম।

বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ ইব্রাহিম খাঁকে বরখাস্ত করে আওরঙজেব তাঁর দৌহিত্র আজীমউশ্বানকে বাংলার নবাব করে পাঠালেন। আজীমউশ্বান কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করে ঘাঁটি গাড়লেন বর্ধমানে। এদিকে ইংরেজরা কেল্লা যে বানিয়েছেন তখনো সেই জমির মালিকানা তাঁরা পাননি। সুতরাং ভূমিসত্ত্ব লাভের জন্য ইংরেজরা আজীমউশ্বানের কাছে দরবার করলেন। বিভিন্ন উপঢৌকনের সঙ্গে নগদে ষোল হাজার টাকা নজরানা দিয়ে নবাবকে খুশি করার বিনিময়ে ইংরেজরা সুতোনুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটে কেনবার অনুমতি লাভ করলেন। এই অনুমতির ফলেই ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজরা ১৩০০ টাকায় গ্রাম তিনটি কিনে ফেললেন। কেল্লা বানানো ও জমিদারি কেনার পর থেকে ব্যাবসায়িক সুবিধা লাভের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ক্রমেই বেশি বেশি করে ভারতের রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত করার চেষ্টা করছিল।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দির মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসেন সিরাজদ্দৌল্লা। ঐতিহাসিক এস সি হিলের মতে সিরাজদ্দৌল্লা অর্থলোভেই কোম্পানির কলকাতা কুঠি আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু নবাবের পক্ষ থেকে কোম্পানির কাছে অর্থদাবির কোনও প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নি। ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্তের মতে সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব ও আর্থ-সামাজিক কারণেই নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। প্রধানত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথমত সিরাজদ্দৌল্লার সিংহাসন লাভের বিরুদ্ধে তাঁর মাসি ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রে পরামর্শদাতা ছিলেন রাজবল্লভ। সিরাজদ্দৌল্লা সিংহাসন লাভের পর রাজবল্লভকে কারারুদ্ধ করেন কিন্তু তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগেই রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাস সমস্ত ধন-সম্পত্তি সহ কলকাতায় ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কৃষ্ণদাসকে প্রত্যাপর্ণের জন্য ইংরেজের কাছে বারংবার দাবি জানালেও ইংরেজরা তা অগ্রাহ্য করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়। দ্বিতীয়ত কোম্পানিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে সম্রাট ফররুখসিয়র তাঁদের দস্তক প্রদান করেছিলেন, কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজে দস্তক ব্যবহার করতেন। নবাব সুজাউদ্দিনের আমল থেকেই দস্তকের অপব্যবহার নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ চলছিল। সিরাজদ্দৌল্লার সময়ে সেই বিরোধ একেবারে চরমে ওঠে। তৃতীয়ত

ফরাসির আক্রমণ আশঙ্কায় ইংরেজরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই দুর্গের নির্মাণ কার্যে হাত দিয়েছিল এবং নবাবের নির্দেশ অমান্য করে তাঁরা সে কাজ চালিয়েও যাচ্ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌল্লা বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করার জন্য নারায়ণ সিংকে দূত হিসেবে কলকাতার প্রেরণ করেন, কিন্তু গভর্নর ড্রেক গুপ্তচর সন্দেহে অপমান ও লাঞ্ছনা করে তাঁকে বিতাড়িত করেন। কৃষ্ণদাসকে প্রত্যার্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, দস্তক ব্যবহারে নবাবের নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, দুর্গ নির্মাণের ব্যাপারে নবাবের আদেশ অমান্য করা, সর্বোপরি নারায়ণ সিংকে অপদস্থ করার ঘটনায় নবাবের মর্যাদার হানি হয়েছে বলে মনে করেন সিরাজদ্দৌল্লা। প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে শৌকৎ জঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত রেখে সিরাজদ্দৌল্লা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন এবং ১৯৫৬-র ২০ জুন তিনি ইংরেজের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করে নেন। পরাজিত ইংরেজরা অধিকাংশই পলায়ন করেন। বাকি ইংরেজদের একটি ছোট কয়েদখানার বন্দী করার জন্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই মারা যান। এই ঘটনাটি অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত। হলওয়েল সাহেবের মতে ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু হরেছিল, পরবর্তীকালে স্যার যদুনাথ সরকার বিশে-ষণ করে দেখিয়েছেন খুব বেশি হলে ৬০ জন বন্দীর মৃত্যু হয়েছিল। যদিও এই অন্ধকূপ হত্যার জন্য সিরাজদ্দৌল্লা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন না বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

কলকাতা কুঠি ইংরেজের হাতছাড়া হবার খবর পেয়ে মাদ্রাজের গভর্নর সণ্ডার্স কলকাতা পুনরুদ্ধার ও নবাবকে সিংহাসনচুত করার অভিপ্রায়ে কর্নেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে বাংলায় প্রেরণ করেন। নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদ ক্লাইভের যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে পিছু হঠে যান এবং ক্লাইব অতি সহজে কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে সিরাজদ্দৌল্লা পুনরায় কলকাতার নিকটবর্তী বরানগরে উপস্থিত হন। রাতের অন্ধকারে নবাবের সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে ক্লাইব নবাবের যুদ্ধ পরিকল্পনা বানচাল করে দেন। ইতিমধ্যে আহমদ শাহ আবদালির বাংলা আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলে নবাব জানতে পারেন, সেক্ষেত্রে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করাই শ্রেয় বলে মনে করেন নবাব এবং আলিনগরের সন্ধি স্থাপন করেন। কলকাতা থেকে ইংরেজদের হঠিয়ে দিয়ে নবাব যা কিছু লাভ করেছিলেন তার সবই হারালেন তিনি আলিনগরের সন্ধি প্রস্তাবে। সন্ধির শর্ত অনুসারে কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ, টাঁকশাল নির্মাণ ও তাঁর রাজদরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধির উপস্থিতি মেনে নিলেন।

ঐতিহাসিক রবার্ট অর্ম, ঐতিহাসিক এডোয়ার্ডসের মতে কোম্পানির আসলে লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের আর্কটে যেমন তাঁরা মহম্মদ আলির মত বশংবদ নবাবকে বসিয়েছিলেন, বাংলাতেও তেমনি তাঁদের ক্রীড়ানক নবাবকে বসিয়ে নিশ্চিন্তে বাণিজ্য চালাবেন। এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই কূট বুদ্ধির ক্লাইব লক্ষ্য করেন নবাবের বিরুদ্ধে একটা গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হচ্ছে। জগৎ শেঠ, দুর্লভরাম, উমিচাঁদ, নন্দ

কুমারের মত হিন্দু বণিক ও কর্মকর্তা; বিভিন্ন হিন্দু রাজা যেমন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র; এমনকি মিরজাফর, ইয়ার লতিফের মত কিছু মুসলমান ব্যক্তিও সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করার জন্য ক্লাইব এই সুযোগটাই কাজে লাগালেন। ঠিক হল মিরজাফর বাংলার মসনদে বসবেন বিনিময়ে তাঁর সৈন্যদের তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় করে রাখবেন আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্য করার অবাধ সুযোগ লাভ করবে।

এই ষড়যন্ত্রের পরিণামেই সিরাজদ্দৌল্লা আলিনগরের সন্ধির শর্তভঙ্গ করেছেন এই অছিলায় ক্লাইব তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৭৫৭-র ১৪ জুন ক্লাইব তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে মার্চ করে কালনায় পৌঁছলেন, ১৯ জুন আয়ার কূটের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনারা কাটোয়ার মাটির কেল্লাটার দখল নেয়। ২২ জুন সকাল বেলাতেই সমস্ত ইংরেজ সৈন্য অগ্রদ্বীপের গঙ্গা পেড়িয়ে পলাশীর দিকে যাত্রা শুরু করে। সেদিন রাত্রি বারোটায় ক্লাইব তাঁর সৈন্যদল সহ লক্ষবাগ নামে দেড় হাজার বিঘার সেই বিখ্যাত আমবাগানে এসে হাজির হন। ২৩ জুন ভোর থেকে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। ইংরেজ পক্ষের সৈন্যদলে ছিল ৯৫০ জন গোরা পল্টন, ২১০০ দেশী সিপাই, ৮টি কামান ও ২টি বড় তোপ আর নবাব পক্ষে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য এবং ৫৩টা বড় কামান। ইংরেজ সৈন্যদলের নেতৃত্বে ক্লাইব ছাড়াও ছিলেন মেজর জেমস কিলপ্যাটরিক, মেজর আরচিবল্ড গ্রান্ট, মেজর আয়ার কূট ও ক্যাপ্টেন জর্জ গপ। নবাবের পক্ষে সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারে সামনের দিকে প্রায় ৪৫ জন যোদ্ধা ও চারটে ছোট কামান সহ সাঁফ্রে নামে এক ফরাসি সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নবাবের বাকি সৈন্যসামন্ত মিরজাফর, ইয়ার লতিফ সহ একটা উঁচু ঢিবির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সকাল আটটায় লড়াই শুরু হবার পর প্রথমদিকে ইংরেজের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল এবং তাঁরা পিছু হঠে আমবাগানের পাঁচিলের আড়ালে আশ্রয় নিল। পাঁচিলের আড়াল থেকে যুদ্ধ করার সুবিধে পেয়ে যুদ্ধ প্রায় সমানে সমানে হতে লাগল। বেলা এগারোটার সময় নামল বৃষ্টি। আধাঘণ্টার প্রবল বর্ষণে নবাব পক্ষের খোলা গাড়িতে রাখা বারুদ একেবারে ভিজে ঢোল আর ইংরেজ পক্ষের বারুদ ঢাকা দেওয়া গাড়িতে থাকায় একটুও নষ্ট হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরমদনের মৃত্যুতে বিচলিত সিরাজদ্দৌল্লা মিরজাফরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মিরজাফর, দুর্লভরাম তাঁকে সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখার পরামর্শ দিলেন যদিও মোহনলাল চাইছিলেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। সিরাজদ্দৌল্লা মনস্থির করতে না পেরে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। সিরাজদ্দৌল্লার এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ক্লাইব প্রচণ্ড আক্রমণ নামিয়ে আনলেন এবং নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছত্রখান হয়ে থাকা নবাবের সেনাদল সে আক্রমণের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হল। বিকেল চারটে নাগাদ ক্লাইব নবাব ছাউনির একেবার কাছে চলে এলে সিরাজদ্দৌল্লা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করলেন এবং তারপর একরকম এলোপাতাড়ি যুদ্ধে ক্লাইবের জয় সাব্যস্ত হল। সন্ধ্যাসূর্যের রক্তরাগের সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা পলাশির গঙ্গাবক্ষে বিলীন হল।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

ইংরেজরা আসলে যে কোনও মূল্যে একজন বশংবদ নবাব চাইছিলেন যাকে ক্রীড়ানক সাজিয়ে তারা নিশ্চিন্তে ব্যাবসা চালাতে পারবেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌল্লার কর্তৃত্বকারী মনোভাব তাঁদের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে যে কোনও অজুহাতে তাঁরা সিরাজদ্দৌল্লার অপসারণ চাইছিলেন। বয়স কম থাকায় ও অনভিজ্ঞতার কারণে রাজ্যশাসনের কূটকৌশল সিরাজদ্দৌল্লার অনায়ত্ত ছিল। সেই সঙ্গে তাঁর অত্যাচারী ও ভোগবিলাসী স্বভাবের জন্য তিনি অনেকের কাছেই অপ্রিয় ছিলেন। চতুর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়েই তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন।

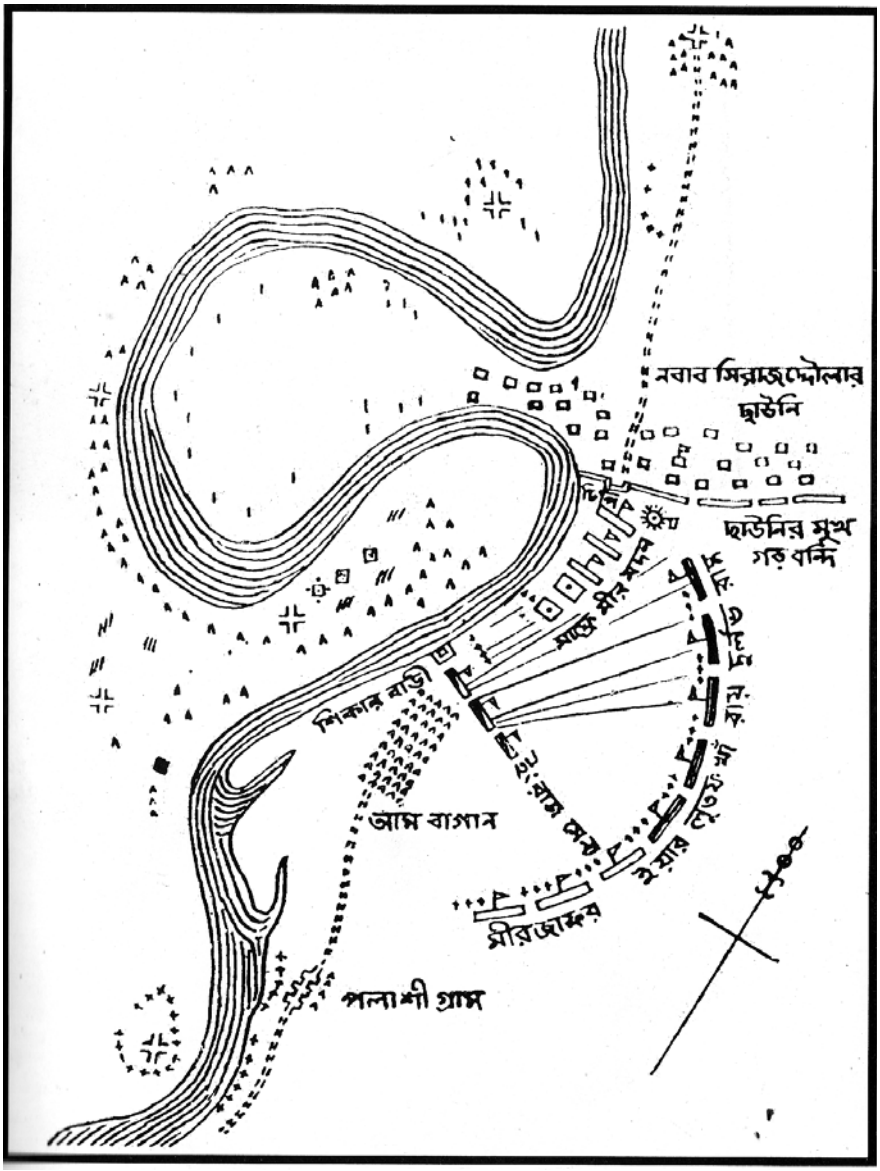


পলাশির যুদ্ধপ্রান্তর

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। ঠিক কী কী কারণে সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ চরম আকার নিয়েছিল তা নির্দেশ করুন। ( ১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২। আলিনগর সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

৩। পলাশির যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ব্যাখ্যা করুন। (১০০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আমরা প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে নবীনচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যরচনার জন্যই নবীনচন্দ্র সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। অত:পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সেই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করব। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কাহিনি পাঁচটি সর্গে বিন্যস্ত। প্রতিটি সর্গের আখ্যানভাগ পৃথক পৃথক ভাবে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনারা—

- কাব্যের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- প্রকৃত ইতিহাস ও কাব্যে বর্ণিত ইতিহাসের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কাব্যের সর্গবিভাগ ও প্রতিটি সর্গের বিষয়বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

## ২.২ 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের বিষয়বস্তু

খণ্ড কবিতার সংকলন অবকাশরঞ্জিনীর চার বছর পর নবীনচন্দ্রের স্বদেশভাবদ্যোতক আখ্যানকাব্য 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। ইতিমধ্যে মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছে (১৮৭৩) এবং 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের ছমাস পূর্বে হেমচন্দ্রের আখ্যানকাব্য 'বৃত্রসংহার' প্রকাশ লাভ করেছে। 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নবীনচন্দ্র এক অকল্পনীয় যশ ও সম্মানের অধিকারী হন। সমকালীন শিক্ষিত সমাজে 'পলাশির যুদ্ধ'র কবি আখ্যায় ভূষিত নবীনচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ও সমাদর এক আশ্চর্য স্বীকৃতি লাভ করে। এই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনার সূত্রেই তৎকালীন পাঠক সমালোচকের প্রশংসায় নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি মধুসূদন-হেমচন্দ্রকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আসলে 'পলাশির যুদ্ধ'-র অন্তর্গত স্বাদেশিকতাবোধ সে যুগের সামাজিক আবেগকে পুষ্ট ও তুষ্ট করতে পেরেছিল বলেই এর কাব্যিক উৎকর্ষতার বিচার সেকালে তেমন গুরুত্ব পায় নি।

বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বেই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অনন্যতা। পৌরাণিক বীরত্ব বা রাজপুত শৌর্যবীর্যের কাহিনি বিন্যাসের পরিবর্তে এখানে যে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে নিহিত ছিল আহত দেশাত্মবোধের গ-ানি ও বাঙালির নিজস্ব হৃদয়ের হাহাকার। অতিদূর অতীত কাহিনির স্মৃতিসুত্রের পরিবর্তে পলাশির যুদ্ধের পটভূমি একান্তভাবেই বাঙলার নিজস্ব ভূগোলের অন্তর্গত। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কাহিনিঅংশ পাঁচ সর্গে বিভক্ত। কাব্যের প্রধান কাহিনিসূত্র যথাক্রমে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে মিরজাফর, জগৎশেঠ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্ত, ক্লাইবের সঙ্গে মিরজাফরের গোপন যোগসাজস, পলাশির প্রান্তরে সিরাজদ্দৌল্লার শোচনীয় পরাজয়, পলায়ন ও শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ, মোহনলালের আক্ষেপ, ক্লাইবের অনুগ্রহে মিরজাফরের মসনদপ্রাপ্তি, এবং বিজয়ী ইংরেজের উৎসবপালন।

প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মন্ত্রী রায়দুর্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভের শলাপরামর্শ। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের মুখ্য ঘটনা পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়ের পটভূমি নির্মিত হয়েছে প্রথম সর্গে। পলাশির প্রান্তরে সংঘটিত একদিনের নয়ঘণ্টাব্যপী যুদ্ধের পূর্বে যে প্রস্তুতিপর্ব ছিল, যুদ্ধের আগেই যুদ্ধের ভাগ্য নির্দ্ধারণের যে পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল, এককথায় যুদ্ধপূর্ব নেপথ্য উদ্যোগের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রথম সর্গে।

ষড়যন্ত্র রচনার উপযোগী এক রহস্য ঘনঘোর রাত্রির বর্ণনায় সর্গের সূচনা —

> দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী;
> নিবিড় জলদাবৃত গগন-মণ্ডল;
> বিদারী আকাশতল,— যেন দুষ্ট ফণী —
> খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।

এরপর দেখা যায় কাব্যে মন্ত্রণাসভার স্থান ব্যক্ত হয়েছে —

চঞ্চল চপলালোকে চল একবার,
যাই সুরপুরী-সম শেঠের ভবনে,

সেখানে বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যাঁদের উপর তাঁরা —

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন;
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল
কুটিল ভাবনা বেশে কুঞ্চিত নয়ন।

প্রথমেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সম্ভাষণ জানিয়ে মন্ত্রী রায়দুর্লভ তাঁর মতামত জানিয়েছেন —

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হ'তে এই কর্ম্ম হব না সাধন।

মন্ত্রীর ভাষণে যখন সবাই নির্বাক তখন জগৎশেঠ তাঁর তেজোদৃপ্ত ভাষণে বলেন —

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম, — সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌল্লার যদি হয় অনুকূল,
অথবা মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয়দান যদি দেবকূল,
তথাপি — তথাপি এই কলঙ্কের কালি
সিরাজদ্দৌল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয়।

তখন রাজবল্লভও তাঁকে সমর্থন জানিয়ে তাঁর নিজস্ব দুর্দশা প্রসঙ্গে বলেন —

যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে হায়!
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর; ইংরেজ বণিক
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'তো এত দিনে!

অতঃপর এইসব অমানবিক অত্যাচার ও অন্যায় বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাজবল্লভ তাঁর অভিমত জানান —

চিন্ত সদুপায়। মম এই অভিপ্রায় —
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়!)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার।

সবশেষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও সমগ্র পরিস্থিতি ব্যাখ্যা ও বিশে-ষণ করে সিদ্ধান্ত নেন —

অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে —
যবন-কূলের গ-ানি! — মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।

বহু চিন্তা ও মতের সংঘর্ষ ও অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সকলেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন —

এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন,
কিছু তর্ক পরে, সবে হ'লেন সম্মত।

একমাত্র ব্যতিক্রম রানি ভবানীর বিপরীত চিন্তা। যিনি সমস্ত সমস্যা অনুধাবন করেও বিদেশীর হাতে দেশের ভাগ্য সপেঁ দিতে রাজি হন নি।

জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ!
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে সিরাজদ্দৌল্লায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।

ইংরেজের সাহায্য গ্রহণে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা কেবলমাত্র তাঁর বক্তব্যেই প্রকাশিত —

বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব-ছায়ায়
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে,
নবাব অবর্ত্তমানে এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে?

তাঁর মত ছিল ইংরেজের সাহায্য ছাড়াই সমস্ত দেশীয় রাজারা একত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করে যোগ্য জনকে মসনদে বসাক। তার ফলে হয়তো হিন্দু রাজাদের সে প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের মুসলমান শাসনাধীনে থাকা বঙ্গও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে।

অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ।

অন্ধকার রাত্রি, শেঠের গৃহ থেকে গবাক্ষপথে নির্গত আলোকরশ্মি, মন্ত্রণাসভার অভ্যন্তরে লোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনীর চিত্র ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রথম সর্গে চক্রান্তের উপযোগী গোপনীয় ও ভয়াবহ একটি আবহ নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন কবি।

দ্বিতীয় সর্গের মুখ্য বিষয় যুদ্ধের আগে ব্রিটিশ সৈন্যের মনোভাব বিশে-ষণ ও কাটোয়ায় ব্রিটিশ শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ ক্লাইবকে দেবী ব্রিটানিয়ার আশ্বাসদান। সিরাজদ্দৌল্লার সৈন্যকে পরাজিত করে অধিকৃত কাটোয়ার দুর্গ থেকে সমরাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যের ক্রমাগত গঙ্গা পেড়িয়ে পলাশির দিকে যাত্রার বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় সর্গ —

অদূরে কাটোয়া-দুর্গে বৃটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে, উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধুমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, — অস্ত্র ঝলমলে;

নীরবে নিরন্তর গঙ্গা অতিক্রম করে যাওয়া সৈন্যদের মনোভাবের কবিকল্পিত বর্ণনার পরেই স্বয়ং ক্লাইব উপস্থিত হয়েছেন, যিনি আসন্ন যুদ্ধভাবনায় নিমগ্ন।

শিবির অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিরাজ-বিরোধীদের সঙ্গে ক্লাইবের বোঝাপড়া, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই তিনি গভীর সন্দিহান। মিরজাফরকে ক্লাইব যেমন

সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না তেমনি উমিচাঁদকে  আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে হাতে রাখতে হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে অবিশ্বাস আর সন্দেহ ছাড়া কোনও নিশ্চয়তা থাকতে পারে না তার অসাধারণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি।

একই ভরসা মিরজাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন মতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ ফণা আস্ফালিয়া।

এই চিন্তান্বিত ক্লাইবের সম্মুখে অবশেষে আবির্ভূত হয়েছেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য শোভায় ভূষিত এক নারী নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন — "ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,"। অজানিত ভবিতব্যকে তিনি ক্লাইবের সামনে তুলে ধরেছেন এবং ভবিষ্যৎ ভারতের কর্তৃত্ব প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন —

নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্ন সিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়।

দ্বিতীয় সর্গ শেষ হয়েছে একটি গীত সহকারে।

যুদ্ধের ঠিক পূর্বরাত্রে দুই প্রতিপক্ষের দুই প্রধানের স্বীয় মানসিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে তৃতীয় সর্গে। একদিকে বিলাস পরিবৃত সিরাজদ্দৌল্লার আশঙ্কা বিহ্বল চিত্ত অপরদিকে জয়-পরাজয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বে সংশয়ব্যাকুল ক্লাইবের দোলাচলচিত্ত। সর্গের শুরুতে রয়েছে সুর আর সুরার বন্যায় প-াবিত নবাব শিবিরের ছবি —

জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জ্বল,
বিকাশি লোহিত নীল সুস্নিগ্ধ কিরণ;
আতর-গোলাপ-গন্ধে হইয়া বিহ্বল,
বহিতেছে ধীরে গ্রীষ্ম নৈশ সমীরণ!

সেখানে আমোদ-প্রমোদ ও প্রগাঢ় সম্ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত হয়েও সিরাজদ্দৌল্লার মনে স্বস্তি নেই।

এমন ইন্দ্রিয়-সুখসাগরে ডুবিয়া,
কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?
কি ভাবনা শুষ্ক মুখে শূন্য নিরখিয়া,

কেন বা সঙ্গীতে আজি বিরাগ এমন?

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সদা মুগ্ধ যার মন,

অকস্মাৎ কেন তার বৈরাগ্য এমন?

তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন —

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,

কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহীগণ;

.....

সঙ্গীত তরঙ্গ ভেদি এ পাপ মন্ত্রণা

পশিল কি ভয়াকুল নবাবের মনে?

অত:পর পত্নী সান্নিধ্যে নিদ্রিত হলেও, দুশ্চিন্তাবিক্ষুব্ধ, দু:স্বপ্ন জর্জরিত সে নিদ্রায় অতীতের যাবতীয় পাপকর্ম যেভাবে মিছিলের মত ভিড় করে এসেছে কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন।

অপরদিকে ক্লাইব তাঁর শিবিরে স্বীয় সৈন্যদলের স্বল্পতা অপটুতার কথা চিন্তা করে বিমর্ষ, যুদ্ধজয় সম্পর্কে সন্দিহান। অবশেষে জাতীয় বীরত্ব গর্বে উজ্জীবিত। এক ইংরেজ সৈনিকের পত্নীর উদ্দেশে নিবেদিত প্রেমগীতিতে তৃতীয় সর্গের সমাপ্তি।

পলাশির প্রান্তরের যুদ্ধঘটনা, মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় এবং যুদ্ধে আহত মোহনলালের আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে চতুর্থ সর্গে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে কোনও ঐতিহাসিক যুদ্ধঘটনার বর্ণনা প্রথম পাওয়া যায় 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের চতুর্থ সর্গে। দিন শুরু হতেই অস্ত্রসজ্জিত দুই প্রতিপক্ষ সম্মুখসমরে অবতীর্ণ। তাদের আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের বর্ণনায় চতুর্থ সর্গের সূত্রপাত —

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি

কাঁপাইয়া রনস্থল,

কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,

কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি

অথবা

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,

ভীম রবে দিগঙ্গন,

কাঁপাইয়া ঘন ঘন,

উঠিল অম্বর পথে করি ঘোর রোল।

দুইপক্ষের মধ্যে যখন ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে সেসময় ইংরেজের গোলার আঘাতে নবাব পক্ষের সেনাপতি মিরমদনের মৃত্যুতে নবাবপক্ষের সৈন্যদের একাংশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে ঐক্যবদ্ধ করে সেনাপতি মোহনলাল যখন পুনরায় সঠিকপথে যুদ্ধ পরিচালনার আয়োজন করছিলেন সেসময় বিশ্বাসঘাতকদের পরামর্শে নবাব যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। নবাবপক্ষের সৈন্যদের পশ্চাদপসারণের সুযোগে ইংরেজ সৈন্যদল তাঁদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নবাবপক্ষের পরিচালনাহীন, পলায়নপর সৈন্যদল ইংরেজের সেই ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের খেদোক্তির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। বন্দেমাতরমের পূর্বে বাঙালির দেশাত্মবোধের মন্ত্র ছিল মোহনলালের এই উত্তেজক ভাষণ। দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করার জন্য জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগে উদ্বেলিত তাঁর সে উদাত্ত আহ্বান 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের এক অন্যতম সজীব ও স্মরণীয় অংশ।

চল তবে ভ্রাতাগণ! চল পুনর্ব্বার!
দেখিব ইংরাজদল,
শ্বেত-অঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার?

পঞ্চম সর্গের নাম শেষরক্ষা। নবাবের বিরোধীপক্ষ ইংরেজের বিজয়োৎসবের বর্ণনা দিয়ে সর্গের সূচনা এবং সিরাজদ্দৌল্লাকে হত্যার বর্ণনায় সর্গ তথা কাব্যের পরিসমাপ্তি। যুদ্ধশেষে রাজধানী মুর্শিদাবাদ আবার আলোকোজ্জ্বল নাগরিক সাজে সজ্জিত। সিংহাসন লাভের আনন্দে মশগুল মিরজাফর আফিম-আরক্ত নয়নে বিলাসে মত্ত —

মিরজাফরের আজি সার্থক জীবন;
ভূতলে যুনানী স্বর্গ আজি অনুভব।
যেই সিংহাসনছায়া আঁধারে তখন
ছিল লুকাইয়া, আজি—হায়! অসম্ভব—
সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন!

বিজয়োল্লাসের রেশ ইংরেজ শিবিরেও। অভাবনীয় জয়ের আত্মপ্রসাদে, কূট স্বার্থসিদ্ধির অনন্দে, প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আহ্লাদে ইংরেজও প্রমোদবিলাসে উচ্ছ্বসিত।

একটি শিবির মধ্যে টেবিল বেষ্টিয়া
বিরাজিছে কাষ্ঠাসনে যুবা কত জন;
যেই বীর্য্য আসিয়ছে পলাশী জিনিয়া,
সুরাহস্তে পরাজিত হয়েছে এখন।

এরপরেই সিরাজদ্দৌল্লা ও লুৎফউন্নিসার যে মর্মান্তিক পরিণতির ছবি অঙ্কিত হবে সেই বেদনাবহ ঘটনার যন্ত্রনাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতেই যেন আনন্দ উল্লাসের এই বিপরীত পটভূমি নির্মাণের এত আয়োজন। অতঃপর কারারুদ্ধ সিরাজদ্দৌল্লার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বীভৎস অত্যাচরে জর্জরিত বঙ্গের নবাব যে সাধারণ আজ্ঞাবহ ভৃত্যের পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন সেই করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন কবি। তথাপি পান নি রক্ষা, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকের তরবারি দ্বিখণ্ডিত করেছে সিরাজদ্দৌল্লার শরীর —

উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে; নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম সর্গে চিত্রিত বিদ্রোহীদের মন্ত্রণাসভার বর্ণনা দিন। (১০০টি শব্দের মধ্যে।)

.....

.....

.....

.....

২। দ্বিতীয় সর্গে ক্লাইবের মানসিক দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব উপশমের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে।)

.....

.....

.....

৩। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধপূর্বরাত্রে সিরাজদ্দৌল্লার মানসিকতা লেখক কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আলোচনা করুন। (১০০টি শব্দের মধ্যে।)

.....

.....

.....

.....

৪। চতুর্থ সর্গে বর্ণিত নবাব সৈন্যের পরাজয়ের চিত্র অঙ্কন করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে।)

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনী *আমার জীবন*-এ 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য রচনার নেপথ্য ঘটনা হিসেবে বলেছেন — "যশোহরে আমাদের আমোদ ও আহারের জন্য একটা সাধারণ সমিতি ছিল। তদন্তর্গত আবার কয়েকটি শাখা সমিতি ছিল — সঙ্গীত সমিতি, সাহিত্য সমিতি, ইয়ার্কি সমিতি। সাহিত্য সমিতির সভ্য তিনজন — আমি, জগদ্বন্ধু ভদ্র, মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। জগবন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক এবং মাধব তখন উকিল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে, আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বই লিখিব। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্বদা আমার নয়নের সম্মুখে ভাসিত। আমি বলিলাম আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিব, — জগদ্বন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহী-বিদ্রোহের কোনও ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল।" ১৮৬৮ সালে এই কাব্যের কিয়দংশ রচনার পর ১৮৭৩ সাল নাগাদ তিনি কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শে 'পলাশীর যুদ্ধ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে না ছাপিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

পাঁচটি সর্গে বিন্যস্ত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের আখ্যান ভাগ নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

## ২.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভুমিকায় পলাশির যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অত:পর এই ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর কাহিনিকে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে নবীনচন্দ্র যেভাবে পাঁচসর্গে বিন্যস্ত করেছেন তা বিশে-ষণ করে দেখানো হয়েছে। প্রথম সর্গে আমরা দেখি সিরাজদ্দৌল্লার বিদ্রোহীগোষ্ঠী, জগৎ শেঠের গৃহে একটি গোপন মন্ত্রণাসভায় ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছেন। মতবিনিময়

ও শলা-পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইবের সাহায্যে সিরাজদ্দৌল্লাকে তাঁরা সিংহাসন থেকে অপসারিত করবেন এবং মিরজাফরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করবেন। দ্বিতীয় সর্গে ক্লাইব চরিত্রের শক্তি, সাহস, বুদ্ধি, তার ব্যক্তিত্ব ও পরাক্রমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সেইসঙ্গে একদিকে নবাব বিদ্রোহীদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে, পলাশির যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে তাঁর সংশয়ব্যাকুল চিত্তের বর্ণনা দিয়েছেন। অপরদিকে স্বপ্নে দৃষ্ট ইংল্যণ্ডের রাজেশ্বরীর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁর সকল দ্বিধা অবসানের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধপূর্বরাত্রে যুদ্ধশিবিরে বিলাসমত্ত সিরাজদ্দৌল্লার চিত্তচাঞ্চল্যের বর্ণনা দিয়েছেন। চক্রান্তের ইঙ্গিতে সন্দিগ্ধ সিরাজদ্দৌল্লা আসন্ন যুদ্ধ পরাজয়ের ভয়ে ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অতীতের কৃতকর্ম, তাঁর যাবতীয় পাপ ও অন্যায়ের স্মৃতি মিছিলের মত ভিড় করে এসেছে তাঁর দু:স্বপ্নে। চতুর্থ সর্গে যুদ্ধবর্ণনা উপস্থাপিত। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের মধ্যে মিরমদনের মৃত্যু হলে নবাবপক্ষের ছত্রভঙ্গ সৈন্যকে পুনরায় অনুপ্রাণিত করে মোহনলাল যুদ্ধে অগ্রসর হন। সেসময় হঠাৎ নবাবের যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশে নবাবপক্ষের সৈন্যরা পশ্চাদপসারণের সময় ইংরেজের প্রবল আক্রমণের মুখে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মোহনলাল সদ্য স্বাধীনতা হারানোর বেদনায় খেদোক্তি প্রকাশ করে। পঞ্চম সর্গে একদিকে সিরাজদ্দৌল্লা ও লুৎফউন্নিসার কারারুদ্ধ বন্দিদশার শোকচিত্র এবং অপরদিকে ক্লাইবের বিজয় ও মিরজাফরের মসনদ লাভের আনন্দচিত্র উপস্থিত করেছেন কবি। ঘাতকের তরবারির আঘাতে সিরাজদ্দৌল্লার মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কনে সর্গ তথা কাব্য সমাপ্ত হয়েছে।

## ২.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

পলাশি :

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর দুইপারে বর্ধমান ও নদিয়া জেলাদুটি অবস্থিত। বর্ধমানের কাটোয়া শহরের বিপরীতে গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত পলাশির প্রান্তর নদিয়া জেলার অন্তর্গত। সেসময় সেই পলাশির প্রান্তরে গঙ্গার পাড়ে পাড়ে দেড় হাজার বিঘের এক বিরাট আমবাগান ছিল। একলক্ষ আমগাছের সেই আমবাগান লক্ষবাগ নামে পরিচিত ছিল। এই আমবাগানেই ছিল ইংরেজদের যুদ্ধশিবির।

## ২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নের তালিকা চতুর্থ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

## ২.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

চতুর্থ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৩

# পলাশির যুদ্ধ

## পলাশির যুদ্ধ : চরিত্র-বিচার

বিষয়বিন্যাস


৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ চরিত্র বিশে-ষণ

- ৩.২.১ সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্র
- ৩.২.২ ক্লাইব চরিত্র
- ৩.২.৩ মোহনলাল চরিত্র
- ৩.২.৪ লুৎফউন্নিসা চরিত্র
- ৩.২.৫ রানি ভবানী চরিত্র
- ৩.২.৬ অপ্রধান চরিত্র

৩.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৩.১ ভূমিকা (Introduction)

বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের চরিত্র বিশে-ষণ প্রসঙ্গে কাব্যে চরিত্র রূপায়নের দুর্বলতা আছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কবি নবীন চন্দ্র স্বয়ং বলেছিলেন — "চরিত্রচিত্রণ পলাশীর যুদ্ধ রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল না।"(নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন*) এ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষ যথার্থই বলেছেন যে "পলাশীর যুদ্ধে অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে মনুষ্যচরিত্রের বিশদ চিত্র নাই। ইহার পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন একটি চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।" (কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *বান্ধব* পত্রিকা) 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে দেখা যায় এক একটি সর্গে এক একটি ভাব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং সেই ভাবগুলি এক একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে প্রকাশ লাভ করেছে। ভাব প্রকাশ শেষ হলে চরিত্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ফলে এক একটি ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চরিত্রগুলি যথাযথ বিকাশের সুযোগ পায় নি। তথাপি কাব্যের প্রধান

পুরুষ চরিত্রগুলি যথাক্রমে সিরাজদ্দৌল্লা, ক্লাইব, মোহনলাল এবং নারী চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে রানি  ভবানী ও লুৎফউন্নিসা। এরমধ্যে আবার ক্লাইব দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে এবং সিরাজউদ্দৌল্লা ও লুৎফউন্নিসা তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে দুইবার করে কাব্যে উপস্থিত হয়েছেন। রানি ভবানী ও মোহনলাল কিন্তু মাত্র একবার করে যথাক্রমে প্রথম ও চতুর্থ সর্গে উপস্থিত হয়েছেন। কাব্যের প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম সর্গে বিভিন্ন বিদ্রোহী চরিত্র সহ তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় মিরজাফরের উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রাধান্য লাভ করেছে রানি ভবানীর চরিত্র। দ্বিতীয় সর্গে ক্লাইব, তৃতীয় সর্গে সিরাজউদ্দৌল্লা, চতুর্থ সর্গে মোহনলাল ও পঞ্চম সর্গে লুৎফউন্নিসা প্রাধান্য লাভ করেছে। সুতরাং দেখা যায় এক একটি চরিত্র এক একটি নির্দিষ্ট সর্গে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাছাড়া কাব্যে একাধিক অপ্রধান চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষিত হয়, যেমন নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মন্ত্রীবর রায়দুর্লভ, সেনাধ্যক্ষ মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, ইংরেজ ও নবাব শিবিরের সৈন্যসামন্ত, বিলাসকক্ষের সুন্দরী নর্তকী, পরিচারিকা, মিরজাফর পুত্র মিরণ, সিরাজউদ্দৌল্লার ঘাতক মহম্মদী বেগ প্রমুখ।

## ৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কবিপরিচিতি ও কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি পাঁচটি সর্গে কাব্যের আখ্যানভাগ বিন্যস্ত। কাহিনি বর্ণনার সূত্রে বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে কাব্যে। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের আখ্যান যেহেতু অনতিদূর ইতিহাসের ঘটনানির্ভর সেহেতু এই কাব্যে উপস্থাপিত চরিত্রগুলির একটি ইতিহাসভিত্তি আছে, একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। কবি তাঁর সময়ে প্রাপ্ত ইতিহাসগ্রন্থ ও লোকমুখে শ্রুত কিংবদন্তি অনুসারে তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলির কায়াকাঠামো নির্মাণ করেছেন।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কাব্যে উপস্থিত চরিত্রগুলির  বিশে-ষণ ও পর্যালোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে আপনারা—

- কাব্যে উপস্থাপিত প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোনও চরিত্র কাব্যে কতবার উপস্থিত হয়েছে কোন্ সর্গে প্রাধান্য পেয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- চরিত্রগুলি কতদূর ইতিহাসসম্মত ভাবে অঙ্কিত সে সম্পর্কেও অবগত হতে পারবেন।

## ৩.২ চরিত্র বিশে-ষণ

কাব্যে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক তথ্য জেনেছি। অত:পর আমরা একে একে চরিত্রগুলির ব্যাখ্যা ও বিশে-ষণ করব। পলাশির যুদ্ধের প্রধান ঘটনা যেহেতু বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় ও মৃত্যু সেহেতু সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্রের বিশে-ষণ দিয়েই আমরা চরিত্রবিচার পর্বের সূচনা করলাম।

### ৩.২.১. সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্র

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজদ্দৌল্লা। সুতরাং 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র সিরাজদ্দৌল্লা অনতিদূর ইতিহাসের থেকে উঠে আসা একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁর 'সিরাজদ্দৌল্লা' গ্রন্থে অভিযোগ করেন নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে সিরাজদ্দৌল্লাকে সুরা আর নারীতে আসক্ত, ভোগ-বিলাসে মত্ত উচ্ছৃঙ্খল, অস্থিরমতি, অত্যাচারী শাসকরূপে অঙ্কিত করেছেন অণুমাত্র সহানুভূতি কবি তাঁর প্রতি দেখান নি। অক্ষয়কুমারের মতে আলীবর্দির মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করে মদ্যপান ত্যাগের শপথগ্রহণকারী সিরাজদ্দৌল্লা আসলে শিক্ষিত, নির্ভীক, তেজস্বী ও রাজ্যশাসনে দক্ষ ছিলেন। অক্ষয়কুমারের অভিযোগের প্রত্যুত্তরে নবীনচন্দ্র অবশ্য বলেছিলেন ইংরেজের লেখা বিকৃত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে কাব্য লিখতে হয়েছিল বলেই হয়ত সিরাজদ্দৌল্লাকে এভাবে আঁকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন "তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধহয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌল্লার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিলাম।" পরবর্তীকালে আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর *History of Bengal* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সিরাজদ্দৌল্লা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন "I shall therefore give here the opinion of Monsieur Jean Law, the chief of the French factory at Qasimbazar, a gentleman who was prepared to risk his own life in order to defend Siraj against the English troops. Law writes in his Memoirs — "The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact, he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelity.....Everyone trembled at the name of Siraj-ud-daulah." সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট আধুনিক ইতিহাসকারের গবেষণা সাপেক্ষে বিচার করলে দেখা যায় নবীনচন্দ্রের সিরাজচরিত্র অঙ্কন ইতিহাসসম্মত।

কাব্যে সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্র অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইভাবে উপস্থাপিত। প্রথমত অন্য চরিত্র বা অন্যান্য চরিত্রের আলোচনার মধ্য দিয়ে সিরাজদ্দৌল্লার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, দ্বিতীয়ত সিরাজদ্দৌল্লা স্বয়ং যখন উপস্থিত হয়েছেন। প্রথম

সর্গে যেখানে জগৎশেঠের গৃহে অনুষ্ঠিত গোপন মন্ত্রণাসভায় রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র একে একে বক্তব্য রেখেছেন, সেখানে তাঁদের সেই বক্তৃতাভাষ্যের মধ্য দিয়ে সিরাজচরিত্র প্রতিভাত। মন্ত্রী রায়দুর্লভ যেমন বলেছেন —

সিরাজ দুর্দ্দান্ত অতি, নিষ্ঠুর পামর,
মানি আমি।

অথবা রাজবল্লভ যেমন বলেছেন —

কিছুদিন আর
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না,— থাকিবে না কুলশীলমান
বঙ্গবাসীদের হায়! এখনো সবার
অনিশ্চিত ভয়ে, ত্রাসে, কণ্ঠাগত প্রাণ।
সীমা হতে সীমান্তরে এই বাঙ্গালার
উঠিতেছে হাহাকার, ভাবে প্রজাগণ
কেমনে রাখিবে ধন, রাখিবে জীবন।

কিংবা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন বলেছেন —

বিরাজিত বঙ্গেশ্বর বিচিত্র সভায়!
কামিনী-কোমল-কোল রত্নসিংহাসন!
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভূবন!

এ থেকে স্পষ্ট যে সিরাজদ্দৌল্লা এখানে সুরাসক্ত, নারীসঙ্গলোলুপ, প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী শাসক রূপেই উপস্থাপিত। অবশ্য এখানে যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা সকলেই সিরাজদ্দৌল্লার বিরোধী শিবিরের, সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্দেশ্যেই তারা এখানে জমায়েত হয়েছেন; ফলে তাঁদের বক্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট হতেই পারে।

সুতরাং তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে সিরাজদ্দৌল্লা যেখানে স্বয়ং কাব্যে উপস্থিত সেখানকার সিরাজ চরিত্রের কথা ও কাজ অতঃপর বিবেচ্য। দেখা যায় যুদ্ধপূর্বরাত্রে রাজধানী থেকে দূরে শিবিরের মধ্যেও রমণীবেষ্টিত, বিলাসমত্ত সিরাজের ছবি এঁকেছেন কবি। বিরোধীদের কার্যকলাপের ইঙ্গিত পেয়ে পরদিনের যুদ্ধে পরাজয় ভাবনায় তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভীত, এমনকি মিরজাফরের পায়ে তরবারি, মুকুট রেখে আত্মরক্ষার দীন ভাবনায় ভাবিত। সিরাজদ্দৌল্লা যখন বলেন —

আমি এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,

যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,

অরিবৃন্দ নখাগ্রও দেখিবে না যার,

কেমনে অলক্ষ্য তারে বধিবে পরাণে?

তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,

রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই পলায়ন প্রবণতা অথবা কারাগারে হত্যাকারীর সম্মুখে সিরাজদ্দৌল্লা যখন

কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে।

তখন নিতান্তই ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত সিরাজের চিত্রই উপস্থাপিত হয়। যুদ্ধপূর্ব রাত্রে দেখা যায় সিরাজদ্দৌল্লা কখনও আত্মভাবনায় কখনও বা প্রতিশোধস্পৃহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। সেই মনোবিকারের পরিণামেই অতীত পাপকর্মের স্মৃতিকণ্টকিত দুঃস্বপ্ন সারি বেঁধে হাজির হয় নিদ্রায়। যাবতীয় দুষ্কর্মের যে খতিয়ান সেই দুঃস্বপ্নের আড়াল দিয়ে উঠে এসেছে সেখানেও দেখা যায় সেই মদ্যপ, নারীলোলুপ, স্বৈরাচারী শাসকের ছবি।

এখন সিরাজদ্দৌল্লা প্রকৃতপক্ষে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র, প্রীতিবশতঃ সিরাজদ্দৌল্লাকে কখনওই প্রজারঞ্জক, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সাহসী, ইন্দ্রিয়-সংযমী চরিত্র রূপে হাজির করা যেত না। কারণ তাতে ঐতিহাসিক সত্যের অমর্যাদা হত। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর *History of Bengal* গ্রন্থে বা শ্রী তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর *পলাশির যুদ্ধ* গ্রন্থে সিরাজদ্দৌল্লার এইসব চারিত্রিক ত্রুটি ঐতিহাসিক সত্য বলেই মন্তব্য করেছেন। সুতরাং ইতিহাস-অনুগ থাকতে গিয়ে নবীনচন্দ্র উপায়হীন ভাবে সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্রটি এভাবে এঁকেছেন। বরং যুদ্ধপূর্ব রাতে কাব্যের সিরাজদ্দৌল্লাকে যখন বলতে শোনা যায় —

যেই সব পাপ-কার্য করিতে সাধন

কেশাগ্রও কোন দিন কাঁপেনি আমার,

আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,

শিহরিয়া উঠে অঙ্গ কাঁপে বারংবার?

পাপ পুণ্য কার্যকালে সমান সরল,

অনুশোচনাই মাত্র পরিচয়স্থল।

তখন বোঝা যায় সিরাজচরিত্রের এই আত্মসমালোচনা, এই আত্মঅনুশোচনা কবিকল্পিত। নিতান্ত অশিষ্ট মানুষের হৃদয়ও যে স্বকৃত পাপের অনুতাপে দগ্ধ হতে

পারে সেই মানবিক বোধ থেকেই সিরাজচরিত্রে এই আত্মগ-ানির আরোপ। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য কাব্যে সিরাজদ্দৌল্লা যখন বলছেন —

যবন-দৌরাত্ম যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ,
সম্মুখ-সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিঁড়িলে দাসত্বপাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন?

সিরাজদ্দৌল্লার এই ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাবও সম্ভবত কবি-আরোপিত। হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহকে এভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করা সিরাজদ্দৌল্লার পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা সে সম্পর্কে ইতিহাসে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং ইতিহাস যেখানে নিশ্চুপ নবীনচন্দ্র সেখানে সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্রে মানবীয় গুণ আরোপ করেছেন। ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, কবি হিসেবে নবীনচন্দ্রের পক্ষে সিরাজের প্রতি যতখানি সহানুভূতি দেখানো সম্ভব ছিল তিনি তা দেখিয়েছেন। সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্র যত কলঙ্কিতই হোক তার মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কনে কবির বেদনাগভীর সহমর্মিতার প্রকাশই লক্ষিত হয় —

উঠিল উজ্জ্বল অসি করি ঝলমল,
দুর্ব্বল প্রদীপালোকে; নামিল যখন,
সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্র সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী (১৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### ৩.২.২ ক্লাইব চরিত্র

প্রথম সর্গেই শেঠভবনের গোপন মন্ত্রণাসভায় ইংরেজের সাহায্য নিয়ে সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা গৃহীত হতে দেখা যায় —

অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে —

অথবা ক্লাইবের বীরত্বের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে প্রথম স্বর্গেই —

সে ফরাশি যশোরবি সেই দিন হ'তে
ক্লাইবের কটাক্ষেতে গেছে অস্তাচলে।

স্বয়ং ক্লাইবকে উপস্থিত হতে দেখা যায় অবশ্য দ্বিতীয় সর্গে —

শিবির অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।

কাব্যে প্রকাশ ক্লাইব দেখতে খুব সুশ্রী ছিলেন না, কিন্তু তার দেহ ছিল সুগঠিত, বলিষ্ঠ। উন্নত কপাল তাঁর জ্ঞান ও সৌভাগ্যের প্রতীক। প্রশস্ত বক্ষপিঞ্জর তাঁর শৌর্য ও বীর্যের পরিচায়ক। প্রাথমিক পরিচিতি অংশেই কবি ক্লাইবকে যেরকম গম্ভীর চিন্তামগ্ন রূপে উপস্থাপিত করেছেন ক্লাইবের সেই গাম্ভীর্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বের পরিচায়ক। রূক্ষ্ম প্রকৃতির ও দৃঢ় চরিত্রের এই ব্রিটিশ যুবক যেমন উচ্চাকাঙ্খী তেমনি অসমসাহসী। সেইসঙ্গে তাঁকে কূটবুদ্ধি, বিচক্ষণ, আত্মপ্রত্যয়ী ও প্রতিজ্ঞায় অটল রূপে দেখানো হয়েছে কাব্যে।

প্রথম জীবনে ক্লাইব কিছুটা বখাটে স্বভাবের ছিলেন। নিতান্ত ভাগ্য পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই ক্লাইবের ভারতবর্ষে আসা। ফলে ক্লাইব একটু বেপরোয়া, ডানপিটে ধরনেরই ছিলেন। তাঁর সমস্ত সাফল্যের মূলে ছিল একটা অনমনীয় জেদ। কবি কৌশলে কাব্যের মধ্যে ক্লাইবের স্বগতচিন্তা সূত্রে তাঁর অতীত আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন —

নিরখিতে, — যেই দুরাচার
দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভয় হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার
পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে,—

এই স্বগতচিন্তার সুত্রেই দক্ষিণভারতের যুদ্ধগুলিতে তাঁর সাফল্যের, তাঁর কৃতিত্বের আখ্যানও বর্ণিত হয়েছে—

সেই দিন প্রভঞ্জন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া
পশিনু বিদ্যুৎবেগে দুর্গের ভিতরে
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে;

আর্কটের পরে যবনসৈন্যসহ কর্ণাটরাজের আক্রমণ প্রতিহত করার কথা ব্যক্ত হয়েছে, মাত্র পাঁচশ সৈন্য নিয়ে দশহাজার সৈন্যের মোকাবিলা করার কথা বলা হয়েছে।

ক্লাইব তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ও ভারতে পাওয়া সাফল্যের উপর নির্ভর করে একদিকে আশান্বিত আবার নবাবের বিরাট সৈন্যদলের বিপরীতে নিজেদের স্বল্পসংখ্যক অপটু সৈন্যসামন্তের কথা ভেবে সন্দিগ্ধচিত্ত। কাব্যে দেখা যায় আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ক্লাইবের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন স্বর্গীয় সৌন্দর্য শোভায় ভূষিত এক নারী যিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন — "ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,"। স্বর্গীয় সুন্দরী এই ইংলণ্ডেশ্বরীর আবির্ভাব যেন সংশয়াচ্ছন্ন ক্লাইবের আত্মসান্ত্বনা; যেন নিজ সংকল্পে স্থির ক্লাইবেরই আত্মবিশ্বাসী ভাবনার কাল্পনিক প্রতিরূপ।

ক্লাইবকে কবি ইতিহাসসম্মত রূপেই নির্মাণ করেছেন। উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন বলেই ক্লাইব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কর্মচারী থেকে কর্নেল এবং শেষপর্যন্ত গভর্নর পর্যন্ত হয়েছিলেন। সাহসী ছিলেন বলেই ঐ স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ নবাবের বিরাট সৈন্যদলের বিরূদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কূটবুদ্ধির ক্লাইব তাঁর সুচতুর বিচক্ষণতা দিয়ে সঠিকভাবেই সিরাজদ্দৌল্লার পরিবর্তে মিরজাফরকে ক্রীড়ানক নবাব রূপে নির্বাচন করেছিলেন। ক্লাইবের প্রতিজ্ঞা-অটল আত্মপ্রত্যয়ের জন্যই দেখা যায় তৃতীয় সর্গে যুদ্ধপূর্ব রাতে  সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষে নিজ জাতীয় বীরত্বের অহঙ্কারে নিজেকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন —

আমরা বীরের পুত্র, যুদ্ধব্যবসায়ী;
আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন;
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

কাব্যে ক্লাইবের স্বগতচিন্তার সূত্রে কবি তাঁর যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা নির্দেশ করুন।

.....

.....

.....

.....

### ৩.২.৩ মোহনলাল চরিত্র

মোহনলালের আবির্ভাব কাব্যের চতুর্থ সর্গে, মাত্র একবারই তিনি কাব্যে এসেছেন। তাঁর চরিত্রের কোনও বিস্তৃত পরিচয়ও কবি কাব্যে তুলে ধরেননি। কাব্য থেকে আমরা কেবলমাত্র জানতে পারি মোহনলাল নবাবপক্ষের সেনাপতি, তিনি বীর যোদ্ধা। নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হননি বরং প্রবল পরাক্রমে নবাবপক্ষের সৈন্যসহ তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে দুজন সেনাপতি নবাবপক্ষের হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন মিরমদন ও মোহনলাল। মোহনলাল ছিলেন কাশ্মীরি হিন্দু সেনাপতি, প্রায় পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও সাত হাজার পদাতিক সৈন্য তাঁর সঙ্গে ছিল। যুদ্ধের মাঝপথে অতর্কিতে এক গোলার আঘাতে মিরমদনের মৃত্যু হয়েছিল, এবং মোহনলালও শেষপর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেন।

কাব্যে দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে মিরমদনের মৃত্যুর পর তাঁর পক্ষের সৈন্যরা সেনাপতির মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যখন পলায়নপর —

সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মিরমদন পতন!
হুররে! হুররে!— করি গর্জ্জিল ইংরাজ;
নবাবের সৈন্যদল
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,

তখন সেই সৈন্যদের একত্রিত করে পুনরায় যুদ্ধে সামিল করার প্রয়াসে কাব্যে মোহনলালের আবির্ভাব —

দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!

যদি ভঙ্গ দেও রণ,

গর্জ্জিল মোহনলাল— নিকটে শমন!

ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনাকে সামনে তুলে ধরে আজকের যুদ্ধে জেতার জন্য মোহনলাল নবাবপক্ষের সৈন্যবর্গকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কাব্যে দেখা যায় নবাবপক্ষের যুদ্ধবিরত সেনাপতিদের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করেছেন মোহনলাল —

সেনাপতি! ছি ছি এ কি ! হা ধিক তোমারে

কেমনে বল না হায়!

কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,

সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে?

শুধু যে বাণিজ্যের সুবিধের জন্য ইংরেজরা যুদ্ধে নামে নি, এ যুদ্ধে হারলে যে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে

সেই কবিভাষ্যও মোহনলালের মুখে উচ্চারিত হয়েছে —

সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়।

.....

নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়

দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার

ঘুচিবে না জন্মে আর,

বীর যোদ্ধার পক্ষে যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন যে নিতান্ত লজ্জার, স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে থাকা যে নির্মম বেদনার, মান-সম্মান হারিয়ে প্রাণ বাঁচানো যে চরম হতাশার সে কথা বারংবার সৈন্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোহনলাল তাঁদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। দেশের সম্মান, কুলের গৌরব, যবন পরাক্রমের অতীত ঐতিহ্য, ক্ষত্রিয় তেজের অহঙ্কার, জাতীয় বীরত্বের মর্যাদা স্মরণ করে মোহনলাল সৈন্যদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বলেছেন। মোহনলালের চেষ্টায় নবাবের সৈন্যরা ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত হলে পরে হঠাৎই নবাবপক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। এই অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় বিভ্রান্ত নবাবপক্ষের সৈনিকেরা ইংরেজের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে নবাবের সৈনিকদের এই পরাজয় দেখে মুমূর্ষু মোহনলাল এক তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং অবশেষে সদ্য স্বাধীনতা হারানোর বেদনা বুকে নিয়েই মোহনলালের মৃত্যু হয়।

ক্ষত বক্ষে রক্তস্রোত ছুটিল তখন

সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন।

মোহনলালের এই স্বাধীনতা হারানোর হাহাকারে, ভবিষ্যৎ পরাধীনতার বেদনায়, স্বাদেশিকতার বোধই প্রকাশ লাভ করেছে। অবশ্য মোহনলালের এই দেশাত্মবোধ হিন্দু শৌর্যের প্রতি অনুরাগ ও যবন আনুগত্য এই দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত। একদিকে মোহনলাল সূর্যকে অনুরোধ করেছেন —

ডুবায়ে যবন রাজ্য যেও না তপন!

অন্যদিকে বলেছেন —

আজি হ'তে যবনের হ'ল হতবল

কিবা ধনী, মধ্যবিৎ কিবা দীন হীন,

আজি হ'তে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল।

একবার তিনি বলছেন —

ছিল না ঐশ্বর্যে বীর্যে এই ধরাতলে

সমকক্ষ যবনের,— বীর-পরাক্রম

অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।

আবার তিনিই বলছেন —

বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী—

এই মহাবাক্য যার ইতিহাসগত;

সেই জাতি এ ভারত করি পরাধীনি,

—পাণিপথে আত্মদ্রোহী হ'ল আত্মহত।

সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,

সোনার বাঙ্গালারাজ্য দিল বিসর্জন

তথাপি মোহনলালের এই খেদোক্তিই একটা সময়ে ছিল 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের জনপ্রিয়তার মূল কারণ। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত মোহনলালের ভাষ্যে কবি যে আক্ষেপকে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে আসলে লুকিয়ে ছিল কবির সমকালীন শিক্ষিত বাঙালির আবেগ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায় — "সে যখন রণক্ষেত্রেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিল,— শক্তিহীনতার দরুণ নহে, স্বার্থপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রের রন্ধ্রপথেই বাঙ্গালীর স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত হইয়া গেল, তখন তাহার মর্মভেদী কাতরোক্তিতে কি বন্ধন-জর্জরিত মুমূর্ষু বাঙ্গালীরই সম্মিলিত আর্তনাদ ফুটিয়া উঠে নাই?" (সুবোধরঞ্জন রায়, *পলাশির যুদ্ধ*, ভূমিকা,

কলকাতা, ১৯৫৯) প্রকৃতই মোহনলালের এই কথনের মধ্য দিয়ে কবি সেকালের জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিলেন —

আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,

গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার;

ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,

ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর।

সুতরাং 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রধান যে ভাব স্বদেশানুরাগ তা প্রধানত মোহনলালের চরিত্রকে আশ্রয় করেই কাব্যে প্রকাশিত। অর্থাৎ কবি নবীনচন্দ্রের মূলভাবের বাণীবাহক চরিত্র এই মোহনলাল।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলাল যেভাবে সৈন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন তা বর্ণনা করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

### ৩.২.৪ লুৎফউন্নিসা চরিত্র

সিরাজপত্নী লুৎফউন্নিসা কাব্যের তৃতীয় ও পঞ্চম সর্গে দুবার আবির্ভূত হয়েছেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চরিত্র। অনাচারী, অত্যাচারী সিরাজদ্দৌল্লার স্ত্রী লুৎফউন্নিসা কাব্যে অত্যন্ত প্রেমময়ী, পতিগতপ্রাণা স্ত্রী রূপে অঙ্কিত। প্রকৃতই লুৎফউন্নিসার এই একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের ইতিহাস সাক্ষী। ইতিহাস থেকে জানা যায় — পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিরাজদ্দৌল্লা স্ত্রী ও কন্যা সহ ছদ্মবেশে বিহারের দিকে পলায়ন করছিলেন। পথে বেগম লুৎফউন্নিসার গাড়ি একজায়গায় কাদায় আটকে যায়। গাড়ি তুলতে সময় লাগছিল অথচ দেরি হলে সিরাজদ্দৌল্লার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা, সেকারণে লুৎফউন্নিসাকে ফেলেই সিরাজদ্দৌল্লার গাড়ি চলতে শুরু করল। সেখানেই সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে চিরদিনের মত লুৎফউন্নিসার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। অতঃপর সিরাজদ্দৌল্লা ধরা পড়েন ও তাঁকে হত্যা করা হয়। লুৎফউন্নিসা অবশ্য বেঁচে ছিলেন। মিরজাফরের পুত্র মিরণ তাকে নিকার প্রস্তাব পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। শোনা যায় লুৎফউন্নিসা যতদিন বেঁচেছিলেন প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি সিরাজদ্দৌল্লার কবরে বাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। পলাশির যুদ্ধ

অর্থাৎ সিরাজদ্দৌল্লার মৃত্যুর ৩৩ বছর পর ১৭৯০-এর নভেম্বর মাসে লুৎফউন্নিসার মৃত্যু হয়।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের তৃতীয় সর্গে উদভ্রান্ত নবাব মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে তাঁকে অবধারিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর পত্নী লুৎফউন্নিসা।

অবিশ্বাসী—আততায়ী—বধিল জীবন
বলিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল ভূতলে;
অমনি বিদ্যুৎ-বেগে করিয়া বেষ্টন
ধরিল রমণী ভুজ-মৃণাল-যুগলে।

লুৎফউন্নিসা তাঁর স্নেহকোমল হাতে নবাবকে ধরে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন। চিন্তাক্লিষ্ট, অতীত পাপের দুঃস্বপে জর্জরিত অস্থির নবাবকে তাঁর স্নেহ আলিঙ্গনে তাঁর সান্নিধ্যছায়ায় দুদণ্ডের শান্তি দিতে চেয়েছেন লুৎফউন্নিসা। অকৃত্রিম ভালবাসায় ও পরম মমতায় মুছে নিতে চেয়েছেন নবাবের সকল যন্ত্রণা।

এক ভুজবল্লী শোভে পতি-কণ্ঠতলে
অন্য করে মুছে নাথ-বদন-মণ্ডল;
থেকে থেকে তিতি বামা নয়নের জলে,
প্রেমভরে পতিমুখ চুম্বিছে কেবল।

সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করে কবি লুৎফউন্নিসাকে এমন এক অসহায়া নারী রূপে অঙ্কিত করেছেন প্রতিকারহীন অশ্রুবিসর্জন ভিন্ন যার কোনও পথ নেই।

এই রজনীতে
ফেলিতেছে সেই অশ্রু এই বিষাদিনী।

পঞ্চম সর্গে দেখা যায় কারাগারে পৃথক কক্ষে বন্দী লুৎফউন্নিসা। পতির চিন্তায় বিমর্ষ লুৎফউন্নিসা কল্পিত ঘাতকের হাত থেকে নবাবকে বাঁচাতে উন্মত্তের মত ছুটে গেছেন এবং কারাগারের লৌহকপাটের আঘাতে আহত হয়েছেন। অতঃপর অনন্য কবিকল্পনায় ভাগ্যের পরিহাস বর্ণিত হয়েছে — একদিন পিঁপড়ে কামড়ালে যার পরিচর্যা করত সহস্র পরিচারিকা আজ সে রক্তাক্ত অবস্থায় একা শুশ্রূষাহীন, পাথরের শয্যায় শায়িত। সিরাজকে নৃশংস, পামর জেনেও লুৎফউন্নিসা ছিলেন তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত। নারীর সতীত্বের মহিমায় তিনি চেয়েছেন কারাগারের দুয়ার খুলতে, সিরাজদ্দৌল্লার প্রতি অপরিসীম প্রেমে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন মিরণের নিকার প্রস্তাব।

বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ এই কারাগারে,

লইব পাতিয়া বুকে উলঙ্গ কৃপাণ,

তথাপি এ রমণীর প্রেমপারাবারে

বিন্দুমাত্র বারি তোরে করিবে না দান।

ইতিহাসের তথ্য লুৎফউন্নিসা সিরাজের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কবি 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে লুৎফউন্নিসার মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কন করেছেন —

রক্তস্রোতে শোকস্রোতে হ'য়ে অচেতন

মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।

অবশ্য এতটুকু ইতিহাস বিচ্যুতিতে দাম্পত্য প্রেমের যে আবেগ ঘনীভূত হয়েছে তা কাব্যকে এক মহত্তর সৌন্দর্যে উত্তরিত করেছে। প্রেমের এই অপমৃত্যুর যন্ত্রণায় ম্রিয়মান প্রকৃতিও যেন অশ্রুভারাক্রান্ত —

কেবল রমণী শোকে নীরবে রজনী

বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

লুৎফউন্নিসা চরিত্রের মূলভাব ব্যাখ্যা করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ৩.২.৫ রানি ভবানী

কবি নবীনচন্দ্র রানি ভবানীকে এক আদর্শময়ী নারী হিসেবে তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের সংশে-যে সঞ্জাত তাঁর বহিরঙ্গের রূপ অন্তরের তেজস্বিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

একটি রমণীমূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,

গৌরাঙ্গিণী, দীর্ঘ গ্রীবা, আকর্ণ নয়ন,—

শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,

শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য গ্রন্থের প্রধান ভাব দেশাত্মবোধ রানি ভবানী চরিত্রের

মধ্য দিয়েও প্রকাশিত। মোহনলালের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম আবেগময় ও উচ্ছ্বাসবহুল রানি ভবানীর মধ্যে সেই স্বদেশপ্রেমই ঋজু, বিশে-ষণাত্মক, কঠিন যুক্তিনির্ভর ও সাহসী চিন্তাসর্বস্ব। সেকারণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন 'রাণীর কি মত' তখন রানি তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন আবেগতাড়িত হয়ে নয় বরং যুক্তিসহকারে। ইংরেজের সাহায্যে সিরাজদ্দৌল্লাকে অপসারণের সিদ্ধান্তে যখন সকলেই সম্মত তখন এই হীন চক্রান্তে লিপ্ত হওয়া যে কৃষ্ণনগরাধিপের সমীচিন নয় তা জানিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন —

ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী;—
ইংরাজ সহায় তাঁর,— কি করিবে তবে?

কবি নবীনচন্দ্র দেখিয়েছেন রানি ভবানী যেন ইংরেজের স্বার্থ ও মনোবাঞ্ছা অনুধাবন করে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত সিরাজধ্বংসের পরবর্তী পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন —

দেখিতেছি দিব্য চক্ষে সিরাজদ্দৌল্লায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।

তাঁর মতে সিরাজদ্দৌল্লার মত অত্যাচারী, অনাচারী, অবিবেচক শাসকের অপসারণ জরুরি কিন্তু তার জন্য বিদেশি ইংরেজ শক্তির সহায়-সুবিধে নেওয়া অসংগত, অন্যায়। যবনেরাও বিদেশাগত একথা মেনে নিয়েও তিনি বলেছেন 'সার্দ্ধপঞ্চশতবর্ষ' একত্র বসবাসের হেতু তাঁরা এদেশেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন —

অশত্থ-পাদপ জাত উপবৃক্ষের মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত।

সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসন চ্যুত করার ভিন্নপথ তিনি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন বিদেশি বণিক শক্তির সাহায্য না নিয়েও দেশীয় রাজারা একত্রিত হয়ে যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাতে পারেন।

নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে;

কবি নবীনচন্দ্র কাব্যের মধ্যে রানি ভবানীর চরিত্রে দুই বৈপরীত্যের সমন্বয়

দেখিয়েছেন — একদিকে তাঁর কঠোর চিত্তের অনমনীয় দৃঢ়তা অন্যদিকে তাঁর কোমল চিত্তের মমতাময় মহানুভবতা। একদিকে নিজের আদর্শ ও মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঋজুভাবে তীক্ষ যুক্তি জাল বিস্তার অন্যদিকে নৃশংস সিরাজদ্দৌল্লার প্রতিও দয়া প্রদর্শন।

আহা! কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়!

অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্না এই অসাধারণ চরিত্রটি তেজস্বিতা, মাধুর্য, সৌন্দর্য, আভিজাত্য, সৌজন্যের সমাহারে কবি নবীনচন্দ্রের এক অনুপম সৃজন। স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল রানি ভবানী কাব্যের মূল ভাব দেশাত্মবোধ প্রণোদিত করার ক্ষেত্রে কবি নবীনচন্দ্রের এক আদর্শ রূপায়ণ।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

সিরাজদ্দৌল্লার অপসারণ সম্পর্কে রানি ভবানীর মতামত ব্যক্ত করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

### ৩.২.৬ অপ্রধান চরিত্র

কাব্যে অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত চরিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, সংখ্যায় তারা পাঁচজন বলে প্রথমেই উল্লেখিত।

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল,

বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন;

এই পাঁচজন হলেন যথাক্রমে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মন্ত্রী রায়দুর্লভ সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজাফর, জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ। এরমধ্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মিরজাফরকে কাব্যের পঞ্চম সর্গেও দেখা যায়, অন্যদের উপস্থিতি শুধু প্রথম সর্গেই সীমাবদ্ধ। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত প্রত্যেকেই যে সিরাজবিরোধী বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্য দিয়েই তাঁদের স্বকীয় চরিত্রভাব অভিব্যক্ত। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছিলেন — "কবি অতি সাবধানে সুকৌশলে ইহাদের এক একজনের মনের ভাব এক এক ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র রক্ষা করিয়াছেন।" (কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *বান্ধব* পত্রিকা)

কাব্যে দেখা যায় মন্ত্রীবর রায়দুর্লভ প্রথম মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সম্ভাষণ করে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তিনি প্রাথমিক ভাবে এই ষড়যন্ত্র অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন —

অনেক চিন্তার পরে করিলাম স্থির,

আমা হতে এই কর্ম্ম হবে না সাধন।

প্রথমে তাঁর কথা শুনে মনে হয় কৃতঘ্নতা বলেই বুঝি এই চক্রান্তে তাঁর আপত্তি, কিন্তু অল্প পরেই বোঝা যায় এ সবই তাঁর ছলচাতুরি ও পরিকল্পিত কূটকৌশলের অন্তর্গত কপট অভিব্যক্তি। যখন তিনি বলেন —

একে রাজ-বিদ্রোহিতা! তাহে অনিশ্চিত

এই পাপ পরিণাম— হিত, বিপরীত!

তখন বোঝা যায় এই চক্রান্তের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে, রাজপদে থেকে যতটুকু সুখভোগ তাও হারিয়ে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কাই তাঁর আপত্তির মূল কারণ। নিরাপত্তার অভাববোধে ভীত, সুবিধেবাদী মানসিকতার এক বিশেষ চরিত্ররূপ এই চরিত্রটি।

জগৎশেঠ সে তুলনায় অনেক অকপট। তাঁর ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধস্পৃহায় যে কোনও মূল্যে তিনি সিরাজদ্দৌল্লার বিনাশ কামনা করেন। তিনি বলেছেন সমস্ত পৃথিবীও যদি সিরাজদ্দৌল্লার পক্ষে দাঁড়ায় অথবা নগণ্য ক্ষমতার শুধু মানুষ কেন ঈশ্বরও যদি সিরাজদ্দৌল্লার পক্ষ নেয় তথাপিও তিনি সিরাজের রক্তে অপমানের জ্বালা জুড়াতে দৃঢ় সংকল্প। সেই প্রতিজ্ঞাপূরণের জন্য যদি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁকে একা যুদ্ধ করতে হয় তার জন্যও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু অপমানের বদলা তাঁর চাই —

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,

প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর!

ক্রোধের গনগনে আগুনে, প্রজ্জ্বলিত প্রতিজ্ঞায় জগৎশেঠের চরিত্র মুখর।

অতঃপর বক্তব্য রেখেছেন কূটভাষী রাজবল্লভ। জগৎশেঠের মত উচ্চগ্রামে বাঁধা নয় তাঁর কথার সুর। সিরাজদ্দৌল্লার সমস্ত অন্যায়, অনাচার, পাপ, অত্যাচারের বিবরণীসহ তিনিই প্রথম মত প্রকাশ করেছেন —

মম এই অভিপ্রায়—

সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়

রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,

(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়!)

সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে

সমর্পি এ রাজ্যভার।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কবি দেখিয়েছেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থের তাড়নায় নয়, রাজ্যশাসনে অমনোযোগী, বিলাসমত্ত সিরাজদ্দৌল্লার প্রজাপীড়নে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তার প্রতিকার চেয়েছেন। তিনি স্পষ্টবক্তা, উপায়ন্তর হয়ে তিনি এই ষড়যন্ত্রে সামিল। পঞ্চম সর্গে কৃষ্ণচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব লক্ষিত হয়, পট্টবস্ত্র পরিহিত, উত্তরীয় গলায় তিনি দেবপূজায় রত।

এরূপে মুঙ্গের দূর্গে বসিয়া পূজায়,

কৃষ্ণনগরের পতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

জনশ্রুতিমতে জানা যায় সিরাজদ্দৌল্লা যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে মুঙ্গের দুর্গে কারারুদ্ধ করেছিলেন এবং যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রাণদণ্ডের আদেশও প্রেরণ করেন। রাজা ইষ্টদেবতার পূজায় বসেন, পুজাশেষে আদেশ কার্যকর হবে। দীর্ঘ পূজায় সময় অতিবাহিত হয়, ইতিমধ্যে যুদ্ধে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় হয় এবং রাজার প্রাণদণ্ড মকুব হয়। এই কিংবদন্তির আখ্যানকেই নবীনচন্দ্র কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

সমগ্র কাব্যে মিরজাফরের নির্বাক উপস্থিতি, কাব্যে তাঁর কোনও বক্তব্য প্রকাশিত নয়। প্রথম সর্গে দুটি ভাষণ শেষে মিরজাফর সম্পর্কে কবির দুটি ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ মন্তব্য আছে যা থেকে মিরজাফর চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম মন্ত্রী রায়দুর্লভ যখন কপট ছলনায় ষড়যন্ত্র অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেন তখন মিরজাফরের আচরণ সম্পর্কে কবি বলেছেন —

নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,

প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।

অর্থাৎ সমস্ত আশা ব্যর্থ হয় বুঝি এই আশঙ্কায় সকলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার মধ্যে যে লোভ, স্বার্থপরতা, সুযোগ বুঝে সুবিধে নেবার যে হীন মনোবৃত্তি তা নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে। আবার রাজবল্লভের মুখে মিরজাফরের হাতে রাজ্যভার সমর্পণের প্রস্তাব শুনে মিরজাফরের যে মনোভাব কবি তুলে ধরেছেন —

উঠিল কাঁপিয়া

দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

সেখানে স্পষ্টতই আত্মহিতচিন্তায় বিভোর এক অকর্মণ্য চরিত্রের ছবি ফুটে উঠেছে।

পঞ্চম সর্গে দেখা যায় পরাজিত সিরাজদ্দৌল্লার মসনদে আসীন মিরজাফর।

চারপাশে স্তাবক পরিবৃত, অহিফেনসেবী নবীন নবাব মিরজাফর বার্ধক্যে স্থবির কিন্তু রমণী বিলাসে মত্ত —

সেই মিরজাফরের সেই সিংহাসন!
স্তাবকে বেষ্টিত হয়ে ব'সে সভাতলে,
অহিফেনে সঙ্কুচিত যুগল নয়ন;
হৃদয় করিছে স্ফীত চাটুকার দলে।
প্রাচীন-বয়সে শ-থ শ্রবণবিবরে,
ঢালিছে কোকিলকণ্ঠা কামিনী কুহরে
বিমল সঙ্গীত-সুধা;

এখানেও মীরজাফরের চালচলনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্য দিয়েই তাঁর চরিত্রের পরিচয় পরিস্ফুট। কামনা পূরণের এই নির্লজ্জ আয়োজনের বর্ণনায় চাটুবাক্যে তৃপ্ত, নেশাসক্ত, ক্ষমতালোভী, অকর্মণ্য, জড়াগ্রস্ত, এক স্থবির মানুষের ছবিই ফুটে ওঠে।

এই পাঁচটি চরিত্র ছাড়া মিরজাফর পুত্র মিরণ, সিরাজের হত্যাকারী মহম্মদী বেগ, অসংখ্য ভৃত্য, পরিচারিকা ও নর্তকী, উভয়পক্ষের সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি অপ্রধান চরিত্রের উল্লেখ আছে কাব্যে। অত্যাচারী মিরণের নির্মম, নৃশংসতা; মহম্মদী বেগের নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতা এ সমস্তই কবি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন কাব্যে। প্রায় সমস্ত চরিত্রেরই আবির্ভাব, বিকাশ ও পরিণাম ইতিহাসসম্মত ভাবে অঙ্কিত। কোনও কোনও চরিত্রের কর্মকাণ্ডের মধ্যে জনশ্রুতি বা কবিকল্পনার ছায়াপাত হলেও তার কারণে নিদারুণ ভাবে কোনও ঐতিহাসিক তথ্যের সত্য বিকৃত হয় নি। সুতরাং চরিত্রপ্রধান কাব্য না হয়েও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের চরিত্রগুলি মোটামুটি যথাযথ ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

মিরজাফর চরিত্রটিকে কবি কিভাবে উপস্থিত করেছেন কাব্যে তা আলোচনা করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"তাই বলি 'পলাশির যুদ্ধে' পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য চরিত্রচিত্রণের অভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার অবকাশ কবি রাখেন নাই। যদিও চরিত্রচিত্রণ নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না, তবু কাহিনী এবং পরিবেশসূত্রে সমাগত বিচিত্র চরিত্রসমূহের এক একটি বৈশিষ্টপূর্ণ দিকে তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করিয়া কবি তাহাদিগকে উজ্জ্বলতায় ভরিয়া দিয়াছেন।" *পলাশির যুদ্ধ* অধ্যাপক এ. এল. ব্যানার্জি সম্পাদিত, অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায়লিখিত ভূমিকা অংশ, কলকাতা, ১৯৫৯

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

(ক) মোহনলাল চরিত্রে কবি যে স্বদেশপ্রেমের ভাব ব্যক্ত করেছেন তা ব্যাখ্যা করুন।

(খ) 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অপ্রধান চরিত্রগুলির পরিচয় দিন।

## ৩.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম কাব্যে নারী পুরুষ উভয় চরিত্রই উপস্থিত এবং চরিত্রগুলি ভূমিকা অনুযায়ী প্রধান ও অপ্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। সিরাজদ্দৌল্লা, ক্লাইব, মোহনলাল, লুৎফউন্নিসা, রানি ভবানী প্রমুখ চরিত্র এক একটি পৃথক ভাবের বাহক রূপে এক একটি সর্গে প্রাধান্য লাভ করেছে। অপ্রধান চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। সমস্ত চরিত্রই ইতিহাস-অনুগ ভাবে অঙ্কিত করেছেন কবি। কেবলমাত্র কারাগারে লুৎফউন্নিসার মৃত্যুর যে ছবি লেখক দেখিয়েছেন তা ইতিহাসসমর্থিত নয়, কারণ ইতিহাসে আছে সিরাজের মৃত্যুর পরও লুৎফউন্নিসা দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি সিরাজদ্দৌল্লার কবরে প্রতি সন্ধ্যায় ফুল ও প্রদীপ দিতেন। যদিও এই বিচ্যুতি কোনও মারাত্মক ত্রুটি হয়ে ওঠেনি।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

ঐতিহাসিক গাথাকাব্য 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের পর নবীনের কবিখ্যাতি সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কাব্যটির প্রসার সর্বাগ্রে হইয়াছিল পূর্ববঙ্গে, পাঠ্যপুস্তক রূপেও আদৃত হইতে বিলম্ব হয় নাই। প্রকাশিত হইবার এক বৎসরের মধ্যেই ঢাকা ও বরিশাল হইতে যথাক্রমে অজ্ঞাতনামার 'পলাশির যুদ্ধের ব্যাখ্যা' ও রাজমোহন চক্রবর্তীর 'পলাশির যুদ্ধের টীকা' বাহির হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন

## ৩.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

রানি ভবানী :

বরিশালের নাটোর অঞ্চলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমিদার-পত্নী। পুণ্যবতী ও দানশীলা রমণী রূপে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

## ৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

প্রশ্নের তালিকা চতুর্থ বিভাগে সংযোজিত হয়েছে।

## ৩.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

চতুর্থ বিভাগে দ্রষ্টব্য।

* * *

# বিভাগ- ৪
# পলাশির যুদ্ধ
## পলাশির যুদ্ধ : কাব্যমূল্যায়ন

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ কাব্যমূল্যায়ন

৪.২.১ পলাশির যুদ্ধ কাব্যের প্রকৃতি

৪.২.২ কাব্যে স্বদেশানুরাগ

৪.২.৩ কাব্যের ভাষা-অলঙ্কার-ছন্দ

৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ৪.০ ভূমিকা (Introduction)

সভ্যতার উষালগ্নে প্রাচীন লোকায়ত সমাজে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খাদ্য, নারী ও ভূমির অধিকার নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। নানা কারণে এক একটি গোষ্ঠীকে পুরনো বসতি ছেড়ে নতুনবসতির দিকে চলে যেতে হত। তখন যুদ্ধবিগ্রহ, স্থানান্তরে গমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা প্রদান ইত্যাদিতে নেতৃত্ব দেবার জন্য গোষ্ঠীর মধ্যে এক একজন নায়কের উদ্ভব হত। সেইসব নায়কের যশ ও কীর্তি বর্ণনা করে নানা সত্য-মিথ্যা কাহিনির আশ্রয়ে আখ্যান নির্মিত হত ও সেগুলি মুখে মুখে গীত হত। সভ্যতার একটা পর্যায়ে এইসব বিচ্ছিন্ন কাহিনি সংগ্রথিত হয়ে এক বিশেষ কাব্যরূপ লাভ করে। একেই প্রাচীন যুগের মহাকাব্য নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীসে হোমারের লেখা ইলিয়ড ও ওডিসি এবং ভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারত এই ধরনের মহাকাব্যের নিদর্শন। অর্থাৎ হোমার, বাল্মীকী, ব্যাসদেবের এই মহাকাব্য প্রাথমিক ভাবে মৌখিক রীতিতে রচিত ও পরবর্তীকালে সংকলিত। কোনও একজন বীরপুরুষের নামে দীর্ঘদিন ধরে মুখে মুখে প্রচলিত থাকার ফলে এই ধরনের কাব্যে একটা গোটা জাতির আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা, তত্ত্ব-দর্শনের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে। এ ধরনের কাব্যকে জাত বা স্বতস্ফুর্ত মহাকাব্য বলে। ইংরেজিতে বলে Epic of Growth বা Original Epic আধুনিক কালের সমালোচক Aber Crombie তাঁর *The Epic* গ্রন্থে এই জাতীয় মহাকাব্যকে Authentic Epic নামে চিহ্নিত করেছেন।

পরবর্তীকালে যখন মৌখিক সাহিত্যের পরিবর্তে লিখিত সাহিত্যের অবির্ভাব হয়েছে, তখন এক একজন প্রতিভাধর কবি প্রাচীন মহাকাব্যের অনুসরণে কাব্য রচনার প্রয়াস করেছেন। "যেমন পাশ্চাত্যের ভার্জিল, দান্তে, টাসসো, মিল্টন এবং ভারতের কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ — এঁরা প্রাচীন মহাকাব্যের উপাদান গ্রহণ করে নিজ নিজ কাব্যের কাঠামো নির্মাণ করেন।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৯৫, কলকাতা, ১৯৯২)। মৌখিক মহাকাব্য এক ঐতিহ্যবাহী ভাষায় রচিত সেখানে ঘটনা, কাহিনি, শব্দ, অলঙ্কারের পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। বিপরীতে লেখ্য রীতির মহাকাব্যগুলি কাব্যিক প্রতিভার অনন্য নিদর্শন, ফলে সেখানে ভাষাবিন্যাসে জটিলতা, শব্দ ব্যবহারে অভিনবত্ব, ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে আড়ম্বর লক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে রচিত এই ধরনের মহাকাব্যকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মহাকাব্যের সংজ্ঞা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মতে সমরূপ নয়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্য সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায় প্রধানত বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পন' ও আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থ দুটিতে। ভারতীয় মতে মহাকাব্য অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সুচনা থাকবে, সর্গের অন্তর্গত প্রধান বিষয়ের নাম অনুযায়ী সর্গের নামকরণ হবে। নায়ক হবে সৎ বংশীয়, ধীরোদাত্ত, ক্ষত্রিয়; শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত রসের যে কোনও একটি অবলম্বনে মহাকাব্য রচিত হবে। মহাকাব্যের সূচনায় বন্দনা অংশ থাকবে। মহাকাব্যে সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নরক, নগর, যুদ্ধগমন, বিবাহ, পুত্রজন্ম, ইত্যাদির সুচারু বর্ণনা থাকবে।

মহাকাব্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য ধারণার প্রধান পরিচয় পাওয়া যায় অ্যারিস্টোটলের 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে। অ্যারিস্টোটল তাঁর গ্রন্থে ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে মহাকাব্যের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। প্রথমত, কাহিনি, চরিত্র, বচন, চিন্তা, দৃশ্য ও সংগীত সহ ট্র্যাজেডি ষড়ঙ্গ কিন্তু মহাকাব্য কেবল কাহিনি, চরিত্র, বচন ও চিন্তা নিয়ে রচিত। দ্বিতীয়ত, মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডি উভয়েরই বিষয় Serious কিন্তু এককেন্দ্রিক ট্র্যাজেডির তুলনায় মহাকাব্যের বিশালতা অনেক ব্যাপক। তৃতীয়ত, ট্র্যাজেডিতে যেমন কেবলমাত্র সংলাপের মধ্য দিয়েই কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র, বর্ণিত হয়, কিন্তু মহাকাব্যে সংলাপ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিবৃতিও ব্যবহৃত হয়। চতুর্থত, ট্র্যাজেডিতে মেশিনে চড়ে দেবতার আবির্ভাবের কথা থাকলেও মহাকাব্যে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি। পঞ্চমত, ট্র্যাজেডির ঘনসন্নিবদ্ধ প-টের তুলনায় মহাকাব্যের প-ট অসংবদ্ধ। ষষ্ঠত, ট্র্যাজেডিতে কেবলমাত্র রূপক অলঙ্কার ব্যবহৃত হয় কিন্তু মহাকাব্যে অলঙ্কারের ব্যবহার বৈচিত্রপূর্ণ। সপ্তমত, ট্র্যাজেডিতে ব্যবহৃত তিন মাত্রার ছন্দের পরিবর্তে মহাকাব্যে ছয় মাত্রার ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।

সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে মহাকাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় আকারগত বিশালতা, আখ্যানের বিস্তৃতি, চরিত্রের উদাত্তভাব ও ভাবাদর্শের এক সার্বজনীনতা মহাকাব্যকে অন্যসব কাব্যসাহিত্য থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে। মহাকাব্যের আখ্যানে চরিত্র, ঘটনা, বর্ণনা, রচনাশৈলী কোথাও যেন কার্পণ্যের চিহ্নমাত্র নেই; এক সুবৃহৎ মহত্ত্ব, এক ঐশ্বর্যময় মহা আড়ম্বর যেন মহাকাব্যের সর্বত্রই বিরাজিত। মহাকাব্যের এই সার্বিক বিরাটত্বের সামনে মানুষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতা।

বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক মহাকাব্য লেখার একটা প্রয়াস দেখা যায় উনিশ শতকে। উনিশ শতকেই আবির্ভূত মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রকরণ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক নাটক সংযোজন করেছিলেন, সনেট লিখেছিলেন, এই একই প্রবণতায় তিনি ভার্জিল, মিল্টন, দান্তের অনুকরণে বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। অবশ্য 'মেঘনাদবধ' রচনাকালে ১৮৬০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে লিখেছিলেন "Let me write a few epiclings and thus acqeire a pacca fist" অর্থাৎ তাঁর ভাষায় 'মেঘনাদবধ' ছিল Epicling এবং হাত পাকাবার প্রয়াস মাত্র। তবে পাকা হাতে আরও কিছু করার সুযোগ জীবন আর তাঁকে দেয় নি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যে বীররসের চেয়ে করুণরস প্রাধান্য লাভ করেছে অথবা 'মেঘনাদবধ'-এর কাহিনি বিস্তারে মহাকাব্যিক বিশালতার অভাব আছে ইত্যাদি ধরনের সমালোচনা সত্ত্বেও উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্যিক মহাকাব্যের শিরোপা লাভ করেছে 'মেঘনাদবধ' কাব্য

১৮৬১-র জানুয়ারিতে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ১ম খণ্ড (১-৫ সর্গ) প্রকাশিত হয় এবং ২য় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) সম্ভবত ঐ বছরেরই মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয়। রামায়ণে বর্ণিত মেঘনাদবধের ঘটনাটিকে কাহিনিসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন মধুসূদন। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে রাবণের রাজসভায় ভগ্নদূতের প্রবেশ এবং মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রার অনুমতিলাভে কাব্যের সুচনা। অতঃপর বিভীষণের পরামর্শে ও সাহায্যে লক্ষ্মণ  নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে এবং পূজায় রত রাবণপুত্র মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে পরাস্ত করে। লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যুর পর মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রমীলার সহমরণযাত্রা এবং রাবণের শোকার্ত বিলাপে কাব্যের পরিসমাপ্তি। মোটামুটি তিন দিন ও দু রাত্রির ঘটনাবলীকে মধুসুদন নয় সর্গে বিন্যস্ত করেছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্য নয় সর্গে রচিত হওয়ায় অষ্টাধিক সর্গে মহাকাব্য রচনার ভারতীয় আলঙ্কারিক রীতি রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য মধুসূদন তাঁর কাব্য রচনায় হোমারকেও যথেষ্টই অনুসরণ করেছেন। হোমারের মতই তিনি কাব্যটি কাহিনির মধ্যবর্তী অংশ থেকে শুরু করেছেন, লাতিনে যাকে বলে medias res। একটি একক ঘটনা এই বর্ণনা কৌশলে সংহত ও সংবৃত রূপ লাভ

করেছে। মধুসূদনের বহু চরিত্রে হোমার সৃষ্ট চরিত্রের প্রভাব পড়েছে। গ্রিসের দেবতা জিউস-হেরার প্রতিকল্প শিব-উমা, হেকতারের পরিণামের সঙ্গে মেঘনাদের পরিণামের মিল আছে ইত্যাদি। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের গভীর প্রভাব সত্ত্বেও 'মেঘনাদবধ' কাব্যে ভারতীয়ত্ব বা বাঙালিত্ব ক্ষুন্ন হয়নি। এমনকি ঔপনিবেশিকতার হাত ধরে আগত ইংরাজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালির মানসজগতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আলোড়ন তুলেছিল তারও প্রভাব পড়েছে কাব্যে। অভ্যস্ত সংস্কারকে ভেঙে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শিখিয়েছিলেন মধুসূদন।

ইউরোপে ব্যঙ্গ মহাকাব্য রচনার যে প্রথা ছিল সেরকম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভেক-মুষিকের যুদ্ধ' বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গ মহাকাব্য। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যকে ব্যঙ্গ করে জগদ্বন্ধু ভদ্র 'ছুছুন্দরীবধ' কাব্যের প্রথম সর্গ রচনা করেছিলেন। এসব অতিক্রম করে মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। 'বৃত্রসংহার' কাব্যও দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড (১-১১ সর্গ) ১৮৭৫ সালে ও ২য় খণ্ড (১২-২৪ সর্গ) ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। পুরাণে বর্ণিত ইন্দ্র-বৃত্রের সংঘাত ইন্দ্রের হাতে বৃত্তের সংহার কাহিনিকে কিছু পরিবর্তিত করে হেমচন্দ্র তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেন। কাব্যের কাহিনিতে দেখা যায় — বৃত্র দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেন এবং স্ত্রী ঐন্দ্রিলার ইচ্ছাপূরণের জন্য ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে অপহরণের পরিকল্পনা করেন। শচীকে বলপূর্বক অধিকারের জন্য বৃত্র প্রেরিত দৈত্য ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। ক্রুদ্ধ বৃত্র পুত্র রূদ্রপীড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করেন ও শচীহরণের জন্য প্রেরণ করেন। জয়ন্ত রুদ্রপীড়কে বাধা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হন ও মূর্ছা যান। অপহৃত শচী স্বর্গে ঐন্দ্রিলার দাসী হতে বাধ্য হন। শচীর অপহরণে ক্রুদ্ধ শিব ইন্দ্রকে বলেন দধীচি মুনির অস্থি নির্মিত বজ্রেই বৃত্রের নিধন সম্ভব। শিবের কথামত ইন্দ্র দধীচির আশ্রমে যান এবং সবকথা শুনে দধীচি আত্মত্যাগে রাজি হন। অতঃপর দেব-দৈত্যের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় বারংবার এবং যুদ্ধে রুদ্রপীড়ের মৃত্যু হয়। ইন্দ্রের অনুরোধে বিশ্বকর্মা দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করেন এবং সেই বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হয় — এই হল মোটামুটি কাহিনি বিন্যাস। পরিধিগত বিশালতার সাপেক্ষে কাহিনি নির্বাচন যুক্তিযুক্ত, চরিত্র নির্মাণেও কৃতিত্ব আছে। কিন্তু রচনাসৌষ্ঠব, ছন্দ ব্যবহার ও ভাষাশৈলীতে 'বৃত্রসংহার' কাব্যের মহাকাব্যোচিত উৎকৃষ্টতা 'মেঘনাদবধ' থেকে কিছু পরিমানে কম। কাব্যপ্রতিভায় মধুসুদন নিশ্চিতভাবেই হেমচন্দ্র থেকে উৎকৃষ্টতর ছিলেন। রাম-রাবণ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ধারণার বিপর্যয়ে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে সিদ্ধরস কিছু পরিমাণে ব্যহত হয়েছে — এই মনোভাব থেকেই হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কাহিনি নির্বাচন করেছিলেন। যেখানে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের স্বর্গ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ, আয়োজনের মধ্যে স্বদেশ উদ্ধারের জাতীয় আবেগ সংশি-ষ্ট হয়ে থাকতে দেখা যায়। কারণ হেমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল জাতির আকাঙ্খাকে তুলে ধরার মাধ্যমেই 'বৃত্রসংহার' জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারে।

অত:পর আমরা দেখব নবীনচন্দ্রও সেকালের রীতি অনুযায়ী মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণ অবলম্বনে নব ভারতের একটি কল্পিত রূপ নির্মাণ করেছেন তাঁর রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যে। নবীনচন্দ্র দেখেছেন তাঁর সমকালীন ভারত, আর্য-অনার্য বিবাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিবিরোধে খণ্ড-বিখণ্ড, যেখানে সনাতন বৈদিক ধর্মের উদারতা নেই আছে মাত্র আচার-অনুষ্ঠানের আড়ম্বর। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম ও প্রেমভক্তির আদর্শে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতিষ্ঠা করবেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রচেষ্টায় বাধা আরোপ করেছেন ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি দুর্বাসা আর শ্রীকৃষ্ণকে সহায় করেছেন ব্যাস, অর্জুন ও সুভদ্রা যথাক্রমে তাঁদের জ্ঞান, শক্তি ও সেবা দিয়ে। দুর্বাসার সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে অর্জুন ও সুভদ্রার প্রেম ও বিবাহ অর্থাৎ শক্তি ও সেবার মিলন দেখানো হয়েছে রৈবতক কাব্যে। চক্রব্যুহের অভ্যন্তরে নিরস্ত্র অবস্থায় অভিমন্যুর মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে কুরুক্ষেত্র কাব্যে। পুত্রের মৃত্যুর পর অর্জুন জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। প্রভাস কাব্যে দেখা যায় শেষপর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড ভারত নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং দেশ কৃষ্ণপ্রেম ও বৈষ্ণবভক্তিতে নিমজ্জিত। যদুবংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার বর্ণনা রয়েছে প্রভাস কাব্যে। স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও কাব্য তিনটি এক বিরাট ও ঐক্যবদ্ধ কবি-কল্পনার অন্তর্গত। কবি আসলে মহাকাব্যিক বিশালতার আদর্শেই এই ত্রয়ীকাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও উচ্ছ্বাসবাহুল্য ও শিথিল রচনাভঙ্গি মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য সৃষ্টির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছে।

## ৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

ইতিপূর্বে আমরা 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের কবিপরিচিতি, কাব্যের বিষয়বস্তু এবং কাব্যে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছি। নবীনচন্দ্র যেহেতু মহাকাব্যধারার একজন কবি সেহেতু 'পলাশির যুদ্ধ' আখ্যানকাব্য রূপে মহাকাব্যের শ্রেণিভুক্ত কিনা তা বিচার করা জরুরি। সুতরাং মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার ধারা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট হল। অত:পর বর্তমান অধ্যায়ে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের শ্রেণিবিচার ও কাব্যের রচনাবৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হবে। বর্তমান অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ও বিশে-ষণ থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

- 'পলাশির যুদ্ধ কাব্যের প্রকৃতি।
- কাব্যে দেশাত্মবোধের স্বরূপ।
- ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার ব্যবহারে কাব্যের রচনাবৈশিষ্ট্য

## ৪.২. কাব্যমূল্যায়ন

এখন আমরা কাব্যের প্রকৃতিবিচার ও রচনাবৈশিষ্ট্য বিশে-ষণের মাধ্যমে

কাব্যমূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হব। কাব্যস্বরূপ নির্ণয়ই আমাদের প্রথম লক্ষ্য।

## ৪.২.১, পলাশির যুদ্ধ কাব্যের প্রকৃতি

মধুসূদনের পরবর্তী, হেমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সমসাময়িক নবীনচন্দ্র একই মহাকাব্য ধারার কবি রূপে স্বীকৃত। পলাশীর যুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় এবং বাংলার স্বাধীনতা লোপ এই ঐতিহাসিক কাহিনিকে ভিত্তি করে নবীনচন্দ্র পাঁচ সর্গে বিন্যস্ত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যের কাহিনিগত পরিকল্পনায় দেখা যায় সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, মিরজাফর প্রমুখের যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থেকে ক্লাইবকে জিততে সাহায্য করা, নবাব পক্ষের হয়ে মিরমদন-মোহনলালের প্রচণ্ড যুদ্ধ সত্ত্বেও সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত সিরাজকে পথিমধ্যে ধরে প্রথম কারারুদ্ধ করা ও পরে হত্যা করা — এই ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে কিংবদন্তি মিলিয়ে নবীনচন্দ্র কাহিনির কায়াকাঠামো নির্মাণ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত অবকাশরঞ্জিনীর কোনও কোনও খণ্ড কবিতায় যে দেশাত্মবোধ ও পরাধীনতার যে বেদনাবোধ বিভিন্ন বৈচিত্র্যে ব্যক্ত ছিল, মূলত সেই একই সুর নিহিত ছিল 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যখানিতে। অনতিদূর ইতিহাসের ঘটনাশ্রিত একটি কাহিনি অবলম্বনে দেশপ্রেমের অবরুদ্ধ আবেগ লিরিক উচ্ছ্বাসে মুক্তিলাভ করেছে এই কাব্যে। গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত কাব্যটি গীতিকবিতার লক্ষ্মনাক্রান্ত। রচনারীতিতে একটি সরল সৌন্দর্য ও ছন্দ ব্যবহারে মাধুর্য আছে, অলঙ্কারের ব্যবহারও পরিপাটি। তবে কাহিনিগঠন শিথিল ও চরিত্র রূপায়ন দুর্বল। সমালোচকের মতে "বায়রনের পরোক্ষ প্রভাব পলাশির যুদ্ধের স্থানে স্থানে আছে, সেই সময়ে লেখা অন্য কবিতায়ও আছে। পলাশির যুদ্ধ ইংরেজি স্পেনসরীয় স্তবকের অনুকরণে দশপয়ার-ছত্র বিশিষ্ট স্তবকে রচিত।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২৭৮, কলকাতা, ১৪০১)।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের পাঠপ্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে পত্রে জানিয়েছিলেন — "next, if at all to Meghnad"। তবে পরর্বীকালে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ১ম খণ্ডের সঙ্গে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের তুলনা করতে গিয়ে বলেছিলেন " বৃত্র-সংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, গীতিকাব্য আছে, সর্বোপরি চরিত্রচিত্রণ আছে। পলাশীর যুদ্ধে উপাখ্যান ও নাটকের ভাগ অল্প, গীতি অতি প্রবল।"(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদর্শন*) বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় পাঁচ সর্গে বিভক্ত ঐতিহাসিক আখ্যান নির্ভর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে গীতিরসের উচ্ছ্বাস মূর্চ্ছনা প্রকট, মহাকাব্যের গাম্ভীর্য সেখানে অনুপস্থিত। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের যে মত মহাকাব্য অষ্টাধিক সর্গে রচিত হতে হবে তাও এখানে গ্রাহ্য হয়নি। পাঁচ সর্গে বিন্যস্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে মহাকাব্যের সেই বিস্তৃতি, সেই বিশালতা দেখা যায় না।

কাহিনি, চরিত্র, ঘটনার থেকে কাব্যে একটি ভাব প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনি, চরিত্র, ঘটনা, গীতিরস, সমস্তই যেন সেই স্বাদেশিকতার আবেগকেই পরিপুষ্ট করেছে। পাশ্চাত্য সমালোচক এ ধরনের কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন — "Another division of narrative poetry which, with many resemblances to the epic, is yet distinguished from it in source, matter and method, is the metrical romance" ( Hudson, *An Introduction to the Study of Literature.* ) । সুতরাং 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য সম্পর্কেও বলা যায় যে মহাকাব্যের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্যযুক্ত এ কাব্যটিও আসলে ঐতিহাসিক পটভূমিতে গড়া আখ্যানধর্মী গাথাকাব্য।

পাঁচ সর্গে বিন্যস্ত 'পলাশির যুদ্ধ' আখ্যানধর্মী গাথাকাব্য হলেও তার গঠনশৈলী পঞ্চাঙ্ক নাটকের লক্ষ্মণবিশিষ্ট। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী পঞ্চাঙ্ক নাটকের ঘটনাবিকাশ যথাক্রমে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ — এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত। পাশ্চাত্যের নাট্যসমালোচক Freytag নাটকের গঠন ব্যাখ্যার জন্য যে Pyramidal Structure-এর ব্যবহার করেছিলেন তা নিম্নরূপ —

**CLIMAX**

**RISING ACTION** **FALLING ACTION**

**EXPOSITION** **EPILOGUE**

অর্থাৎ পাশ্চাত্য নাট্যের গঠনেও অনুরূপ পাঁচটি বিভাজন লক্ষ করা যায়। এখন 'পলাশির যুদ্ধ' নাটকের নাট্যবৈশিষ্ট্য আলোচনায় দেখা যায় ঘটনাগতি যেন সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাটকের গঠন অনুসারী। কাব্যের প্রথম সর্গে সিরাজদ্দৌল্লার বিরোধীপক্ষ গোপন মন্ত্রণাসভায় মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছেন সেখানেই নাট্যঘটনার সূচনা অর্থাৎ মুখ বা Exposition। দ্বিতীয় সর্গে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ক্লাইবের দেবী ব্রিটানিয়া কর্তৃক আশ্বস্ত হয়ে সসৈন্যে নদী পেড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যেন ঘটনার উর্ধ্বগতি। তৃতীয় সর্গে নিশ্চিত পরাজয় আশঙ্কায় বিলাসমত্ত সিরাজদ্দৌল্লার চিত্তবিকারই ঘটনাগতির শীর্ষ বা Climax। চতুর্থ সর্গে সিরাজদ্দৌল্লার পরাজয় ও মোহনলালের আক্ষেপে ঘটনাধারা নিম্নমুখী। পঞ্চম সর্গে সিরাজদ্দৌল্লার হত্যাদৃশ্যে নাটকের যবনিকাপাত বা নির্বহণ পাশ্চাত্যমতে Epilogue বা Catastrophe।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

রঙ্গমঞ্চেও সমাদৃত হয়েছিল 'পলাশির যুদ্ধ'। প্রকাশিত হওয়ামাত্র ন্যাশনাল থিটোরে অভিনীত হয়েছিল। গিরিশ ঘোষ ক্লাইবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নটজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় দিয়ে।

## ৪.২.২ কাব্যে স্বদেশানুরাগ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সিপাহিরা প্রথম মহাবিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন। যদিও সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজে সে বিদ্রোহের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল না বা বিদ্রোহিদের সমর্থনে তাঁদের কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও ছিল না। এমনকি শিক্ষিত বাঙালির একটা বড় অংশ বিদ্রোহিদের বিরোধিতা ও ইংরেজদের সপক্ষতাও করেছিলেন, অন্য একটি অংশ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিলেন। তবুও মনে হয় বিদ্রোহের একটা পরোক্ষ প্রভাব এবং বিদ্রোহদমনে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকের নৃশংস অত্যাচার দেশ ও জাতির মনে একটা ক্ষোভের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সেসময় থেকেই এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। মহাবিদ্রোহের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই নীলকর বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ১৮৬০-এ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির মনে ইংরেজবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঙালির জাতীয়তাবাদী চিন্তার মূলে হিন্দুত্বের জাগরণ একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮৬৭-১৮৮০ কালপর্যায়ে চৌদ্দবার হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে জাতীয়ভাবের কেন্দ্রে ছিল হিন্দুরাই। বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তাচর্চা প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর উল্লেখ থেকে জানা যায় — "যখন ব্রাহ্মসমাজে এই সকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনো রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমাদের তিনজনের কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহনবাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল।"(শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, পৃ-১৩৩, কলকাতা, ১৯৮৩) এখন আনন্দমোহন বসুর বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতা আগমন হয়েছিল ১৮৭৪-এ। মোটকথা উনিশ শতকের

দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙালির চিন্তা-চেতনায় যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বাদেশিকতা বোধের সুত্রপাত সেই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই নবীনচন্দ্রের জীবৎকাল অতিবাহিত। শিবনাথ শাস্ত্রী ও অমৃতবাজার পত্রিকার ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই তাঁকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল যার বিশেষ প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৮৭৫-এ প্রকাশিত তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থে।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও যে এই দেশাত্মবোধের প্রভাব পড়েছিল তার প্রমাণ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যে দেশাত্মবোধের প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। অবশ্য নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই দেশাত্মবোধ রাজপুত শৌর্যবীর্য বা পৌরাণিক বীরত্বের ছদ্মবেশে পরিবেশিত নয়। বরং অনতিদূর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ১৭৫৭-তে পলাশির প্রান্তরে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করেই 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি রচিত।

কাব্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ দ্বিবিধ ধারায় প্রকাশিত। কাব্যে প্রধানত দুটি চরিত্র এই স্বদেশভাবনা প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। রানি ভবানী তাঁর যুক্তিনির্ভর ভাষণে পলাশির যুদ্ধে ক্লাইবের পক্ষ নেওয়া যে আসলে স্বাধীনতা বিসর্জনেরই নামান্তর সেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবপক্ষের বিক্ষিপ্ত সেনাবাহিনীকে যখন স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে সামিল করার চেষ্টা করেছেন মোহনলাল তখন তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বান ছিল জাতীয়তাবাদের আবেগে উদ্দীপিত আর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সদ্য স্বাধীনতা হারানোর বেদনায় বিহ্বল আহত মুমূর্ষু মোহনলালের বিলাপে ছিল অকৃত্রিম দেশপ্রেম।

পলাশির যুদ্ধে জিতেই যে ইংরেজরা ক্ষান্ত হবে না, তারা যে সমগ্র দেশ করায়ত্ত করতে চাইবে; পলাশির যুদ্ধ যে ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তারের সূচনা মাত্র সে কথা সম্ভবত সেদিন কেউ বুঝতে পারেন নি, সে কথা বোঝা গিয়েছিল পলাশির যুদ্ধের বহু পরে। এক্ষেত্রে কবি নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক যুগভাবনা ব্যক্ত হয়েছে রানি ভবানীর ভবিষ্যৎবাণীতে। সেকারণে রানি ভবানীকে এমন এক দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী রূপে কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন কবি যিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত ইংরেজের রাজত্ব কায়েমের সেই অনাগত বিপদের সম্ভাবনাকে দেখতে পেয়েছেন দিব্যদর্শনে।

দেখিতেছি দিব্য চক্ষে সিরাজদ্দৌল্লায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়।

আবার মুসলিমরা বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ইংরেজের থেকে পৃথক কারণ তাঁরা এদেশের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে এদেশটাকে নিজের দেশের মত ভালবেসে এখানেই থেকে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ইংরেজকে ইসলামের থেকে পৃথক ঔপনিবেশিক শাসক শক্তি রূপে চিহ্নিত করার আর্থ-রাজনৈতিক তত্ত্বটিও রানি ভবানীর বিশে-ষণ নির্ভর চিন্তায় উপস্থিত।

সিরাজবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ক্লাইবের গোপন বোঝাপড়ার পিছনে ইংরেজদের যে স্বার্থ ও মনোবাঞ্ছা লুকিয়ে ছিল তাকে কবি মোহনলালের ভাষ্যে তুলে ধরেছেন। আসলে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের ফলে যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লুপ্ত হবে; ইংরেজের হাতে দেশের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে সে কথাই মোহনলাল ব্যক্ত করেছেন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে, তাঁদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়।

দেখিবে তাদের হায়।

রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,

বিপণি সমর-ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ এক বিশালসংখ্যক সৈন্যের চরম নিষ্ক্রিয়তায় সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত হলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মোহনলালের কণ্ঠে স্বাধীনতা হারানোর বেদনা ও ক্ষোভ মর্মস্পর্শী ভাবে ধ্বনিত হল। পরাধীনতার এই গ-ানিবোধ কবির সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালির যুগমানসিকতার প্রতিফলন যদিও তবুও নিঃসন্দেহে তার মধ্যে দেশহিতৈষিতা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ দেখা যায়। অবশ্য মোহনলালের ক্ষেত্রে এই দেশাত্মবোধ দ্বিধাবিভক্ত। নবীনচন্দ্রের সমকালে জাতীয়তাবাদী চিন্তা যেহেতু হিন্দুত্বনির্ভর ছিল সেহেতু সেই যুগমানসিকতার প্রভাবে মোহনলালের স্বদেশপ্রেমেও হিন্দুত্বের ভাবাবেগ নিহিত। হিন্দুত্বের অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা, হিন্দু শৌর্যের প্রতি অনুরাগ মোহনলালের আক্ষেপে ব্যক্ত; অথচ মোহনলাল যুদ্ধ করেছেন সিরাজদ্দৌল্লার পক্ষে ফলে যবন আনুগত্য তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক; সেকারণেই মোহনলালের স্বাধীনতা-চিন্তা এই দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে দ্বিখণ্ডিত।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"পলাশীর যুদ্ধ যে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তাহাতে সন্দেহ নেই"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদর্শন*

## ৪,২.৩ কাব্যের ভাষা-অলঙ্কার-ছন্দ

'পলাশির যুদ্ধ' ঐতিহাসিক ঘটনাআশ্রিত আখ্যানধর্মী গাথাকাব্য। এর কাব্যভাষায় আবেগের আতিশয্য ও গীতিরসের মূর্চ্ছনা লক্ষিত হয়। ভাষায় একটা গতিময়তা আছে এবং তা কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য দেশাত্মবোধের ভাবাবেগকে ধারণ করতে সক্ষম। যদিও কাব্যের ভাষা সর্বত্র সমান শিল্পগুণান্বিত নয়, স্থানে স্থানে

গদ্যধর্মী; তবুও তার মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। মধুসূদনের ন্যায় সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার নবীনচন্দ্রও করেছেন। যেমন — নিবিড়-জলদাবৃত, শজারুপৃষ্ঠ-কণ্টক, ব্যাধ-বন-নিপীড়ন, রাঘবশ্রেষ্ঠ-উরু-উপাধানে, অশিবব্যঞ্জক-শ্মশ্রু-আবৃত, প্রভঞ্জন-গতি, কারাগার-কক্ষান্তরে ইত্যাদি। মধুসূদন সদৃশ নামধাতুর ব্যবহারও নবীনচন্দ্রের কাব্যভাষায় দেখা যায় যেমন — নিবারিতে, গর্জ্জিল, বিশ্রামিতে, পরিস্কারি, নীরবিল, দ্রবিল ইত্যাদি। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যেও বিভিন্ন পৌরাণিক অনুষঙ্গের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

১) ভাবিছে জানকী যেন অশোক কাননে
আপন উদ্ধার-চিন্তা, বিষাদিত মন। (১ম সর্গ / ১৩)

২) সৈরিন্ধ্রীস্বরূপা বঙ্গে, পাপ-কামনায়
করেছে কি অপমান কীচক-যবন! (১ম সর্গ / ১৪)

৩) যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চমিথুন দুর্ব্বল
ব্যাধকবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে। (১ম সর্গ / ৪৩)

৪) অগ্নিতে নির্ভয় কভু সম্ভবে কি তার,
জতুগৃহে জ্ঞাতসারে বসতি যাহার? (১ম সর্গ / ৪৪)

৫) অথবা গোগৃহক্ষেত্রে যেমতি কৌরব,
সম্মোহন-অস্ত্রে যবে মোহিল পাণ্ডব। (৩য় সর্গ / ৪৬)

৬) ভয়, মানবের সুখ-সম্ভোগ বিনাশি,
ভীষ্ম-শরশয্যা আজি করেছে পলাশী! (৩য় সর্গ / ৪৭)

৭) নির্জ্জন কাননে বসি জনকনন্দিনী'
—নিদ্রিত রাঘবশ্রেষ্ঠ-উরু-উপাধানে—
ফেলেছিল যেই অশ্রু সীতা অভাগিনী,
চাহি পথশ্রান্ত পতি নরপতি পানে; (৩য় সর্গ / ৫০)

নবীনচন্দ্রের কাব্যভাষায় প্রবাদবাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন, (১ম সর্গ / ২৩)

অথবা —

পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে। (২য় সর্গ / ২৫)

কিংবা —

মরার উপরে কেন খাঁড়ার প্রহার? (৫ম সর্গ / ৪৪)

ইত্যাদি প্রবাদবাক্য ছাড়াও বিশিষ্টার্থক বাক্য বা বাগধারার ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন —

আকাশ পাতাল ভাবি বিষন্ন অন্তরে? (৩য় সর্গ / ২৫)

অথবা

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি, (৪র্থ সর্গ / ১৫)

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের ভাষা আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। কাব্যের আদ্যন্ত জুড়ে আছে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের পরিপাটি ব্যবহার। কবির দক্ষতার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত —

১) অনুপ্রাস দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী;
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল; (১ম সর্গ / ১)

অথবা অঙ্গনা-অঙ্গ-স্নিগ্ধ পরশনে
কাঁপিছে অনঙ্গ-বাণে অবশ হইয়া। (৩য় সর্গ / ৯)

২) যমক যেই করে করে মুখে আহার প্রদান,
কোন্ মূর্খ সেই কর কাটিবারে চায়? (১ম সর্গ / ১৭)

৩) উপমা পত্নীপুত্র-বিরহেতে হয়েছি এখন,
নিদাঘে পল্লব-শূন্য তরুর মতন। (১ম সর্গ / ৩১)

বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসিগণ
পলাইল বিনাযুদ্ধে;— কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন; (২য় সর্গ / ২৮)

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন;
যেমতি জলধিজলে
প্রকাণ্ড তরঙ্গদলে
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন! (৪র্থ সর্গ / ৫৩)
'তুচ্ছ ওই ক্ষুদ্র দ্বার'— বলি উন্মাদিনী
টানিতে লাগিল দ্বার করে সুকুমার,
যেমতি পিঞ্জরবদ্ধ বনবিহঙ্গিনি
চঞ্চুতে কাটিতে চাহে পিঞ্জর লোহার। (৫ম সর্গ / ৩১)

৪) রূপক চিন্তা-কালফণী
নাহি দংশে হৃদয়েতে, (৩য় সর্গ / ২৭)

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু জলে? (৪র্থ সর্গ / ৯)

৫) উৎপ্রেক্ষা সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, — অস্ত্র ঝলঝলে;
দূর হতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে। (২য় সর্গ / ২)

তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া
সুনীল আরশি খানি ভাঙ্গিল গড়িল! (২য় সর্গ / ৫৪)

শুনিয়া সাগরমাঝে শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী
নাচিবে, মরাল যেন নীল সরোবরে। (৪র্থ সর্গ / ১৬)

ইংরাজ সঙ্গিন করে
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে

ছুটিল পশ্চাতে যেন কৃতান্ত শমন। (৪র্থ সর্গ / ৬০)

৬) প্রতিবস্তুপমা নতুবা ক্লাইব কোন্ সাহসের ভরে,
ওই ক্ষুদ্র সৈন্য লয়ে,—নাহি মনে ভয়—
এ বিপুল সেনা মম সম্মুখ সমরে?
সরসীনিঃসৃত স্রোতে কোন মূঢ় জনে
সাহসে সিন্ধুর স্রোতে চাহে ফিরাইতে?
কিংবা কোন্ মূর্খ বল ভীম প্রভঞ্জনে
পাখার বাতাসবলে চাহে বিমুখিতে? (৩য় সর্গ / ৩১)

ফিরে যাই, কাজ নাই বিষম সাহসে,
স্ব-ইচ্ছায় কে কোথায় ব্যাঘ্র-মুখে পশে? (৩য় সর্গ / ৫২)

৭) সমাসোক্তি নাচে অত্যাচার, করে উলঙ্গ কৃপাণ; (১ম সর্গ / ৩৭)

কেবল রমণী শোকে নীরবে রজনী
বর্ষিতেছে শিশিরাশ্রু তিতিয়া অবনী। (৫ম সর্গ / ৩৪)

ইতিপূর্বে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে নবীনচন্দ্র অন্ত্যমিল বিশিষ্ট পয়ার ছন্দই ব্যবহার করেছেন। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে নেই কিন্তু, মিলনান্তক ছন্দের মাধুর্যে কাব্যটি গীতিরসপ্রধান। বাংলা কাব্যের এই সনাতন ছন্দোরীতি এক নতুন স্তবক বিন্যাসে কাব্যে উপস্থাপিত। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের স্তবকসজ্জা স্পেন্সেরীয় রীতিবিশিষ্ট। স্পেন্সেরীয় স্তবকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় "The stanza used by spenser in the Faerie Queene, consisting of eight 5-stress line followed by one 6 stressed line, with the rhyme scheme, a b a b b c b c c" ( Cassell's *Encyclopaedia of Literature* ) নবীনচন্দ্র পয়ারধর্ম অক্ষুন্ন রাখতে নয় পঙ্‌ক্তির এই স্পেন্সেরীয় স্তবককে দশ চরণের স্তবকে পরিণত করেছেন এবং পদান্ত মিলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ বিন্যাসরীতি ব্যবহার করেছেন।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

"একথা অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে সর্বত্রই অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *বান্ধব*

আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন

১। কাব্যভাষা প্রয়োগে মধুসূদনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সাদৃশ্য দেখান।

.....

.....

.....

.....

২। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে নাট্য-লক্ষণ নির্দেশ করুন।

.....

.....

.....

.....

## ৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম 'পলাশির যুদ্ধ' একটি আখ্যানধর্মী গাথাকাব্য। পাঁচ সর্গে বিভক্ত কাব্যের গঠন পঞ্চাঙ্ক নাটকের নাটকের লক্ষণবিশিষ্ট। উনিশ শতকে হিন্দুত্বের উত্থান ও স্বদেশের মুক্তিকে একত্রে মিলিয়ে যে জাতীয়তাবাদী ধারণার উদ্ভব হয়েছিল নবীনচন্দ্রকে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যেও আমরা অনুরূপ স্বাদেশিকতাবোধের প্রতিফলন দেখতে পাই। কাব্যের সৌন্দর্যবিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারে পারিপাট্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে স্বদেশানুরাগের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যবহারের পরিচয় দিন।

## ৪.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে কবি নবীনচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিন।

২। প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করুন।

৩। তথ্যবিকৃতির অভিযোগ ব্যাখ্যা করে সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্র কতখানি ইতিহাসসম্মত তা নির্দেশ করুন।

৪। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য অবলম্বনে ক্লাইব চরিত্রের পরিচয় দিন।

৫। নবীনচন্দ্রের মূলভাবের বাণীবাহক যে দুটি চরিত্র 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে স্বাদেশিকতার আদর্শ তুলে ধরেছেন তাঁদের পরিচয় দিন।

৬। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে অপ্রধান চরিত্রের পরিচয় দিন।

৭। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রধান নারীচরিত্রদুটির পরিচয় দিন।

৮। মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রকৃতি বিচার করুন।

৯। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের রচনাসৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## ৪.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (অষ্টম খণ্ড) : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) : সুকুমার সেন।

৩। নবীনচন্দ্র সেনের পলাশির যুদ্ধ অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায়ের ভূমিকা-সম্বলিত : অধ্যাপক এ. এল ব্যানার্জি সম্পাদিত।

৪। পলাশির যুদ্ধ : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

* * *

## বিভাগ- ৫
## সধবার একাদশী
### সধবার একাদশী : দীনবন্ধু মিত্রের পরিচিতি ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

**বিষয় বিন্যাস**


৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২ দীনবন্ধু মিত্র : পরিচিতি

৫.৩ সাহিত্য কৃতি

৫.৪ সধবার একাদশীতে মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব

৫.৫ নীলদর্পণ ও সধবার একাদশীর তুলনামূলক সমীক্ষা

৫.৬ বঙ্গীয় রেনেসাঁস এবং দীনবন্ধু মিত্র

৫.৭ বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র

৫.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৫.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৫.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৫.০ ভূমিকা (Introduction)

নানা কারণে 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, বাংলা সাহিত্যের দু'একজন নাট্যকারের মধ্যে, দীনবন্ধু মিত্র অন্যতম। অনেকের মতে তিনিই বাংলা নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের স্রষ্টা হিসেবে যেমন মধুসূদনকে ধরা হয়, তেমনি বাস্তবাদী, সমাজচিত্র সংবলিত সমসাময়িক সমাজ-জীবনের অতি স্পষ্ট আলেখ্য রচনাকার দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু মিত্রের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ ও সমবেদনাবোধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে জগৎ, জীবন ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম ও সহানুভূতি। আলোচ্য নাটকটি 'প্রহসন' কি 'কমেডি' কি 'সমাজচিত্র' তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের অবসান এখনো হয়নি। সবদিক থেকে বিচার করলে আমাদের মতে নাটকটি এই অভিধারই মিশ্রিত দিক — এবং সেজন্যই নাটকটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি, রাখে, 'সধবার একাদশী' বাংলার দুর্বল নাট্য সাহিত্যের একটি সবল সজীব সংযোজন, এতে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র শেক্সপিয়র দৃষ্টিভংঙ্গির পরিচয় দিয়ে আধুনিক ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মুকুটমণি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

## ৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আপনাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনধর্মী শ্রেষ্ঠ নাটক 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব, নাটককে বোঝার জন্য নাট্যকারকে জানা প্রয়োজন, এজন্য আমরা প্রথমে নাটকটির স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব। এরপর আমরা মূল নাটকের আলোচনায় প্রবেশ করব। এই অধ্যায়টি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা আপনাদের বুঝতে সাহায্য করবে —

- দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও সাহিত্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে।
- দীনবন্ধু-সাহিত্যে তথা বাংলা নাট্য সাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটির স্থান নিরূপণ করতে।
- আপনাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতে, যাতে আপনারা নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে পারেন এবং তা প্রকাশ করতে পারেন।

## ৫.২ দীনবন্ধু মিত্র : পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্য রচনার সমকালেই আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নাট্য সাহিত্যকাশে অবির্ভূত হন — ইনি দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাধর ও শক্তিশালী নাট্যকার। বলা যায় তিনিই বাংলা নাটককে প্রথম স্বয়ম্ভর হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। জন্মগ্রহণ করেন নদীয়ার চৌবেড়িয়ায়। পিতা ছিলেন কালাচাঁদ মিত্র। পিতা-মাতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন তিনি। দীনবন্ধুরা ছিলেন ছয় ভাই। শৈশবে তাঁর নাম ছিল গন্ধর্বনারায়ণ। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে দীনবন্ধু নামে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন বরাবর মেধাবী ছাত্র। চরম দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও বৃত্তিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন, দীনবন্ধু প্রথমে কিছুদিন হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজ করে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় পোস্টমাস্টারের চাকরিতে যোগদান করেন। বদলি চাকরি ও পদোন্নতির জন্য পরে নদিয়া, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়। এইসব অঞ্চলে কৃষক ও সাধারণ মানুষের কষ্ট, নীলকর পীড়ন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যা পরবর্তীকালে তাকে যুগান্তকারী 'নীলদর্পণ' নাটক লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। দীনবন্ধু ছিলে মনে-প্রাণে খাটি বাঙালি, এখানে দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে "কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নয়। ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইতো। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণির লোকের সঙ্গে মিশিতেন।" তিনি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় সুনার নিউমররি ইন্সস্পেকটিং পোস্টমাস্টার হয়ে আসেন। বৃটিশ সরকার দ্বারা ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে

ভূষিত হন। সুরসিক ও সদালাপী এই মানুষটি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বরে মধুমেহ (ডায়াবেটিস) রোগে দেহরক্ষা করেন। দীনবন্ধু রচিত নাটকগুলি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি 'সুরধনী' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' নামে দুটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছেন।

## ৫.৩ সাহিত্য কৃতি

যে সমস্ত নাট্যকার বাংলা নাটককে স্বয়ম্ভর হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, দীনবন্ধু মিত্র নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। দীনবন্ধু প্রতিভার চারটি বিশেষ দিকের এখানে উল্লেখ করতে হয় : (ক) বাঙালির জীবন, সংস্কৃতি ও রচিবোধ সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা; (খ) তাঁর বাস্তববোধ (গ) মানুষের জন্য তার সমবেদনা, যা তাঁর মানবিকতার একটি দিক; (ঘ) তাঁর হাস্যরসবোধ— এই হাস্যরসবোধের মধ্যে হয়তো কোথাও কোথাও একটি স্থূলতা-গ্রাম্যতার দোষ থাকতে পারে কিন্তু স্মর্তব্য যে এ তাঁর রঙ্গ-জীবনেরই একটি বিশেষ দিক।

দীনবন্ধু নাট্য-প্রতিভার গুরুত্ব অনুভব করে নট-নাট্যকার গিরীশচন্দ্র তাঁকে 'নটগুরু' রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর নাটকের মধ্যে গভীরতা অন্বেষণ করা হয়নি, এমনকি অশ্লীলতার দায়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'সধবার একাদশী' একদা আইনত নিষিদ্ধ হয়। সুতবাং এ শুধু নাট্যকারেরই নয়। বাঙালির জাতীয় তথা সাহিত্যিক দুর্ভাগ্যও বটে।

দীনবন্ধুর নাটকগুলোকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

(১) সামাজিক নাটক : 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)

(২) রোমান্টিক নাটক : 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)

(৩) কমেডি নাটক : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২)।

এগুলির মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা তিনটি : 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' এবং 'জামাই বারিক'। 'নীলদর্পণ' কেবল নাট্যকারের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি নয়, বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকখানি দিয়েই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার শুরু হয়। 'নীলদর্পণে'র ছিল একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, স্বাদেশিকতা ও মানবিকতার একটি বিশেষ দিক। নাটকের আর্টের দিক থেকে অনেক সমালোচক এর দোষ-ত্রুটি বিচার করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ, (ক) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (খ) তাঁহার প্রবল এবং সর্বব্যাপী সহানুভূতি। তাঁহার কাব্যের গুণদোষের কারণ। ... যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে।" তবে ভাবের গভীরতা, নাট্যব্যঞ্জনা, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতির দিক থেকে সধবার 'একাদশীকে'ই 'নীলদর্পণে'র ওপরে স্থান দিতে হয়। দীনবন্ধুকে একজন প্রহসনকারু রূপেই বাঙালি দর্শক-সমালোচক দেখতে অভ্যস্ত, ঠাই তাঁর 'জামাই

বায়িক' নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাবসত্যকে গ্রহণ না করে দুই সতীনের কলহের পরিহাসের দিকটিকেই বড়ো করে দেখেছে। এক সময়ে এই নাটকটির বিশেষ দৃশ্যটিকেই বিচ্ছিন্ন করে 'জেনানাযুদ্ধ' নামে অভিনয় করে আনন্দ লুটেছে দর্শক।

মধুসূদনের নাট্যধারাকে সার্থক পথে পরিচালিত করেন দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন আগেই দীনবন্ধুর 'কেনচিৎ পথিকেনা ভিপ্রতীনম' ছদ্মনামে লেখা নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। তখন নীলকররা বাংলার কৃষক ওপর বল প্রয়োগ করে নীল চাষ করাত। নীল চাষে চাষিদের কোনো লাভ হত না — লাভ হত ইংরেজদের। তাই চাষিরা নীল চাষ করতে চাইত না। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষিরা সমবেত হয়ে আন্দোলন শুরু হয়। তখন চাষিদের পক্ষ নিয়ে প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা শুরু করেন 'হিন্দু প্রেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃত বাজারের মতিলাল ঘোষ প্রমুখেরা। দেশময় আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ঠিক এমনই সময় নীলকর সাহেবদের অত্যচার, অবিচার ও কৃষকদের আন্দোলন নিয়ে প্রকাশিত হয় 'নীলদর্পণ'। লঙসাহেব মধুসূদনকে দিয়ে 'নীলদর্পণ' ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করলেন। ইংরেজি অনুবাদ ছড়িয়ে পড়লে অস্থিরতা বাড়তে থাকে। লঙসাহেবের জেল ও জরিমনা হয়। জরিমনার টাকা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। এদিকে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছালে বিলেতের মানুষেরা এই ভয়ংকর লজ্জাজনক প্রথার কথা জানতে পারে এবং 'ইডিগো কমিশন' বসে। চাষিদের ওপর অত্যাচার কমতে শুরু করে। জার্মানতে রাসয়নিক পদ্ধতিতে নীল তৈরি হতে শুরু করে। নীল চাষ বাংলায় বন্ধ হয়ে যায়, বাংলার চাষিরা রক্ষা পায়। সুতরাং নীল চাষ বন্ধ করতে এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ করতে 'নীলদর্পণ' নাটক যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে তা অতুলনীয়। এখন ক্রমান্বয়ে দীনবন্ধুর নাটকগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

### সামাজিক নাটক : নীলদর্পণ (১৮৬০)

দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যখ্যাতি মূলত এই সামাজিক নাটকটি নিয়েই 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনাম দিয়ে দীনবন্ধু ঢাকা থেকে এই নাটকটি প্রকাশ করেন। স্বয়পুর গ্রামের অধিবাসী গোলোকচন্দ্র বসু ও তাঁর বড়ো ছেলে নবীনমাধব গ্রামের গরিব চাষিদের রক্ষা করতে গিয়ে নীলকর সাহেবদের অপ্রিয় হয়েছেন। নবীনমাধবের ছোটো ভাই বিন্দুমাধব কলকাতায় থাকে এবং সেখানকার কলেজে পড়ে। নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী, বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতা, গোলোক বসুর স্ত্রী সাবিত্রী হলেন গৃহকর্ত্রী। নীলকর সাহেবদের নির্দেশ মতো গত বছর গোলোক বসু পঞ্চাশ বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু প্রাপ্য টাকা পাননি। আবার এবছরও নীলকর সাহেবরা তাঁকে ষাট বিঘা জমিতে নীল চাষ করার হুকুম দিয়েছেন। দুই ভাই সাধুচরণ ও রাইচরণ গোলোক বসুর প্রতিবেশী। সাধুচরণের অন্তঃসত্ত্বা কন্যা ক্ষেত্রমণি পিত্রালয়ে আছে। নীলকুঠির ছোটো সাহেবের আমিন পদোন্নতির জন্য ক্ষেত্রমণিকে ছোটোসাহেবের কাছে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করতে থাকল। পদী

সাধুর স্ত্রী রেবতীকে প্রলোভন দেখিয়েও কাজ হল না দেখে ভয় দেখাতে শুরু করল। এদিকে গোলোকচন্দ্রের ওপর মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ফৌজদারী মামলা করেছে নীলকরেরা। ছোটো সাহেব রোগ সাহেবের অনুচরেরা ক্ষেত্রমণিকে পুকুর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সাহেব তার পেটে লাথি মেরেছে। নবীনমাধব ও মুসলমান প্রজা তোরাপ সাহেবের কুঠি থেকে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে আনলেও ক্ষেত্রমণি মারা গেল। মিথ্যা মামলায় গোলোক বসুর জেল হয়। জেলের মধ্যেই আত্মহত্যা করেন গোলোক বসু। নীল চাষ না করার জন্য সাহেবদের অনুচরদের আঘাতে মারা যায় নবীনমাধব। এই শোকে সাবিত্রী পাগল হয়ে যায়। পাগল অবস্থায় সে সরলতাকে হত্যা করে, পরে নিজেও মারা যায়।

'নীলদর্পণ' একটি সামাজিক বিপর্যয়ের আখ্যান। ব্যক্তির ট্র্যাজেডি অপেক্ষা গোষ্ঠীর ট্র্যাজেডিই এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনি অখণ্ডভাবে ঐক্য রক্ষা করতে না পারায় ঘটনাও পারস্পরিকভাবে অবিচ্ছেদ্য থাকেনি। তাই নাটকের অখণ্ডতা হারিয়ে 'নীলদর্পণ' অনেকক্ষেত্রে 'নাট্যচিত্র' হয়ে উঠেছে। কিন্তু উদ্দেশ্যগত ভাবে 'নীলদর্পণ' সম্পূর্ণই সার্থক। এই নাটকের চরিত্রগুলো বাস্তবনির্ভর। ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — " 'নীলদর্পণ' নাটকের মধ্যে যে জীবনের পরিচয় পাই তাহা বাঙ্গালির শাশ্বত জীবন। নাট্যকার সেই জীবন আত্মনির্লিপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ করিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রোমান্টিক কবি শিল্পীগণ দূর হইতে জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, কিন্তু দীনবন্ধুর বাস্তবধর্মী নাটকসমূহ জীবনের অত্যন্ত সান্নিকটবর্তী হইয়া রচিত হইয়াছে বলিয়া তিনি ইহাদের চিত্র ও চরিত্রগুলি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেইজন্য মধুসূদনের রাম-লক্ষ্মণ, রাবণকে আমাদের যতখানি অপরিচিত মনে হয়, দীনবন্ধুর গোলোক বসু, আদুরী, পদী ময়রানীকে ততখানি অপরিচিত মনে হয় না; ইহারা আমাদের পরিচিত জীবনধারার আরও নিকটবর্তী।"

'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৭ চেপ্টেম্বর ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী একাই উড সাহেব, গোলোক বসু, সাবিত্রী ও এক জমিদারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নাটকটি অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষদের মনে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কোনো গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা আগে আমরা জানিতাম না। বাসাতে বাসাতে বাসাতে 'ময়রানী লো সেই নীল গেজেছে কই?' ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চালিল।" ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হল। তারকনাথ ঘোষের কামাপুকুরের বাড়িতে বসে মধুসূদন এক রাতে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করে নিলেন, নাটকের ভূমিকায় দীনবন্ধু নীলকর সাহেবদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "এক্ষণে তাহার নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলেতের মুখরক্ষা।" 'নীলদর্পণ' একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক নাটক। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং তাদের বিবেকবোধ জাগ্রত করাই ছিল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের উদ্দেশ্য।

স্বরপুর গ্রামের বসু ও ঘোষ পরিবারের ওপর নীলকর সাহেবদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এখানে বিবৃত আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই গোলোক বসু ও সাধুচরণ ঘোষের কথাতে নীলকর সাহেবদের ভয়ংকর দিক প্রদর্শিত হয়েছে। কৃষক রাইচরণের মনে হয়েছে জমিতে নীলের চাষ তার বুকে শেল বিঁধিয়েছে। সে প্রতিবাদ করেছে। ক্ষিপ্ত হয়ে সাহেবের অনুচর তৃষ্ণার জল পর্যন্ত না দিয়ে তাকে বেঁধে নিয়ে চলে গেছে। সাধুচরণ ও নবীনমাধব চরম দুর্দশার শিকার হয়েছে। নবীনমাধবের পিতা গোলোকচন্দ্রের নামে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা করেছে নীলকরেরা, রোগ সাহেব পদীময়রানীকে দিয়ে সাধুচরণের গর্ভবতী মেয়ে ক্ষেত্রেমণিকে ধরে এনেছে। তোরাপ রক্ষা করেছে তার সতীত্ব। চতুর্থ অঙ্কে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গোলোক বসু আত্মহত্যায় পথ বেছে নেন। তার শ্রাদ্ধের দিন পুকুর পাড়ে নীলকর সাহেবরা নীল বুনতে এলে নবীনমাধব বাধা দিতে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত পান। সাবিত্রী পাগল হয়ে গিয়ে সরলাকে গলা টিপে হত্যা করে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর অনুতাপে জর্জরিত হয়ে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ক্ষেত্রমণিও মারা যায়। নীলকরদের সঙ্গে সংঘাতে নবীনমাধবেরও প্রাণ গেছে। তবে নবীনমাধব তার সাহসের জন্য স্মরণীয়। সাহেব নবীন মাধবকে বলেছে, "যদি তুমি আমিন খালাসির কথা না শোনো তার চিহ্নিত জমিতে নীল না করো, তবে তোমার বাড়ি উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমার কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" সঙ্গে সঙ্গে নবীনমাধব সাহেবকে উত্তর করেছে, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এ-বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ।' বিজন ভট্টাচার্যের, 'নবান্নে', 'জবানবন্দি'তে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতারে', যে গণচেতনা, যে প্রতিবাদী ভাষা আমরা দেখেছি, তার প্রথমরূপের আমরা সন্ধান পেয়েছি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে। সেই গণজোয়ার, গণ-আন্দোলনের বিষয় তখন স্থান পেয়েছে হরিশ মুখার্জির 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায়। মধুসূদন কৃত 'নীলদর্পণ' এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় গণচেতনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল।

### রোমান্টিক নাটক : নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩)

দীনবন্ধুর রোমান্টিক নাটকগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩)। দীনবন্ধু এই নাটকটি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। রাজা রমণীমোহনের বড়ো রানি নিরুদ্দেশ ও ছোটো রানি বিগতা হওয়ার পর নতুন রাজমহিষীর জন্য পাত্রী দেখা হতে থাকে। সভাসদেরা জানালেন সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যাই রাজমহিষী হবার উপযুক্ত। এই সময় বড়ো রানির কথা মনে পড়ায় রাজামশায়ের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সবাই জানে রাজমাতা ও ছোটো রানির অত্যাচারে বড়ো রানি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু রাজসভার পুরনো চিঠি থেকে জানা যায় যে বড়ো রানি আত্মহত্যা করেননি। তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। পুত্র ও মাতার কষ্টের দায়ভার রাজা নিজের ওপর নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বনে যেতে চাইলেন। তখন বিদ্যাভূষণ নবযুবক বিজয়কে বন্দি করে রাজার কাছে বিচারের জন্য নিয়ে আসেন। পরে তার মাতা

তপস্বিনীকেও আনা হয়। রাজা আঙ্গুরী দেখে নিজপুত্র বিজয়কে ও বড়ো রানি তপস্বিনীকে চিনতে পারেন। এদিকে রাজার উদ্যানে বিজয় ও কামিনী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে বিজয় ও কামিনীর মিলন এবং রাজা-রানির মিলনান্তক পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। এই মূল কাহিনির সঙ্গে হাস্যরসাত্মক রাজমন্ত্রী জলধরের কাহিনি যুক্ত হয়েছে। জলধর-জগদম্বা-মালতী-মল্লিকার কাহিনি একান্তভাবেই হাস্যরসাত্মক। এই হাস্যরসের কাহিনির ওপর বিজয় ও কামিনীর রোমান্টিক মিলন প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

**লীলাবত :** লীলাবতী (১৮৬৭) মিলনাত্মক নাটক। এই নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে দীনবন্ধু কালিদাসের 'রঘুবংশ' থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন, "অপরিমিত আয়াস-সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি।" জমিদার হরবিলাসের পুত্র অরবিন্দ। তাঁর দুই কন্যা হল তারা ও লীলাবতী। অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী। অরবিন্দ স্ত্রী ভেবে পিতার ঔরসে জন্মদাসী কন্যাকে আলিঙ্গন করলে সবাই তা জানতে পারে। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে অরবিন্দ গৃহত্যাগ করে। অরবিন্দ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, চারপাশে এটাই রটে যায়। শিক্ষিতা সুন্দরী লীলাবতী বিপত্নীক হরবিলাসের আদরের দুলালি। হরবিলাস ললিতমোহন নামে এক বালককে পুত্র স্নেহে বড়ো করে তুলেছেন। লীলাবতী ললিতকে ভালোবাসে। হরবিলাস ললিতকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করার কথা সবাইকে জানান এবং এক মূর্খ কুলী পুত্রের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ স্থির করেন। পাত্রের নাম নদের চাঁদ। সবাই ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহদিতে হরবিলাসকে বললেও তিনি কারো কথা শুনতে চাইলেন না। গৃহত্যাগী অরবিন্দ তখন কাশীতে শিক্ষকতা করছিলেন। বারো বছর পর তিনি কাশী থেকে ফিরে এসে দেখলেন জাল অরবিন্দ তার বাড়িতে অধিষ্ঠিত এবং ক্ষিরোদবাসিনীও জাত অরবিন্দকে স্বামীর মর্যাদা দিয়েছে। শেষে জানা গেল নকল অরবিন্দ পুরুষ নয় স্ত্রীলোক। তার নাম চাঁপা। এদিকে শেষপর্যন্ত ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর পরিণয় হয়। এইভাবে মিলনের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। ললিত ও লীলাবতীর বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টাশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বাসিয়া আছে। এমন মেয়ে বাঙালি সমাজে ছিল না— কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে, শুনিতেছি। ইংরাজের ঘরে এমন মেয়ে আছে; ইংরেজ কন্যার জীবনও তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক-নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা চাই যাহার আদর্শ সমাজ নাই। তিনি তাই গাড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাই বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃতপুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সেই সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেননা, সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত আদর্শ ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না — জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোনো সম্বন্ধ

নাই — স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।"

**কমলে কামিনী :** দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক হল 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ডাক বিভাগের কর্মী হয়ে তিনি মণিপুর ও কাছাড় পরিভ্রমণ করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতারই ফসল হল 'কমল কামিনী' নাটক। মণিপুরের সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন নাটকের নায়ক। শিখাণ্ডিবাহনকে নাট্যকার একই সঙ্গে বীর ও প্রেমিকরূপে উপস্থাপিত করেছেন। ব্রহ্মরাজের কন্যা রণকল্যাণী হল নাটকের নায়িকা। সুরবালা চরিত্রে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার প্রভাব দেখা যায়। নাটক হিসেবে 'কমলে কামিনী' সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। অধ্যাপক ও সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "রোমান্টিক নাটকের আবহাওয়ায় 'কমলে কামিনী'র রূপদান করা হইয়াছে, কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভা রোমান্টিক নাট্যরচনার অনুকূল ছিল না বলিয়া ইহার বহুস্থলেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মণিপুরী সমাজ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজ, বাঙালি জীবনের সঙ্গে তাহার কোনো যোগ নাই, অথচ দীনবন্ধু বাঙ্গালি জীবনের বহু চিত্র বা চিত্রাংশ তাহার ওপর আরোপ করিয়াছেন। নাটকের নামকরণেও কোনো সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

**কমেডি নাটক :** হালকা হাস্যরস কমেডির উপজীব্য। সাধারণ শ্রেণির মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের এবং খারাপ চরিত্রের মানুষের জীবনের অনুকরণ হল কমেডি। খারাপ চরিত্রের মানুষ বলতে অ্যারিস্টটল চরিত্রের বহুবিধ ভুল ত্রুটির দিকে নির্দেশ করেছেন। খারাপ চরিত্রের এক বা একের বেশি ভুল থাকবে। সেই ভুল ত্রুটি হল কুৎসিত প্রকৃতির — যা দেখা মাত্র দর্শকের মনে হাসির উদ্রেক ঘটে। কমেডি সাধারণত মিলনান্তক হয়। বিষয় অনুযায়ী কমেডি নাটককে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে — (১) ধ্রুপদী কমেডি, (২) রোমান্টিক কমেডি, (৩) সামাজিক কমেডি, (৪) স্যাটয়ারিক কমেডি, (৫) ট্র্যাজি কমেডি, (৬) প্রহসন, (৭) ভাবপ্রধান কমেডি। ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী'। এই কমেডি দুটিতে মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

**বিয়ে পাগলা বুড়ো :** 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' স্যাটায়ারিক কমেডি শ্রেণির। এই স্যাটায়ারিক কমেডির উদ্ভাবক হলেন বেন জনসন। এই পর্যায়ের কমেডিও সামাজিক মানুষের ন্যায়-রীতি, আচার-আচরণকে কষাঘাতে বিদ্ধ করা হয়েছে। এই শ্রেণির কমেডির লক্ষ্য হল, জনসনের ভাষা দিয়ে 'to write with cool irony of contemporary human foolies'। 'বিয়ে পাগল বুড়ো' দুই অঙ্কের নাটক। কুলীন রাজীবলোচন বুড়ো বয়সে পত্নীবিয়োগে পুনরায় বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁর দুই কন্যা রাসমণি ও গৌরমণি বিধবা। বুড়ো হলেও রাজীবলোচন নিজেকে যুবক সাজিয়ে রাখতে সদা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কনকবাবু রাজীবলোচনের পাত্রী স্থির করে দেবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাত্রীর

চিন্তায় রাতে রাজীবলোচনের আর ঘুম হল না। তার ছদ্মবিবাহের আয়োজন করা হয়। যে পেচাঁর মা রাজীবকে তার চেয়ে বয়স্ক বলে ক্ষ্যাপাতো তাকে মুখ ঢাকা দিয়ে নকল পাত্রী সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। স্ত্রী পেয়ে রাজীবলোচনের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু ঘোমটা তুলে পেঁচার মাকে দেখে সে অবাক হল। গ্রামের বালকরা রাজীবলোচনকে শিক্ষা দিতে এমন কাজ করেছে। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বোঁ'র ভক্তপ্রসাদের মতো 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র বুড়ো রাজীবলোচন মুখে ধর্মের কথা বললেও নিজের বিধবা মেয়েদের সম্বন্ধে ভাবিত নয়। তাই সে ফের বিয়ে করতে গিয়ে সবার ষড়যন্ত্রে জব্দ হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, "ইহার প্রত্যেকটি চরিত্রেরই এক একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এই বাস্তব অস্তিত্ব তাহাদিগকে সমসাময়িককালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া সৃষ্টি হিসাবে মূল্যহীন করিয়া দেয় নাই। প্রহসনের নায়ক হিসাবে রাজীবলোচনের সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। তাঁহার যাহা প্রকৃত পরিচয় তাহার অধিক নাট্যকার কিছু আমাদের আর দিতে চাহেন নাই। 'পেঁচার মা'র সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। নাট্যকার এই সকল চরিত্র বাস্তব জগত হইতে আপনার সহানুভূতির বলে উদ্ধার করিয়া চিরন্তন সৃষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন, রাজীবলোচনকে শুধু বিবাহপাগল বৃদ্ধ বর বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের গ্রাম্য বৃদ্ধ-চরিত্রের একটি 'type' বলিলে ঠিক হইবে না— তাঁহার মধ্যেও দীনবন্ধু আপনার সৃষ্টি প্রতিভার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। বার্ধক্যকে অস্বীকার করিয়া যুবক সাজিয়া থাকিবার চেষ্টা যে কীরূপ নিষ্ফল ও করুণ দীনবন্ধু অপূর্ব নাটকীয় কল্পনার ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।"

**সধবার একাদশী :** দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) সামাজিক কমেডির অন্তর্ভুক্ত। সমাজ ও পরিবার জীবনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে যে সমস্ত কমেডি রচিত হয়েছে, তাকেই সামাজিক কমেডি বলে। সমাজে অন্তর্ভুক্ত মানুষের কাজ ও আচার-আচরণ এই শ্রেণির নাটকের লক্ষ্য। সমকালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষাভিমান, চরিত্র-বিকৃতি ফুটে উঠেছে, 'সধবার একাদশী'তে। এরসঙ্গে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তরুণ যুবকদের খামখেয়ালীপনা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভোগাকাঙ্ক্ষায় স্যাটায়ার, হিউমার ও উইটের সংমিশ্রণ ঘটেছে। নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ, যার তুলনা বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাওয়া কঠিন। কলকাতার ধনী এবং অভিজাত ব্যক্তি হলেন জীবনচন্দ্র, যার সন্তানের নাম অটলবিহারী। অটল ধনীপুত্র ও আয়েসী, লেখাপড়ার ইস্তফা দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠল। তার প্রিয় বন্ধু হল নিঁমচাদ। অটলকে নিমচাঁদ কিছুদিনের মধ্যেই মদে অভ্যস্ত করে তুলল। অটলের অঢেল অর্থে সবাই ইছেমত মদ খেয়ে আর মাতলামি করে দিন কাটাতে লাগল। অটলের স্ত্রী কুমুদিনী থাকা সত্ত্বেও বারবনিতা কাঞ্চনকে অটল রক্ষিতারূপে রেখেছিল। একদিন কাঞ্চনকে অটলকে অপমান করতে প্রতিশোধ নিতে অটল ভদ্র ঘরের মেয়ে এনে বাগান বাড়িতে রেখে দেবার পরিকল্পনা করল। খুড়শাশুড়ি তার বাড়িতে আসায় সেই খুড়শাশুড়িকে বাইরে বের করে আনার ষড়যন্ত্র করল অটল। এজন্য চাল করে এক হিজড়াকে সে বাড়ির অন্দরমহলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু হিজড়া ভুল করে কুমুদিনীকে এনে হাজির করলে, কুমুদিনী স্বামীকে চিনতে পারে।

এতে অসন্তুষ্ট হয়ে নিমচাঁদ অটলের সংসর্গ ছাড়ার হুমকি দিলে, অটল চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বিবেক দংশন ভুলে দুজনে ফের মদ্যপান করতে বাগানে চলে যায়। এই সামাজিক কমেডিতে নিমচাঁদ চরিত্রের যথাযথ বিকাশ লক্ষ করা যায়। অটল নিমচাঁদের বন্ধু হলেও, নিমচাঁদ বিদ্বান, অটল মূর্খ। অটল 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিনেছে, তো নিমচাঁদ বলেছে — "ওর ভালোমন্দ তুমি বুঝবে কি? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদা পড়েছে কাশীদাস, তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মাণিক— মাইকেল দাদা বাংলার মিল্টন।" দুজনে একশ্রেণির নব্যযুবক তথা মদ্যপ হলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট বুঝিয়েছেন নাট্যকার। অটলের ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে বারবনিতা বিলাসী, বারবনিতা রাখাকে সে আভিজাত্য বলে গণ্য করে। আবার রক্ষিতার অপমানের শোধ নিতে ঘরের বউকে বাইরে এনে তাকে শিক্ষা দেবার নিন্দনীয় কাজ করেছে। নারীজীবনের ব্যর্থতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে কুমুদিনী বলেছে "এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভালো।" নিমচাঁদ ধনী মূর্খ অটলকে অবজ্ঞা করেছে, পরের স্ত্রীকে মর্যাদা দিয়েছে। অনেকে নিমচাঁদ মধুসূদনের আদর্শে গঠিত হয়েছে জানালে দীনবন্ধু তা অস্বীকার করে বলেছেন, "মধু কখানো নিম হয়?" তথাপি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নবকুমারের সঙ্গে নিমচাঁদের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

১৩২৬ বঙ্গাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রহসন নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, "সে বইয়ের দোষগুণ আজ অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া যাচাই হইতেছে — বিশেষত যে মারাত্মক উৎপাত কাটাইয়া সম্প্রতি উ ইহা খাড়া হইয়া উঠিল। তাহাতে মূল্য লইয়া ইহার আর দরদস্তুর করা সাজে না। বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডাড়ে এ একখানি জাতীয় সম্পদ- এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভালো।" দীনবন্ধুর এই শ্রেষ্ঠ প্রহসনটির কথা বলতে গিয়ে ড° সুনীলকুমার দে লিখেছেন, " 'সধবার একদশী'তে দীনবন্ধু কেবল সে যুগের মাতাল আঁকেন নাই, সকল যুগের মানুষ আঁকিয়াছেন।"

**জামাইবারিক :** দীনবন্ধুর 'জামাইবারিক' (১৮৭২) বিশুদ্ধ প্রহসন। রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'বৌমা' প্রহসনের একটি গানে পরোক্ষভাবে প্রহসনের সংজ্ঞা বলে দিয়েছেন, — "শুধু একটুখানি তামাসা/সংসাজায়ে রং বাজারে/পাঁচজনের নিয়ে আসা/ হাসির কথা উড়িও হেসে/ বুঝবো কেমন মেজাজ খাসা।" আচারমূলক কমেডি অবক্ষয়িত হয়ে প্রহসনে পরিণত হয় — 'As opposed to the comedy od manness.'। আচারমূলক কমেডিতে মানুষের আচার-আচরণ কর্ম-বৈশিষ্ট্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়, অপরদিকে প্রহসনে এমন এক অবাস্তব জাতের কথা বলা হয়— যেখানে চিৎকার, ধস্তাধস্তি এবং ভাঁড়ামি প্রধান্য পায়। প্রহসনের মূল লক্ষ্য হল হাস্যসৃষ্টি, সাধারণত প্রহসনের কাহিনি মিলনাত্মক হয়। 'জামাই বারিক' প্রহসনে কলকাতার ধনী পরিবারে ঘর জামাই পোষার সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। শ্বশুর বাড়িতে পরাধীন থাকা জামাইদের অন্তর্বেদনা নাট্যকার হাস্যরসের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং 'জামাই বারিক' প্রহসনই বলেছেন। কেশবপুরের জমিদার হলেন বিজয়বল্লভ। তিনি তাঁর কুলীন ঘর জামাইদের বাড়ির বাইরে

মস্ত একটা ঘর তৈরি করে সেখানে রেখে দিয়েছেন। যত রকমের জামাই আছে তারা সকলে সেখানে থাকে। রাতে যে জামাইয়ের ডাক পড়ে কেবলমাত্র সেই জামাই-ই বাড়ির ভেতর কেবলমাত্র বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পায়। শ্বশুদের অন্নদ্বারা পালিত এইসব জামাইরা বসে বসে কবিগান করে। পাঁচালি গেয়ে, গাঁজা টেনে সময় কাটায়, শ্বশুরবাড়ির কেউ এইসব একান্নবর্তী পরিবারের ভাগ্নী-জামাই, ভাইঝি জামাই, নাত-জামাইদের খোঁজ-খবর করে না। জমিদার বিজয়বল্লভের ঘর-জামাই অভয়কুমার কিন্তু সবকিছু মুখ বুজে মেনে নিতে পারে না — "অভয় কিছু অভিমানী, একটি ত্রুটি হলেই বাড়ি যায়।" অভয়ের সুন্দরী পত্নী কামিনী অভয়কে পছন্দ করে না, অভয় শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য না করে নিজের বাড়িতে চলে গেলে বিজয়বল্লভ তাকে বার বার দিয়ে আসতে বললেও সে গোঁ ধরে বাড়িতে বসে রইল। এদিকে অভয়ের বন্ধু পদ্মলোচনও দুই পত্নী দ্বারা দিবারাত্রি নির্যাতিত হচ্ছে। অভয় পদ্মলোচনকে নিয়ে বৈষ্ণব সেজে বৃন্দাবনে চলে গেল। অভয়ের স্ত্রী কামিনী স্বামী দেশছাড়া হয়েছে শুনে অনুতপ্ত হল। কামিনী বৃন্দাবনে এল স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অভয় কামিনীকে ক্ষমা করল এবং উভয়ের মিলন ঘটল। এদিকে পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী বগলা বিন্দুবাসিনী স্বামীর জন্য কাতর হয়ে উঠেছে শুনে পদ্মলোচনও বৃন্দাবন থেকে ফিরে এল। সবার সুখের মিলনে নাটকের পরিণতি ঘটল। প্রহসনের নায়ক অভয়কুমার ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ, সে শ্বশুরবাড়িতে গোলাম হয়ে থাকতে চায়নি, কামিনী বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অভয়ের ব্যক্তিত্বকে চিনেছে বলেই সে বৃন্দাবন থেকে অভয়কে ফিরিয়ে এনেছে। জমিদার বিজয়বল্লভ ছিল প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ, মদ্যপ মেজো জামাইকে সে বাড়ি থেকে বেরও করে দিয়েছিল। কামিনী বলেছে — "মেজো জামাই বড়ো মদ খেত, বাবা সেজন্য তাকে বাড়ি থেকে বা'র করে দিয়েছিলেন, মেজাদিদির দুচোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল; নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদলেন...।" এই মেজদি সম্পর্কে কামিনীর ভাবনাও ছিল স্পষ্ট — "যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালোবাসে, তখন সে মন্দ হক্, ছন্দ হক্, মাতাল হক্, গুলিখোর হক্, তার কাছে তাকে দেওয়াই ভালো।" অভয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র হলেও, অভয়ের বন্ধু পদ্মলোচন ছিল ব্যক্তিত্বহীন। দুই স্ত্রীর অত্যাচার সে সহ্য করেছে, প্রতিবাদ করতে অপরাগ ছিল। সার্থক হাস্যরসের ধারায় 'জামাইবারিক' প্রহসন হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

## ৫.৪ 'সধবার একাদশী'তে মাইকেল মধূসূদনের প্রভাব

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব দু-রকমের হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। দীনবন্ধুও যে মাইকেলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত তা অনস্বীকার্য। অনেক সমালোচকেই বলেছেন যে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের প্রভাবে 'সধবার একাদশী' নাট্যরূপ পেয়েছে। বরং এটাও বলা যায় যে মধুসূদনের 'বড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকটির প্রভাবও 'সধবার একাদশী'তে কিয়দংশে লক্ষণীয়। সাহিত্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব হল স্পষ্ট, সুগঠিত এবং তর্কাতীত। সেখানে পরোক্ষ প্রভাব সহজে লক্ষণীয় নয়, লেখক বস্তুর বাহ্যিক আবরণকে গ্রহণ করে তা সার-বস্তু বা আত্মাকে গ্রহণ করেন, ভাব ও বিচারকে পুরোপুরি গ্রহণ না করেও এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করেন। 'সধবার একাদশী'তে মাইকেলের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবেই দীনবন্ধুর বিশেষত্ব অধিক প্রকাশ পেয়েছে।

'সধবার একাদশী' যে মাইকেলের প্রভাবেই লিখিত, সম্ভবত তা প্রথম উল্লেখ করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতা-পুত্রে' গ্রন্থে; " মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই দীনবন্ধুবাবু প্রকাশিত করিলেন — 'সধবার একাদশী'ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' শেষোক্ত দুই গ্রন্থে উপরোক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়া লেখা বটে। অনুকরণ অনেক সময় হীন বল হইলেও 'সধবার একাদশী' নাম ডাকে 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।"

মাইকেল ও দীনবন্ধু দুজনেই তাঁদের নাটকের কিছু ঘটনা চরিত্র পরিস্থিতিতে সাধারণ ও সহজ অর্থে গ্রহণ না করে সঙ্কেতপূর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। মাইকেলের রচনার মধ্যে কবি ও নাট্যকারের মিলিত সত্তা যে একটি জটলতময় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। দীনবন্ধু সেখানে শুধু নাট্যকাররূপে ব্যাপারটি দেখিয়েছেন। দুজন নাট্যকারই যে যুগের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির কারণ দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অন্বেষণ করেছেন। 'সধবার একাদশী'তে অটলের নির্লজ্জ ও অশোভন কর্মের একটি সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করেছে নিমচাঁদ : সভ্যতার সঙ্গে যুগের অসম্ভব ঘটনেই অমন অসঙ্গত ব্যাপার ঘটে থাকে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নবর এ ধঃপতনের পেছনে 'পাপ' এবং সেই পাপেরও কারণ না বোঝা হরকামিনী বুঝেনি, নবর পিতা ঠিকেই বুঝেছেন) মাইকেলের দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব। অপরদিকে অটলের অধঃপতনের সুস্পষ্ট চিত্র ও কারণ দীনবন্ধু প্রদর্শন করেছেন। দুজন নাট্যকারের রচনায় এসেছে খানিকটা সরলতা, কিছুটা ব্যঙ্গ। মাইকেল প্রথমে হয়ে পরেন সরল, দীনবন্ধু প্রথমে সরল হয়ে পরে ত্রির্থক।

যুগের অসঙ্গতি প্রদর্শন দুই নাট্যকারের ই লক্ষ্য। মাইকেল দেখিয়েছেন, সেই অসঙ্গতির প্রকাশ হল নব্য শিক্ষিত যুবকগণের মুখের কথার সঙ্গে কাজের মিল না রাখার। এই জন্যই নব বলেছে — "এখন প্রার্থনা এই যে, তোমার সকলে মাথা মন এক করে আমার এদেশের সোসিয়াল রিফারমেশন যাতে হয়। তার চেষ্টা কর। মাথামন এক হয়নি বলেই যুগের চিন্তায় বিপর্য ঘটেছে। দীনবন্ধুর নাটকে কালের এই অসঙ্গতি একটি প্রতীকে ব্যক্ত হয়েছে। কাল-যুগ-সময়ের পরিমাপক হল 'ঘড়ি'। অনঙ্গরঙ্গিণীর ঘড়িটা কুমুদিনীর কাঁকালে যেতেই একটি বিপর্যয় ঘটল। কালের অসঙ্গতির জন্যই সেই পরস্ত্রী হরণের জঘন্য পরিকল্পনা। অবশ্যে সেই কৌশলের পরিসমাপ্তিতে নাট্যকারের মানসিক বিশেষত্ব অনুসারে সেই পরস্ত্রী নিজ স্ত্রীতে পরিণত হয়ে যায়। এই অসঙ্গতির কারণ হিসেবে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষার অপব্যবহারকে দুজনেই লক্ষ করেছেন।

নব থেকে অটলের যে কাল ও ভাবগত বিবর্তন, অতএব পরিবর্তন, তা অন্যভাবেও বোঝা যায়। নব তার যুগের প্রতিনিধি হলেও, শেক্সপিয়র-মিল্টনের-বাইরনের কাব্যরুচি যা যুগের শিক্ষিত জনের এক বড় মানসিক বিশেষত্ব তা তার মধ্যে সেই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র তুলনায় 'সধবার একাদশ'র সাহিত্যিক পরিবেশ অনেক বেশি আকাদেমিক। মাইকেল অগ্রজ বলে দীনবন্ধুর তুলনায় অগ্রবর্তী, হিন্দু কলেজের দুই যুগের ছাত্র বলে প্রভাবও ভিন্ন। মাইকেল কাল যেন সেই কাল, ইংরেজি শিক্ষা ও কাব্যরুচি তখনও যেন শিক্ষিত জনের দ্বারে-দ্বারে অবাধ হয়ে ওঠেনি। 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র ভক্তপ্রসাদ

তাই কলকাতার কলেজে পড়া ছেলেকে শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই গ্রামে ফিরিয়ে নিতে চান। 'সধবার একাদশী' ওপর 'একেই বলে সভ্যতা'র অন্যান্য আরো কিছু গৌণ প্রভাব রয়েছে। যেমন সভা সমিতির প্রসঙ্গ; কাশী-বৃন্দাবনে যাওয়া; কর্তা মহাশয় ও জীবনচন্দ্রের সাদৃশ্য, গৃহিণী, হরকামিনী ও প্রসন্নময়ীর আচরণ, স্বভাব ও সংলাপ কুমুদিনী ও সৌদামিণীর মতো হওয়া; বারাঙ্গনাদের গান ইত্যাদি।

পরিশেষে স্বয়ং মাইকেলের কিছু প্রভাব যে নিমচাঁদ চরিত্রে বর্তমান, তা সামান্য আলোচনা করা যায়। অনেকের মতেই তাঁরা অভিন্ন। যুক্তিস্বরূপে, মাইকেল ও নিমচাঁদ দুজনেই ইংরেজিতে পণ্ডিত উভয়েই মদ্যপ, মাইকেলের শেষ জীবনের আপেক্ষ ও উক্তি নিমচাঁদের সংলাপে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমনকি মাইকেলের একটি বিখ্যাত উক্তি নিমচাঁদের কণ্ঠে স্থাপিত ইত্যাদি।

তবে ভিন্ন মতে বাল যায়, দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকে মাইকেলের প্রতি যে শ্রদ্ধাপোষণ করা হয়েছে, তাতে মাইকেলকে এভাবে চিত্রিত করা সম্ভবপর নয়। কারণ তখন জীবিত ব্যারিস্টার মাইকেলকে এভাবে প্রদর্শন করা সরকারী কর্মচারী দীনবন্ধু পক্ষে অসম্ভব। এছাড়া যে মাইকেলেরে নাটক, দীনবন্ধুর প্রেরণা, সেই মাইকেলকে এমনভাবে চিত্রত করা অমানবিক। পরিশেষে বলা যায় মাইকেল ও নিমচাঁদের আশাবাদও মাইকেলের মধ্যে অনুপস্থিত।

মাইকেলের সঙ্গে নিমচাঁদের মিল নেহাতই সংযোগ। হয়ত বা দীনবন্ধু প্রায়শই জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র সম্মুখে রেখে চরিত্র সৃষ্টি করতেন এই বিশ্বাস দ্বারা অনেক প্ররোচিত ও প্রভাবিত হয়েছেন। যদি বা নিমচাঁদের পেছনে মাইকেল আছেন। তবে তা সদর্থে এবং প্রশংসার জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদর মন করেন — "সুরসিক দীনবন্ধুর রসিকতার আড়ালে একাটি ছায়মূর্ত্তি দেখা দিয়েছিল — তা মধুসূদনের ছায়া। মধুসূদনের ছায়া নিমচাঁদের কায়া লাভ করেছে। ... নিমচাঁদ মধুর ভূত, প্রকৃতি নহয় — মধুর বিকৃতি, মধুর কৃতি থেকে তা বঞ্চিত।"

মাইকেলেই যে নিমচাঁদ, সর্বপ্রথম ড° সুরেশ চন্দ্র মৈত্র মশাই তাঁর 'বাংলা নাকের বিবর্তন' (ফ্রেব্রুয়ারি; পৃ. ৪৪৬ বইতে সে খবরটি দিয়েছেন : তাঁর (নিমচাঁদের) বক্তৃতায় মাঝে মাঝে মাইকেলের উক্তির প্রতিধ্বনি শুনে যে যুগে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার তারক বিশ্বাস মহাশয় লিখেছিলেন, নিমেদত্ত হলেন মধুসূদন আর কাঞ্চন হল স্বর্ণ-বাঈজী। মাইকেলই যে নিমচাঁদ, ড° মৈত্র সে কথা অস্বীকার করে বরং নতুন আর একটি অনুমান দিয়েছেন নিমচাঁদ বুঝি কবি ইশ্বর গুপ্ত, কারণ নারী সম্পর্কে নিমচাঁদের মতো তিনিও ব্যঙ্গপ্রবণ ছিলেন।

অবশ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'পিতা-পুত্র' গ্রন্থে পর্বে উল্লিখিত মতবাদই সমর্থন করেছেন।

মধুসূদনের কিছু সংলাপ, নিমচাঁদের কণ্ঠে পাওয়া যায় বলেই মাইকেল ও নিমচাঁদ একই বলে সরল সমীকরণ করা হয়ত ঠিক নয়।

## ৫.৫ 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী'র তুলনামূলক সমীক্ষা

নাট্যরচনায় দীনবন্ধু সমকালকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যেন এখানে একাধারে সমাজ পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক। তিনি সমকলীন সমস্যার সমাজচিত্র বা সমস্যার নাট্যরূপ দিয়েছেন, সমস্যা নাটক রচনা করেননি। তার নাটকের পটভূমি একদিকে গ্রাম অন্যদিকে শহর। একদিকে সমকাল অন্যদিকে অতীতকাল। গ্রামের সমকালীন সমস্যা নিয়ে লিখিত হয়েছে 'নীলদর্পণ', তেমনি শহরের তৎকালীন সমস্যার বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে 'সধবার একাদশী'তে।

'নীলদর্পণ' থেকে তাঁর যে নাট্যজীবনের সূত্রপাত হয়, 'সধবার একাদশী'তে এসে তার একটি ক্রমপরিণতি পরিলক্ষিত হয়। গর্ভবতী রমণীর আসন্ন সন্তান দুটি নাটকেই এক বিশেষ সঙ্কেতময় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ডাক্তার-বৈদ্য-কবিরাজ দুটি নাটকেরই অসুস্থ ও দূষিত পরিবেশের পরিশোধনের রূপক। দুটি নাটকেই চরিত্রের নামচয়ন অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনাময়, দুটি নাটকের সমাপ্তিতে ছড়ার প্রয়োগ হয়েছে। 'নীলদর্পণে'র সংলাপে ছড়া-প্রবাদের উদ্ধৃতি নিমঁচাদের ইংরোজি-সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতির সমতুল্য। শেক্সপিয়রের সাহিত্য শহর ভিত্তিক নাটক 'সধবার একাদশী'তে প্রাধান্য পেলেও গ্রামাভিত্তিক 'নীলদর্পণে'ও তার ব্যবহার রয়েছে। শেকস্পিয়রের 'ওথেলো' নাটকাটির বেশি প্রভাব আছে 'সধবার একাদশী'তে। এই 'ওথেলো' নাটকের পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে 'নীলদর্পণে'।

'নীলদর্পণে'র সবচেয়ে জটিল চরিত্রটি হচ্ছে গোপীনাথ, বর্তমান পেশার সঙ্গে তার বিবেকদংশন তাকে বিশেষত্ব প্রদান করেছে। গোপীনাথের বাক্ভঙ্গির মধ্যে রয়েছে এক তির্যকতা। গোপীনাথই যেন নিমঁচাদের প্রাথমিক রূপ। পদাঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দুজনেই এবং সেই পদাঘাতের পর দুজনের মানসিক প্রতিক্রিয়া তাদের চরিত্রের মধ্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

'নীলদর্পণে' যে একাধিক প্রত্যক্ষ ও আক্ষরিক অর্থের মৃত্যুদৃশ্য আছে, 'সধবার একাদশী'তে তা সংখ্যায় কমে রূপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। 'নীলদর্পণে' গর্ভপাতের জন্য যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি, 'সধবার একাদশী'তে সেই সন্তানের সাঙ্কেতিক জন্ম দৃশ্য হয়। 'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় দীনবন্ধু যে নবকৃষ্ণরূপী ইংরেজ শাসনের আবির্ভাবের আশার ছবি একেছেন, 'সধবার একাদশী'তে তাঁকে তিনি স্পষ্টই কৃষ্ণরূপে উল্লেখ করেছেন, দুটি নাটকের প্রেরণার মূল হল রামায়ণ। বিদ্যালয় স্থাপন ও ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের যে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নবীনমাধবের মুখে শোনা যায় 'সধবার একাদশী'তে তারই জের টানা হয়েছে। সমপর্যায়ের চরিত্রের মধ্যে বিরোধ দুটি নাটকেই দৃশ্যমান, যে পদী ময়রাণী ও গোপীনাথ নীলকরদের সপক্ষের মানুষ, তারাই এ পর্যায়ে নীলকরদের ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করেছে। এ যেন অটলের বিরুদ্ধে নিমচাঁদের প্রতিক্রিয়া।

দুই বিপরীত আদর্শের দ্বন্দ্ব 'নীলদর্পণে' পরিস্ফুট। একদিকে দুর্নীতি ও অত্যাচার; অপরদিকে নীতি, ঈশ্বর-বিশ্বাস ও রাজার প্রতি আস্থাপোষণ। এই দ্বন্দ্বই 'সধবার একাদশী'তে অন্যভাবে উপস্থাপিত। একদিকে অটল-নিমচাঁদের উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া, লাগামহীন জীবন অন্যদিকে নীতি-সংস্কৃতির প্রতীক গোকুলবাবুর জীবন ও আচরণ,

গোকুলবাবুর স্ত্রীকে অপহরণ মানে অসংযম কর্তৃক সংযমের নীতির অবমাননা— যদিও শেষ পর্যন্ত তা অসফল হয়েছে। একই পদ্ধতিতে অসংযম কর্তৃক সংযমের ধর্মের অপমান যেন রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানি, তবে ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির স্থূলতা, অনেক সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে 'সধবার একাদশী'তে। পরিমাণেও তা বেশি ইঙ্গিতবহ। 'নীলদর্পণে' খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। 'সধবার একাদশী'তে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সেই বিশ্বাস লক্ষ করা যায়। যদিও দুটি দীনবন্ধুর নিজধর্মের থেকে আলাদা।

কৌতুক ও অপরিহাসপ্রিয়তা দীনবন্ধুর সার্বজনিক বিশেষত্ব। এই পরিহাস রসিকতার বোধ সমাজে সর্বস্তরের সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে সংলাপ দ্বারা প্রকাশমান। দীনবন্ধুর রসিকতা, ছড়া-প্রবাদ 'সাহিত্যিক উদ্ধৃতি' সব দৃশ্যেই হাস্য-পরিহাস বা ব্যঙ্গের ছটা রয়েছে।

'নীলদর্পণে'র তুলনায় 'সধবার একাদশী' বেশি পরিণত, অভিজ্ঞ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। 'নীলদর্পণে' গোলাক বসু ও সাধু ঘোষের পরিবারের প্রায় সকলেই যেমন ঈশ্বর আস্তিক এবং সেই বিশ্বাস অদৃষ্টবাদ ভাগ্যবাদের পরিপুষ্টি করেছে। যুক্তিহীন বিশ্বাসর অবতারণা করা হয়েছে এখানে। 'সধবার একাদশী'তে দীনবন্ধু কাল বৈগুণ্যের কারণটি যেন খুজেঁ পেয়েছেন। দীনবন্ধুর বিচারে কোনো রহস্যময় অজ্ঞাত কারণে নয়। প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের সংস্কৃতি-বিরোধ এবং স্থিরতাবস্থা না থাকার জন্য সেই কালের মধ্যে বিরোধর মাত্রা বেড়ে গেছে। শিক্ষিত নিমচাঁদ সে কারণে হয়তো সংযমী না হয়ে মদ্যপ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে ব্রতী হয়েছে।

'নীলদর্পণ' যদি বিস্তৃত হয় তবে 'সধবার একাদশী' গভীর ব্যঞ্জনাময়।

## ৫.৬ বঙ্গীয় রেনেসাঁস এবং দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা ও নাট্যপ্রকৃতি বিবেচনা করলে তাঁর দুটি বিশেষত্ব সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তিনি রেনেসাঁসের প্রতিবেশে সৃষ্ট নব্য শিক্ষিত বাঙালিমানসের এক প্রতিনিধি, — তার দোষ-গুণ দুই-ই তাঁর মধ্যে বর্তমান, দ্বিতীয়তা তাঁর প্রতিভার নিজস্ব ক্ষেত্র হল, বাঙালির পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবন, তিনি এই জীবনের রূপকার, সেটা তাঁর সীমাও বটে।

তাঁর নাটকসমগ্রের মধ্যে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বটি সুস্পষ্ট, প্রায় সকলেই তাকে 'হাস্যরসিকতা' বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই হাস্যরসিকতা বিন্যস্ত হয়েছে পরিবারিক ও গার্হস্থ্য-জীবনের পট ভূমিকায়। এইজন্য দীনবন্ধুর প্রতিভাকে হাস্যরসের বিশেষত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে পরিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করে নিলে সেই হাস্যরসের গূঢ়তর দিক ধরা পড়বে।

দীনবন্ধুর এই বিশেষত্বটি রেনেসাঁসের প্রতিফল বলে ধরা যেতে পারে। রেনেসাঁসের ফলে সে নবমানবতাবাদ দেখা গিয়েছিল, তার প্রভাবে একদিকে তিনি যেমন নিতান্ত

গ্রাম্যজনকে তাঁর নাটকে স্থান ও মান দিয়েছেন, অপরদিকে মধ্যবিত্তর পরিবারিক জীবনকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মানবতাবাদ' কোনো নিরালম্ব বায়ুভূত বস্তু নয়, তার একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব ভিত্তিভূমি অবশ্যই থাকে। পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনই হল সেই বাস্তব ভূমি।

রেনেসাঁসের মাধ্যমে বাঙালি যে এক নতুন জীবন-প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হল, তা আসলে কতগুলো 'মূল্যবোধ', তা হয়তো কোনো নতুন বা চমকপ্রদ নয়। যে বোধ বা ধারণা বা নীতিবিশ্বাসগুলো চিরকালে মানুষের জীবনধারার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আসছিল নিতান্ত স্বচ্ছন্দে, কালনদীর এক বিশেষ বাঁকে এসে তা হঠাৎ ধাক্কা খেল, যে মূল্যবোধ ভারতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছিল, তা সাময়িকরূপে অন্তর্ধান হল। নবজন্মের ফলে সেই চিরকালের হারানো ধন ফেরত পাওয়া গেল। 'Renaissance' এই শব্দটির মধ্যেই 'আবার জন্ম নেওয়ার' সে ইঙ্গিতটুকু গোপন আছে, তা থেকেই বোঝা যায়, যা একদা ছিল, বর্তমান নেই, এ হল তারই পুনরুদ্ধার।

হারানো যে মূল্যবোধগুলোকে নতুন করে উপার্জন করা হল, একটি কঠিন ও স্থায়ী ভূমি ব্যতীত তার প্রয়োগ বা পরীক্ষা হতে পারে না। এইজন্য দেখা গেল, মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই সেই প্রয়োগস্থল বলতে পারিবারিক জীবনকেই বুঝেছেন। রেনেসাঁস এক একজনের মধ্যে এক এক রকম প্রতিক্রিয়া করেছিল। বঙ্কিমের মধ্যে যা গভীর-গম্ভীর, দীনবন্ধুর মধ্যে তা হয়তো কৌতুক-প্রাধান্যে রূপ গ্রহণ করেছে।

পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধ দিয়েই দীনবন্ধুর চরিত্রাবলি নিয়ন্ত্রিত। তার কিছু নিদর্শন এখানে তুলে ধরা যায়। 'নীলদর্পণে'র পদী ময়রানী-গোপীনাথের মধ্যেও অপরাধবোধ, বিবেকের দংশন, নির্লজ্জ অটলকেও গ্রন্থশেষে বিচলিত হতে দেখা যায়। স্ত্রী ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি প্রীতি-মমতা না থাকলে নিমচাঁদ অমন করে কাঁদতে পারত না। গ্রন্থের মধ্যে অটলকে ইচ্ছে করেই স্ত্রীর প্রতি বিরূপ করে আঁকা হয়েছে; পিতা জীবনচন্দ্রের সঙ্গে বারাঙ্গনা নিয়ে আলোচনা করতে তার লজ্জা নেই। দীনবন্ধু দেখাতে চাইছেন, মদ্যপান পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধকে কতখানি বিপর্যস্ত করেছে।

রামমণি ও গৌরমণি এমনিতেই বৈধব্যের যন্ত্রণায় কাতর, তার ওপর বিমাতার আগমনে জীবন যাতে দুঃসহতর হয়ে না ওঠে, সেই জন্যই 'বিয়ে পাগল বুড়ো' রাজীবকে বিয়ে করতে দেওয়া হল না, অপরদিকে তেমনি দীনবন্ধু ভাঙাঘর জোড়া দিয়েছেন — 'নবীন তপস্বিনী' বা 'জামাইবারিকে'। 'লীলাবতী'তে তেমনি নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের পুনরাগমনে পরিবার-জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পারিবারিক জীবনের সূত্র ধরেই জন্ম-পরিচয়ের বিশুদ্ধ ও সংশয়ের কথা বর্তমান 'কমলেকামিনী'তে। 'সধবার একাদশী'তে মুক্তেশ্বরবাবু ভোলাচাঁদের মতো এক অপদার্থের হাতে কন্যা দিয়েছেন বলে নিমচাঁদ তাঁকে নিন্দে করতে ছাড়েনি। নিজের স্ত্রী বা পিতা-মাতা সম্বন্ধীয় নিমচাঁদের বক্তব্য সম্পূর্ণই রেনেসাসেঁর ফলে অর্জিত মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত। অটল পরস্ত্রী অপহরণের পরিকল্পনা করলে নিমচাঁদ বলে, "তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই।"

রেনেসাঁসের আর একদিক হল আশাবাদ। আদর্শবোধ থেকে এই আশাবাদ আসতে পারে। 'নীলদর্পণে' নীলকর সাহেবদের চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করত দীনবন্ধু এই আশা

পোষণ করেছেন, একদিন তাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং ইংরেজের আদালতে ন্যায়-বিচার পাওয়া যাবে, শাসন ব্যবস্থায় আরো দৃঢ়তা আসবে, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নবীনমাধব আক্ষেপ করেছেন : "হে লেফটনান্ট গভর্নর ! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না... ।" আশ্চর্যের কথা এই, 'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় দীনবন্ধু নিজেই মন্তব্য করেছেন : "উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদয়", গভর্নর জেনারেল, "ন্যায়পর গ্রান্ট মহামতি" লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর হয়েছেন, ইডেন, হার্সেল প্রভিতি সিভিল সার্ভেন্টগণ রাজকার্যে যোগ দিয়েছেন, "অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।"

মহানুভব ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে দীনবন্ধু কল্পনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে ধর্মে যখন গ্লানি দেখা যায়, তখন তিনি যুগে-যুগে মর্ত্যতলে আবির্ভূত হন, 'সধবার একাদশী'র একটি সংলাপে ব্যাপারটি আরো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নিমচাঁদ কেনারামের ইংরেজি-জ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্য যে বাক্যটি দিয়েছে ("ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন"), তা রীতিমতো ভেবে-চিন্তে।

এই আশাবাদ থেকেই এসেছে ধনাঢ্য ব্যক্তির বিশেষ জীবনাদর্শ, Establishment যার মূল কথা। 'সধবার একাদশী'র প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের গোকুলচন্দ্র নিমচাঁদকে বলেছেন : "তুমি ধর্ম কর্ম করবে, এডুকেশন কমিটির মেম্বর হবে, অনারারি মেজিস্ট্রেট হবে, লেফটেনান্ট গবর্নরের কাউন্সিলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা করবে, দুঃখীদের প্রতিপালন করবে..."

রেনেসাঁসের আর এক বিশেষত্ব যুক্তিবোধ ও আধুনিক চিন্তা, মাতাল নিমচাঁদে মদ্যপানের সপক্ষে যুক্তি এই ছিল : "মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে ! পীড়া হয় প্রতিকার কর্ মেজিকল্ সায়ান্স হয়েছে কি জন্যে ?" (১/১)। এ যুক্তির সবটাই মাতালের উক্তি বলে উপেক্ষিত হয় না।

নানা কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির এই রেনেসাঁসকে কোথাও কোথাও বুর্জোয়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বুর্জোয়া-তন্ত্রের দোষগুণ দুইই এতে ধরা পড়েছিল। দোষের একটা বড়ো দিক — আত্মদ্বন্দ্ব বা বিরোধ, সেই বিরোধের শিকার বঙ্কিমচন্দ্রও হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় দীনবন্ধুর মানস অনেক সরল, অনেকটাই সহজ। রেনেসাঁসের আশাবাদ দু-জনের মধ্যেই কাজ করলেও তার প্রকার ও পরিণাম ভিন্ন। নিমচাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইংরাজি শিক্ষা ও শাসনের নৈরাশ্যজনক প্রতিফলকে ("নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক জীবন-সুখ বিফলীকৃত শিক্ষা নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ") লক্ষ করেছিলেন।

বাইরের জীবনের নৈরাশ্য-নিমচাঁদের ঘরের জীবনকেও বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু মূল্যবোধকে সে হারায়নি। একদিকে আশা ও মূল্যবোধ, অপরদিকে নৈরাশ্য; একদিকে আত্মসত্তার প্রতি সচেতনতা। অপরদিকে আত্মহনন — এসবেই রেনেসাঁসের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন।

ডিরোজিওর প্রভাবও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ডিয়োজিওর প্রভাবেও একটি বৈপরীত্য ছিল। একদিকে সকল প্রকার সংস্কার থেকে মুক্তির জন্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্দামতা; অপরদিকে ডিয়োজিওর প্রভাবেই স্বদেশানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি ও সত্যনিষ্ঠা। এজন্যই নিমচাঁদ একদিকে মাতাল, অন্যদিকে সে সব ধরণের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে বিধ্বস্ত করেছে।

## ৫.৭ বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্র

মধুসূদনের নাট্যরচনার সমকালেই আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাংলা নাট্য সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হন— ইনি দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)। দীনবন্ধুর প্রতিভার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলার নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁকে 'নাট্যগুরু' অভিধায় ভূষিত করেছিলেন।

দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভা ও নাট্যপ্রকৃতি বিচার করলে তাঁর দুটি বিশেষত্ব সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি রেনেসাঁসের প্রতিবেশে সৃষ্ট নব্য শিক্ষিত বাঙালি মানসের এক প্রতিনিধি, — তার দোষ-গুণ দুই-ই তার মধ্যে বর্তেছিল; দ্বিতীয়, তার প্রতিভার নিজস্ব ক্ষেত্র হল, বাঙালির পারিবারিক ও গার্হস্থ্যজীবন। তিনি এই জীবনের রূপকার, সেটা তাঁর সীমাও বটে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা, যে রচনা সমাজের গোড়া ধরে টান দিয়েছিল, সমাজে জনজাগরণের ঢেউ তুলেছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের নগ্ন রূপের প্রকাশ ঘটেছিল, সমাজে একটা নতুন পরিবর্তনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। নীলকরদের অত্যাচার নিবারণের জন্য ও ধানের পরিবর্তে কেবল নীল চাষ করলে কৃষক না খেয়ে মরবে এই সামগ্রিক রূপের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর এই অমর সৃষ্টির মধ্যে। এই ঘটনা প্রমাণ করে দীনবন্ধুর জাতীয় প্রীতি কতটা গভীর ছিল। এই নাটকে নাট্যকার কতকগুলো বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের সম্মুখীন করিয়েছেন পাঠক-সমাজকে। দীনবন্ধুর মতো বাস্তব চরিত্র নির্মাণে ও পল্লি বাংলার কৃষকদের জীবন প্রদর্শনে আজ পর্যন্ত কেউ তেমন দক্ষতা দেখাতে পারেননি। এই নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ হলে 'ইন্ডিগো কমিশন' বসে এবং ধীরে ধীরে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়। কমিশন বুঝেছিল সমাজের যে জায়গায় এই ঘটনা চলে গেছে এই মুহূর্তে একে বন্ধ করতে না পারলে একটা বৈপ্লবিক উত্থান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করতে 'নীলদর্পণ' অসামান্য ভূমিকা পালন করে। 'নীলদর্পণ' বাংলাদেশে বিরাট এক জনহিতকর কর্ম সম্পাদন করে।

উনিশ শতকের যে সময়ে দীনবন্ধুর জন্ম ও নাটক রচনা, তখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত এবং ইয়ং বেঙ্গলদের প্রাদুর্ভাব। ছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রসার, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, ঘরজামাই প্রথা ও মদ্যপান। এসবই তাঁকে দেখতে হয়েছে। অভিজ্ঞতার ফসল ব্যাপ্ত হয়েছে তার নাটকগুলিতে। এছাড়াও সংস্কারক ও চরম বাস্তবতার পথিক দীনবন্ধু সমাজের অন্যান্য ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেননি। বৃদ্ধের বিবাহ, কুসঙ্গে

চরিত্রহানি প্রভৃতি তৎকালীন বাঙালি সমাজের দোষগুলিকে নানা নাটকে ও প্রহসনে অঙ্কিত করে উদ্‌ঘটিত করে দেখিয়েছেন।

আমাদের আলোচিত নাটক (সধবার একাদশী) সমসাময়িক কালের শিক্ষিত যুবক এবং ধনীর আদরে লালিত বিপথগামী সন্তানদের প্রকৃতি ও পরিণাম চিত্রিত হয়েছে — গিরিশচন্দ্র সেই অর্থেই সমাজ-দর্পণ রূপে নাটকটিকে গ্রহণ করে সমাজচিত্র আখ্যা দিয়েছিলেন। এতে সে যুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি চরিত্র ভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

দীনবন্ধুর নাটকে তাঁর ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাব একটি বড়ো দিক হয়ে উঠেছিলে। এজন্য তাঁর নাটকে তিনি একই ব্যাপারের দুই বিপরীত দিক প্রদর্শন করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'সধবার একাদশী' এবং 'জামাই বারিকে'র কথা বলা যায়।

নাট্যশিল্পের প্রতি দীনবন্ধুর সচেতনতা ব্যক্ত হয়েছে স্থানের নামগ্রহণে এবং চরিত্রের নামকরণে।

এছাড়া দীনবন্ধুর নাটকদের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক হচ্ছে হাস্যরস। দীনবন্ধু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের শিল্পী। কারণ, তিনি তার নাটকের কাহিনি ঘটনা-চরিত্রের ক্ষেত্রে হাস্য-রসকে প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য করে তুলতে পেরেছেন।

সুতরাং বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এ-প্রসঙ্গে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং সমালোচকের উদ্ধৃতি তুলে ধরা যায়—

(১) দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে নট-নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চের পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "বঙ্গ রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' অভিনীত হয়ে চলেছে।

(২) জগত ও জীবনের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা এবং 'ট্রাজেডির অশ্রু' ও 'কমেডির হাস্যরস' নিয়ে দীনবন্ধু নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। সমালোচক ড° অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অগ্রদূত এবং বোধহয় তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান বাস্তববাদী লেখক।"

(৩) দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনের নাট্যরসের বৈশিষ্ট্যর কথা বলতে গিয়ে ড° অজিতকুমার ঘোষ 'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' গ্রন্থে জানিয়েছেন, "দীনবন্ধুর হাস্যর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাবল্য সর্বাপেক্ষা বেশি, কিন্তু তাঁহার হাস্যরস শুধু সশব্দ ফেনিল, কালোচ্ছ্বাসে শেষ হইয়া যায় না, তাহার গভীরতর স্তরে জীবনের একটি সত্যোপলব্ধি একটি ক্ষমাসুন্দর, ক্ষমতা-করুণ দৃষ্টি বিরাজ করে।"

(৪) কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, "জীবনের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতিগোচর তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে আপনারই নিয়মে, একটি সুসমঞ্জস রসমূর্তি পরিগ্রহ করে — যাহা আছে তাহাতে তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয় — এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যভিমান— বর্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথ দেখাইয়া বস্তুসকলের সুগভীর রহস্য-নিকেতন লইয়া যায় এবং এই যথাপ্রাপ্ত জগৎই অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া সে রসের আস্বাদন করায়, নাট্যকার সেই রসের রসিক। কল্পনার এই objectivity উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে — সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

## ৫.৮ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

দীনবন্ধুর প্রতিভার গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলার নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁকে নাট্যগুরু অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু গভীরতা অন্বেষণের অভাবে, অশ্লীলতার দায়ে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'সধবার একাদশী' একসময় আইনত নিষিদ্ধ হয়। এ শুধু নাট্যকারের দুর্ভাগ্য নয়, বাঙালির জাতীয় দুর্ভাগ্যও বটে। বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাধর ও শক্তিশালী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা নাট্যকারদের যে যে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা ছিল, আপন প্রতিভাবলে তিনি সেসব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) কেবল তাঁর প্রখ্যাততম সৃষ্টি নয়, বাংলা সাহিত্যেরও একটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকখানি দিয়েই ১৮৭২ সালে ন্যাশনেল থিয়েটার শুরু হয়। 'নীলদর্পণে'র ছিল একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, একটি স্বাদেশিক ও মানবিকতার মুখ। নাটকের শিল্পের দিক থেকে অনেক সমালোচকই এর দোষ-ত্রুটি লক্ষ করছেন। কিন্তু ভাবের গভীরতা, নাট্যব্যঞ্জনা, চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে, 'সধবার একাদশী'কেই 'নীলদর্পণে'র পরে স্থান দিতে হয়। দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভা ও নাট্যপ্রকৃতি বিচার্যে তার বিশেষত্বের মূল কারণটি অনুধাবন করা যায়। তিনি রেনেসাঁসের প্রতিবেশে সৃষ্ট নব্য শিক্ষিত বাঙালি মানসের এক প্রতিনিধি, সুতবাং রেনেসাঁসের ফলে উদ্ভুত পরিবেশের দোষ-গুণ দুই-ই তাঁর মধ্যে বর্তেছিল। রেনেসাঁসের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট নবমানবতাবাদ স্থান পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে, যার বাস্তবভূমি হল পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবন। রেনেসাঁসের মূল্যবোধে সমৃদ্ধ দীনবন্ধুর মনন। এই পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টি করেছে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'সধবার একাদশী'।

## ৫.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ৫.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

## বিভাগ- ৬
## সধবার একাদশী
## সধবার একাদশী : কাহিনী বিন্যাস, ঘটনা সংস্থাপন, climax , নাট্য পরিণতি নাটক বিচার

**বিষয় বিন্যাস**

৬.০ ভূমিকা (Introduction)
৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
৬.২ সধবার একাদশী : কাহিনি বিন্যাস
৬.৩ ঘটনা সংস্থাপন, climax
৬.৪ নাট্যপরিণতি
৬.৫ নাটক বিচার
৬.৬ নামকরণ
৬.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
৫.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
৫.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ৬.০ ভূমিকা (Introduction)

'সধবার একাদশী' নাটকটি সম্পর্কে বঙ্গীয় সমালোচকরা দুই বিপরীত মত অবলম্বন করেছেন। বস্তুত, 'সধবার একাদশী'র কাহিনি, ঘটনা, পরিণতি ও climax কিছুই সনাতন দৃষ্টিতে বিচার্য নয়। তার কারণ, নাট্যকারের উদ্দেশ্য এখানে কাহিনি কথন নয়। অস্পষ্ট কাহিনির আড়ালে সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, লেখক কাহিনির কিছু আভাস দিয়ে একটি ভাবকে সঙ্কেতায়িত করেছেন, রেনেসাঁসের ফলে যে মানব-চেতনা জাগে, যে হারানো মূল্যবোধগুলি পুনরায় অর্জিত করা যায়, পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠা করাই বাঙালিদের তখন প্রবল বাসনা ছিল। 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রারম্ভ থেকেই দীনবন্ধু তাঁর পরিকল্পনার সূক্ষ্মতা ও সমগ্রতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পরিকল্পনাটির পেছনে যে বোধটি সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছে, তা হল একটি অখণ্ডতা ও সমগ্রতার বোধ। এই আলোকেই নাটকটিকে বিচার করে দেখা যেতে পারে।

### ৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায় পরিকল্পনা আপনাদের সাহায্য করবে —

- 'সধবার একাদশী' নাটকের কাহিনি বিন্যাসের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করতে।
- নাটকদের ঘটনা-সংস্থাপন, climax ও নাট্যপরিণতির পরম্পরা অনুধাবন করতে।
- 'সধবার একাদশী' নাটকের বিচার বিশ্লেষণ করতে।

## ৬.২ সধবার একাদশী : কাহিনি বিন্যাস

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকটি বঙ্গীয় সমালোচকেরা দুই বিপরীত মত অবলম্বন করেছেন। দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন মশাইয়ের একটি বিশেষ অভিযোগ এই ছিল — "তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক খোশগল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেইগুলি পুস্তক মধ্য প্রবেশ করাইয়াছেন"। ('বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব', ১৯৩৫, পৃ. ২৭০)। এরই দলে, কখনো-কখনো দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক অংশ জুড়ে দিয়েছেন। অতঃপর ন্যায়রত্ন মশাই সেসব অপ্রাসঙ্গিকতার কিছু নিদর্শন দিয়েছেন। সুখের বিষয়, 'সধবার একাদশী' থেকে তিনি এই ধরনের অপ্রাসঙ্গিকতার দৃষ্টান্ত দাখিল করেননি।

কিন্তু অন্য সমালোচকরা, প্রায় সবাই এই নাটকটির কাহিনি সম্পর্কে নিতান্ত নিরাশ হয়েছেন। তাঁদের সকলের মত-মন্তব্যের সার-নির্যাস এই : নাটকটিতে একটি আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বলিত পরিপাটি কাহিনি নেই, যাও বা আছে, তার গতি নিতান্ত মন্থর; নাটকের কোনো অংশ 'পুনরুক্তিময়', কোনো অংশ বা চরিত্র আবার অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট। চরিত্রগুলোতে দ্বন্দ্ব-বিবর্তন নেই, এই জন্য পরিণতিকে খাপছাড়া বলে মনে হয়।

ঠিক এর বিপরীত কথা শোনা যায় — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে (দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) : "মনুষ্যচরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রসূত নির্লিপ্ততা detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় শেক্সপীরীয় করিয়া তুলিয়াছে। ... ইহার চরিত্র সমাবেশ ও বিকাশ, বাচনভঙ্গি, ঘটনাপ্রবাহ এবং অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করে না, বরঞ্চ বাস্তবতায় বিস্মিত করিয়া তোলে। 'সধবার একাদশী'র বার্তালাপ অথবা ঘটনা-সংস্থান কুত্রাপি নাটকীয় হইয়া উঠে নাই, স্বাভাবিক পরিণতি কোথাও হয় নাই।"

এই দুই বিপরীত মতের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেছেন ড° ক্ষেত্র গুপ্ত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র (মে, ১৯৬৭) ভূমিকা প্রসঙ্গে। তিনিও নাটকটির কাহিনি বিন্যাসে সনাতন দৃষ্টিতে পুনরুক্তি, অসংযম, নক্সা-রীতি ইত্যাদির প্রভাব লক্ষ করেছেন, কিন্তু সেখানেই না থেমে নাট্যকারের মধ্যে নাট্যরীতির পরীক্ষা- প্রয়াসকে লক্ষ করেছেন : "হয়তো নূতন রীতিতে unity of action এর স্থানে unity of impression এর কোনো আদর্শ অনুসরণ করতে তিনি চেয়েছিলেন।"

প্রকৃতপক্ষে, 'সধবার একাদশী'র কাহিনি, ঘটনা, পরিণতি ও climax কিছুই সনাতন দৃষ্টিতে বিচার্য নয়। তার কারণ, নাট্যকারের উদ্দেশ্য এখানে কাহিনি কথন নয়, অস্পষ্ট কাহিনির আড়ালে সুস্পষ্ট ও সচেতন ভাবে গভীর ব্যঞ্জনাসৃষ্টি। নাটকের আখ্যানপত্রেই যে তিনজন ইংরেজ কবির বচন উদ্ধৃত হয়েছে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য তাতে প্রচ্ছন্ন থাকেনি। কিন্তু স্পষ্ট করে উদ্দেশ্যকে উচ্চারণ করেই তিনি সেই উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করেও যেতে পেরেছিলেন, সেটাই তাঁর কৃতিত্ব। কাহিনির কিছু ইঙ্গিত দিয়ে একটি ভাবকে সঙ্কেতায়িত করেছেন।

রেনেসাঁসের ফলে যে মর্ত ও মানব-চেতনা জাগে, যে হারানো মূল্যবোধগুলিকে জাতীয় জীবনে পুনরায় অর্জন করা হয়, পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমিকায় তাকে স্থাপন করে বাচাই করবার একটি বাসনা তখন বাঙালিদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই বাসনাই বাস্তবায়িত হয়েছে আলোচ্য নাটকটিতে। এটিই এ- নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব, কয়েকটি বিশিষ্ট দিক থেকে নাট্যকার সেই ভাবটিকে রূপ দিয়েছেন —

(১) পারিবারিক জীবনের ভিত্তি জীবনের তিনটি প্রধান সংস্কার — জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ-প্রসঙ্গ; (২) পারিবারিক জীবনের সংহতির ভিত্তি হল, পরিবারের, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্কের দৃঢ়তা; আলোচ্য নাটকে যুগের বিশিষ্টতার জন্য সেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নতুন ভাবাদর্শের জন্যে পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের পুনঃপ্রয়াস এবং বিরুদ্ধ সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দান করা হয়েছে, (৩) এজন্যে এ-নাটকে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তির চিত্র নেই; নিমচাঁদ-অটল প্রমুখ ঘরে ফিরতে চায় না; (৪) অটল ও নিমচাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ও পারিবারিক সম্পর্ক; (৫) নিমচাঁদকে একাধিক চরিত্রের সঙ্গে সমীকরণ; (৬) পারিবারিক জীবনের সুস্থ ও মহৎ আদর্শরূপে, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে রামায়ণকে গ্রহণ। এছাড়া একটি যুগকে পটভূমিকারূপে গ্রহণ করবার জন্যে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন চরিত্র সংগ্রহ — এই ক'টিই হল নাটকের কাহিনি বিন্যাস ও ঘটনা সংস্থাপনের মূল বৈশিষ্ট্য।

কাহিনি বিন্যাসে মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যার প্রসঙ্গকে এধাধিকবার একাধিক চরিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে; সব কটি ক্ষেত্রেই তুচ্ছ কারণে সেই 'মৃত্যু' এসেছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত মৃত্যু নয়; এটি যে একটি সঙ্কেত বা ব্যঞ্জনা সামান্য অবহিত হলেই তা বোঝা যায়।

মৃত্যুর চিন্তাতেই শেষ নয়, জন্ম ও নবজন্মের প্রসঙ্গও আছে, — যা পরিবার ও সমাজদেহ গঠনের এক সৃষ্টিমূলক দিক। সেই নবজন্মের ফলে যে মানুষের জন্ম হবে, তা একদিকে অটল-নিমচাঁদ ভোলাচাঁদের মতো মূঢ় মানুষদের মধ্যে থেকেই, অপরদিক অসুস্থ পরিবেশকে কাটিয়ে ওঠে।

জন্মমৃত্যুর পর সমাজ গঠন ও পরিবার-রচনায় বিবাহের ভূমিকা এবার আলোচ্য। নবজন্ম ও মৃত্যুর প্রসঙ্গে যেমন 'ম্যাকবেথ' নাটক প্রাধান্য পেয়েছে, বিবাহের প্রসঙ্গে তেমনি সঙ্গত কারণেই 'দি ট্র্যাজেডি অফ্ ওথেলো' নাটকের প্রাধান্য দেখা যায়।

দাম্পত্য জীবনের হারিয়ে ফেলা শান্তির জন্য অতৃপ্তি, একটি সুস্থ পারিবারিক জীবনের জন্য ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক জীবনে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা — নিমচাঁদকে কাতর করেছে। এই জন্যেই কখনো সে নিজেকে রামচন্দ্রের সঙ্গে সমীকৃত করে, কারণ তিনিও তো স্ত্রী হারিয়েছেন (স্মর্তব্য গর্ভাঙ্কের প্রথমেই গোকুলবাবুর বাড়ির দুই দারোয়ানের নাম — অযোধ্যা ও রঘুবীর)।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ - এই তিনটি প্রধান সংস্কারকে অবলম্বন করে যে পারিবারিক জীবন, তা-ই হল এই এই নাটকের কাহিনির মূল দিক; তাকেই পটভূমিকা করে কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে।

এই পারিবারিক বন্ধন, ঐক্য ও সংহতি সম্প্রতি বিনষ্ট ও বিছিন্ন হয়ে গেছে বলেই আবার এর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছে। এই জন্যই একদিকে পরিবার-বহির্ভূত মানুষদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের বিচিত্রা চেষ্টা, অপরদিকে সেই সম্পর্ক আবার 'বিরুদ্ধ সম্পর্ক', পরিবার বহির্ভূত মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে পরিবারের পরিধিকে বৃহত্তর করে নিয়ে পূর্ণ সমাজের আভাস দেওয়া হয়েছে।

পরিবার-চেতনা ছাড়া এই নাটকের কাহিনি-বিন্যাসে অপর যে কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছে, তা হল অটল-নিমচাঁদের অভিন্নতা প্রদর্শন করে সমস্ত নাটকটির মধ্যে ঐক্য-সংহতি আনয়ন করা। কাহিনির পরিণতির সঙ্গেও এই দুটির অভিন্নতা জড়িত। অটল ও নিমচাঁদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকলেও দুজনেই দুজনের পরিপূরক চরিত্র। দুজনেই একটি যুগের প্রতিনিধি ও প্রতীক। এই যুগের নানা দোষ ও গুণ দুই-ই ছিল। দোষের ফলে অনেক প্রতিভার অকাল-বিনাশ ঘটেছে; তেমনি দোষের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি নীতি আদর্শ, মূল্যবোধ ও সূক্ষ্ম সাহিত্যানুভূতিও তাদের মধ্যে ছিল। একদিকে ছিল 'বাবু কালচার', শিক্ষা অপেক্ষা বিলাস যাদের মধ্যে বেশি, অপরদিকে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, অটল-নিমচাঁদ এই দুই ভাবের প্রতীক। যেহেতু ভাব দুটি আবার একই যুগের, সেহেতু চরিত্র দুটিও স্থানে স্থানে অভিন্ন।

প্রথম অঙ্কে নিমচাঁদ অটলকে মদ্যপানের প্রতি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু অটল তখন প্রতিজ্ঞায় 'অটল', মদ্যপানে আসক্তি নেই, — অটল-নিমচাঁদ এখানে পৃথক। দ্বিতীয় অঙ্কে অটল-নিমচাঁদ কাছাকাছি এসেছে। তৃতীয় অঙ্কে দুজনে মিলিত হয়ে একটি নতুন পরিণতি লাভ করেছে। অটল নিতান্তই দুশ্চরিত্র মদ্যপ, তার মধ্যে যদি কিছু ভালোত্ব থাকে তা নিমচাঁদরূপে প্রদর্শিত। অটলের ভবিষ্যৎ শুভবুদ্ধির প্রতীক নিমচাঁদ।

দুজনের অভিন্নত্বের অন্য প্রমাণ তৃতীয় অঙ্কে পাই। এই অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বিশ্বের সকল যুগের কামনার প্রতীক, মিশরের ক্লিওপেট্রাকে নিমচাঁদ 'জননী' বলে সম্বোধন করেছে, যেমন কি না কাঞ্চনের কোলে অটলকে দেখে নিমচাঁদের মনে হয়, যশোদার কোনো নীলমণি, কামনার আসঙ্গ জড়ানো যে নারীর সঙ্গে, নিমচাঁদ প্রথমে তাকে জননী বলে, বারাঙ্গনাকেও জননীরূপে দেখেছে অটলের মাধ্যমে। এই ভাবনার মধ্যে দুজনে এক ও অভিন্ন, — নিমচাঁদের ভাবনা অটলে প্রদর্শিত। নিমচাঁদ-অটল পর্যায়ক্রমে বিরুদ্ধভাবে পিতা-পুত্র; জীবনচন্দ্র দুজনেরই পিতা। নারীকে 'জননী' বলা যেমন নিমচাঁদ

থেকে অটলে সঞ্চারিত, তেমনি অটলের 'বেঁচে ওঠার' কলেই নিমচাঁদের আত্মজাগরণ সম্ভাবিত হয়েছে।

দীনবন্ধু এই দুটি চরিত্রের মধ্যে একটি নিগূঢ় যোগ প্রদর্শন করেছেন। দুজনেই দুজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং দুজনের অভিন্নত্বের মধ্যে নাটকের কাহিনি-বিন্যাসের একটি কৌশল গোপন আছে। 'সধবার একাদশী' নাটকের কাহিনি-বিন্যাসের প্রথম দিক পরিবার চেতনা; দ্বিতীয় দিক অটল-নিমের অভিজ্ঞতা; এইবার তৃতীয় এবং শেষ দিক, সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র সংগ্রহ করে একটি যুগকে ফুটিয়ে তোলা।

অটল হল ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় বাবু কালচারের প্রতীক, তার পড়াশোনাও হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে, Baboo's class এ। মদ্যপান, রক্ষিতারক্ষণ, ইয়ার-মোসাহেব নিয়ে বাগান বাড়িতে বৈঠকখানায় উদ্দাম জীবন যাপন, অকাতরে অর্থব্যয়, ইত্যাদিতো আছেই। কুমুদিনী তাই বলেছে, "কিসে লোকে বাবু বলবে, কেবল তাই দেখে" (২/১)। কাঞ্চন যেহেতু 'বাবু'র রক্ষিতা। অতএব নিমচাঁদ ব্যঙ্গ করে তাকে বলে 'কাঞ্চন বাব্বী' (২/৪)। ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য, নিমচাঁদ প্রভৃতি সকলেই সেই 'বাবু'র ইয়ার বা মো-সাহেব। এই বাবু কালচারের, নানা দোষ সত্ত্বেও একটি আভিজাত্য ছিল, এবং সেজন্যই অনেকের কাছে তার দুর্নিবার আকর্ষণও ছিল। সেই কালচার পুরোপুরি আয়ত্ত করতে না পেরে রামমাণিক্যের আক্ষেপ শোনা যায় : "এতো অকাদ্য কাইছি তবু কলকাত্বার মত হবার পারচি না। কলকাত্বার মত না করচি কি?" (১/২)। ধ্বংস থেকে আনলেও সে কালচারের একটি অপ্রতিরোধ আকর্ষণ ছিল। এজন্যই নাটকের আখ্যাপত্রে উইলিয়াম কলিন্‌স্‌- এর কবিতা পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি হয়েছে। 'Ah! why was ruin so attractive made, ...' পূর্ব ও পশ্চিম উভয়বঙ্গের পূর্ণ প্রতিবিম্বের জন্য রামমাণিক্যকে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভোলাচাঁদ হল সেই মোসাহেব শ্রেণিরই একজন, তাঁর বেশবাসেও বাবুয়ানা আছে : মূলত সে নিমচাঁদের বিপরীতে। অসম্পূর্ণ ইংরেজি শিক্ষার বঙ্গীয় নিদর্শন রূপে নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। কেনারাম হল Bureaucracy বা আমলাতন্ত্রের প্রতীক, যে আমলাতন্ত্র চাকুরিজীবী বাঙালির কাছে বিশেষ লোভনীয় এবং সেহেতু আমলাদের মনের গর্ভ-দম্ভ কেনারামের মধ্যে সম্পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায় — পতিতালয়ে গমনেও তার সঙ্গে আরদালি চাই। সবার শেষে, নিমচাঁদ : সে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসের প্রতীক ও প্রতিনিধি। তাকেই মাঝখানে রেখে, তারই চোখ ও মন দিয়ে আর সব চরিত্র বিচার্য, এ-বিষয়ে এই নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক (যেটি নাটকের দীর্ঘতম দৃশ্য এবং অধিকাংশ চরিত্রের আনাগোনা যেখানে) এবং তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক উল্লেখযোগ্য। এই দুই দৃশ্যেই ওপরের চরিত্রগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অটলের বৈঠকখানাটি যেন একটি যুগের সামাজিক বিভিন্ন অপরাধের বিচারালয় কিংবা 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের শয়তানের সভাগৃহ কিংবা একটি যাদুঘর। নিমচাঁদ হল বিচারক। প্রত্যেকটি চরিত্রের বিচার চলেছে, যেন বিচারালয়ে একে-একে ডাক পড়েছে, বিচার শেষ হতেই তারা বিদায় নিয়েছে। সবচেয়ে বেশি জেরা করা হয়েছে কেনারামকে, মাঝে মাঝে সত্যিই আদালতের ভাব-ভাষা-ভঙ্গি ব্যবহার করে দীনবন্ধু আমাদের মধ্যে এই

'ইলিউশন' সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, — এটি একটি কালের বিচার সভা, কিংবা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি যুগের চরিত্রের যাদুঘর এটি।

সব চরিত্রকে একে একে বিচার করবার পর শেষে নিমচাঁদ নিজেই নিজেকে বিচার করতে বসেছে। এই আত্ম-অধ্যয়ন ও আত্ম-সমীক্ষাই নাট্যকারের লক্ষ্য। যে চরিত্র সমকালীন অন্যান্য চরিত্রকে বিচার করতে সক্ষম, সেই নিজেকে তাদেরেই আলোকে বিচার করে নিজের দোষ গুণের কথা উল্লেখ করেছে। নিমচাঁদের আত্মবিচার নিতান্ত নিরপেক্ষ, নিজেকে 'পিনাল কোড' বলে উল্লেখ করেছে সে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ছিল একদিকে সাহিত্য ও স্বদেশ সম্পর্কে অনুরাগ, তা-ই স্মরণ করে সে বলেছে, "তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা ...", আবার তাদের মদ্যাসক্তিকে স্মরণ করে গোকুলবাবু মদ ছেড়েছেন বলে, নিমচাঁদের আক্ষেপ, "... কলেজের নাম ডুবলে মদ খেতে চায় না।"

এই দৃষ্টিতে বিচার করলে, ভোলা, রামমাণিক্য, কেনারাম প্রভৃতি চরিত্রকে প্রাসঙ্গিক মনে হবে। নিমচাদঁকে তার আত্মবিচার করার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন নাট্যকার। এছাড়া, এদের দাম্পত্য-জীবনের বিফলতা প্রদর্শন করে নাটকটির নামকরণে বিস্তার সৃষ্টি করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

এভাবে 'সধবার একাদশী'র কাহিনি-বিন্যাসের কৌশলতাগুলো দেখানো গেল। কোনো সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কাহিনির ধারা এতে না থাকলেও, কাহিনির মধ্যে একটি unity of impression কে অন্বেষণ করা যেতে পারে।

## ৬.৩ ঘটনা-সংস্থাপন, climax

'সধবার একাদশী' নাটকটির ঘটনা সংস্থাপনের প্রসঙ্গে দুটি বড় ঘটনার উল্লেখে করা যেতে পারে। গোকুলবাবুর বাড়িতে নিমচাঁদকে ঢুকতে না দেওয়া (২/৩); এবং নকুলবাবুর বাগান বাড়িতে অটলকে না জানিয়ে কাঞ্চনের যাওয়া (৩/১)। দুটি ঘটনারই ফল সুদূর প্রসারী। এই আঘাতই দুজনের কাছে গভীর ভাবে নেমেছে এবং এই আঘাতের ফলশ্রুতিতেই দুজনের চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে। নাটকের গঠনের সঙ্গেও ঘটনা দুটির গভীর যোগ আছে। গোকুল-নকুল এই দুই নামের মধ্যে মিল আছে। একটিতে বলেও ঢুকতে না পারা, আর একটিতে না বলে যাওয়া, — এসমস্ত দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দুটি ঘটনাকে যেখানে নাট্যকার এক বিন্দুতে এনে ফেলতে পেরেছেন। সেখানেই নাটকটির গঠনের সঙ্গে এদের যোগ দেখা যাবে; এবং তারই মধ্যে নিহিত আছে ঘটনা-সংস্থাপনে নাট্যকারের কৌশল।

নিমচাঁদকে গোকুলবাবুর বাড়িতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হল না, যেন সমাজে তার স্বীকৃতি জুটল না। গোকুলবাবুর বাড়ি কেবল গোটা সমাজের প্রতীক নয়, শান্তি ও সুস্থতারও প্রতীক। বিশেষত পারিবারিক জীবনের। এজন্যেই বুঝি তার স্ত্রী হরণের

পরিকল্পনা। প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার আঘাত নিমচাঁদকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এই অপমানবোধ তাকে গোকুলের প্রতি প্রতিশোধ-পরায়ণ করেছে, কিন্তু এতে লাভ হয়েছে, নিমচাঁদকে নিজের প্রতি ফিরিয়ে এনেছে। নিমচাঁদের ব্যর্থতা যে কেবল দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনেই আবদ্ধ নয়, সামাজিক দিক থেকেও, এই ঘটনায় তারই নির্ভুল প্রমাণ পাই। এতে চরিত্রের প্রসারতা বেড়েছে।

ওদিকে নকুলের বাগানবাড়িতে অটলকে না জানিয়ে কাঞ্চনের যাওয়াকে অটল এক আঘাত বলে মনে করল। আঘাত দুদিক থেকে; তার বাবুয়ানায়, তার প্রেমাবেগে, অটলের মধ্যেও যে প্রেম ও অভিমান আছে! একটি বারবণিতাকেও কেন্দ্র করে যে তা প্রকাশিত হতে পারে, নাট্যকার সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশের পর অটলের মূর্ছা ঘটিয়ে, তার নবজন্ম করিয়েছেন। বারাঙ্গনার বিশ্বাসঘাতকতাই তার জীবনে সেই শুভ-মুহূর্ত এনে দিল। আয্যোপত্রে উদ্ধৃত কবি কালিংস্- এর কবিতায় দ্বিতীয় ছত্রটির সার্থকতা লক্ষ করা যায়। 'or why fond man so easily betroyed?' যে বস্তুতে এত মনোরম আকর্ষণ আছে। এত সহজে কেন তা বিশ্বাসঘাতকতা করে? বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের জীবনের কোনো সময়েই কাম্য নয়, কিন্তু কাঞ্চনের বিশ্বাসঘাতকতা বিশ্বাসভঙ্গতায় অটলের জীবনে নতুন মোড় এনে দিয়েছে।

এই বিশ্বাসভঙ্গতায় অটল কাঞ্চনের প্রতি বিরূপ হয়ে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হল। এক পাপ ঢাকতে গিয়ে আর এক পাপ করে ফেলল। কিন্তু এতে লাভ হল যে, তার আবেগ ও অভিমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটল। সেটুকুতেই নিহিত রয়েছে তার উন্নতি এবং বিবর্তন। কাঞ্চনের প্রতি বিরূপ হয়ে সে গোকুলের স্ত্রীকে বের করতে চাইল এবং যেহেতু গোকুলের প্রতি নিমচাঁদ রেগেই ছিল; দুজনের রাগই গোকুলের ওপর বর্ষিত হল। এভাবে নাট্যকার দুটি ঘটনাকে এক বিন্দুতে এনে মিলিত করেছেন এবং এতে নাট্যকার গঠনগত ঐক্য ও সংহতি অধিষ্ঠিত হয়েছে।

এরফলেই দেখা গিয়েছে নাট্যকাহিনির সর্বোন্নয়ন বা climax প্রেমের দিক থেকে অভিমানাহত অটলের নিমচাঁদকে পদাঘাত, রুমালের ফাঁস দিয়ে সাময়িক মূর্ছা বা পতন। অটলের 'চেঁচে ওঠা', মাতৃ দর্শনে গমন। নিমচাঁদের আত্মজাগরণ। দুজনেরই নবজন্ম ঘটা। বস্তুত অটল নিমচাঁদেরই Alter ago বা আত্মপ্রতিরূপ, নিজেরই সদা-জাগ্রত বিবেক একটি পদাঘাত হয়ে অটলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্যই নিমচাঁদ প্রতিবাদহীন। অটলের পদাঘাতে নিমচাঁদের 'দূরে পতন' অর্থ— ঘৃণা জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাওয়া বা সরে যাওয়া। নিমচাঁদকে একটি উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্য, তার কৌতুক-প্রবণতাও এখানে চরমসীমায়। কিন্তু এই কৌতুকের ছলে যে রোদনের গোপন আয়োজন চলছিল তারই পরিস্ফুটন ঘটেছে পরে।

## ৬.৪ নাট্য পরিণতি

নাটকটির পরিণতি বিচারকালে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ্য। এক পরস্ত্রী হরণ এবং দুই হল পুনশ্চ মদ্যপান। দুটি ঘটনার সঙ্গেই অটল নিমচাঁদ জড়িত, অটল-নিমচাঁদকে

আমরা যুগ্ম চরিত্র বলেছি। সে হিসেবে উল্লিখিত চুটি ঘটনার দায়ভার দুজনের ওপরই সমান বর্তাবে। অটল-নিমচাঁদ পরস্পরের সমালোচক, এজন্য অটলকে দিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়ে নিমচাঁদকে দিয়ে সেকাজ সম্পর্কিত টাকা-মন্তব্য করানো হয়েছে। এ যেন নিজেরই কৃত কর্মকে নিজের সমালোচনা-বিশ্লেষণ করে দেখা।

অটলের কৃত-কর্মের ওপর নিমচাঁদ যে টীকা মন্তব্য করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শেক্সপিয়র-মিল্টনের নাটক বা কাব্যের আলোকে। দীনবন্ধু নিমচাঁদের মাধ্যমে উক্ত দুই শিল্পীর রচনা থেকে ভাষা গ্রহণ করে, পরোক্ষে আলোচনা করেছেন। তার কারণ, সে যুগের শিক্ষিত যুবকগণের মানসিক জগতের নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন এঁরাই, যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধে শেক্সপিয়র-মিল্টনের নাম উল্লেখ না করে কালিদাস, বাইরন ও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বলেছেন।

পরিণতি বিচারের সঙ্গে সে যুগের দোষ-গুণ স্খালনও বিচার্য, পাপ অন্ধে দুজনে এতদিন পর্যন্ত আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, একদিনে বা একেবারেই তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভবপর নয়। পূর্বের অভ্যাস-সংস্কার কিছুটা হলেও দ্বিধার আকারে তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। সেজন্যই এই হীন পরিকল্পনা। আবার নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল, কালের বা যুগের অসঙ্গতি প্রদর্শন। সে অসঙ্গতির অশুভ ফল, যাদের মধ্যে সদ্যই শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটেছে, তাদের মধ্যেই প্রদর্শন করা সঙ্গত। যদি অটল-নিমচাঁদ নবজন্মের পূর্ববর্তী স্তরেই বর্তমান থাকত, এবং তখন তাদের ওপর কালের অসঙ্গতির অশুভ ফল পর্যালোচনার পরিকল্পনা নাট্যকার করতেন। তবে তার কোনো নৈতিক বা সামাজিক সমর্থন থাকত না। কারণ, যে ব্যক্তিরা ঘোর মদ্যপ, তাদের বিকট কাণ্ড-কারখানা এমনই অসঙ্গতিময়, সেখানে যুগের অসঙ্গতির প্রদর্শনের কথা ওঠেই না। এজন্য অটল-নিমচাঁদের নবজন্ম ঘটিয়ে, তাদের মানসিক দিক থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করে। তবে কালের অসঙ্গতির অশুভ ফল প্রদর্শন ও পর্যালোচনা করবার সার্থকতা আসে, নতুবা নয়। দীনবন্ধুর পরিকল্পনাটি সূক্ষ্ম এবং সেটি যথার্থভাবেই অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে।

লক্ষ করতে হবে দুজনের উদ্দামতা এতই বেড়েছিল যে তারা বৈঠকখানাতেও মদ্যপান করত। দুজনের বাগানে যাওয়া যেন তাদের উদ্দমতা প্রশমিত হওয়া। দ্বিতীয়ত, সূক্ষ্ম আভাসে নাট্যকার জানিয়েছেন, এই মদ্যপান নেশার জন্য নয়। এ হল গায়ের ব্যথা কমাবার জন্য ঔষধরূপে সীমিত মাত্রায় সব্য। তৃতীয়ত, নিমচাঁদের ছড়াটির মধ্যে দ্বিধা : প্রথম দুটি পঙ্‌তিতে মদ্যপানের আমন্ত্রণের আনন্দ, তবে শেষ দুটি পঙ্‌তিতে সেই আমন্ত্রণকারীকে সরাসরি ব্যঙ্গ। এই ব্যঙ্গই প্রমাণিত করে, এই মদ্যপান অন্যদিনের তুলনায় আলাদা। এখানে অন্তত একজন (নিমচাঁদ) মদ্যপানকে ব্যঙ্গ করে। চতুর্থত, কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিল্পকলার দৃষ্টিতে নাট্যকার দুজনকে আরো একবার সামান্য মাত্রায় মদ্যপানের অধিকার দিলেন। মাতালের কাণ্ড-কারখানার জন্য রামধনের প্রহার এবং সে প্রহারে একদিনেই মদসেবন ত্যাগ করা (সেখানে বলা হয়েছে, মদ ছাড়তে চাইলেও ছাড়া যায় না) নিতান্তই স্থূল। নীতিসর্বস্ব একটি নাটকে পরিগণিত হত, রসের গভীরতা অব্যক্ত থাকত। দুজনের সংস্কার যেমন একদিনে অপরিত্যাজ্য, তেমনি নাট্যকার তীক্ষ্ণ আভাসে

অন্যদিনের তুলনায় সেদিনের মদসেবনের ভিন্নতা প্রদর্শন করে চরিত্রগত পরিবর্তন ও কাহিনিগত বির্বতনকে মেলে ধরেছেন।

## ৬.৫ সধবার একাদশী : নাটক বিচার

'সধবার একাদশী ' নাটকের প্রারম্ভ থেকেই দীনবন্ধু তাঁর পরিকল্পনার সূক্ষ্মতা ও সমগ্রতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পরিকল্পনাটির পেছনে যে বোধটি সর্বাধিক কার্যকারী হয়েছে, তা হল একটি অখণ্ডতা ও সমগ্রতার বোধ। 'সধবার একাদশী'র মধ্যে কোনো জটিল, রহস্যময় কাহিনি নেই। কোনো আকস্মিক ঘটনা সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসও দেখা যায়নি। ঘটনার বিক্ষিপ্ততা নেই বলে বইটির নাটকীয় রস জমাট হয়ে উঠতে পেরেছে। সংলাপের চমৎকারিত্বের জন্য কাহিনি সর্বত্র সরস ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'সধবার একাদশী'র শ্রেষ্ঠগুণ — এর একান্ত বাস্তব ও অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় কথাবার্তা। নাটকের প্রধান অবলম্বন নাটকের কথোপকথন। এর মধ্য দিয়ে নাট্যকারকে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয় ও ঘটনার চলমানতা বিধান করতে হয়। যে স্থানে যে কথাটির ব্যবহার করা উচিত, ঠিক সেই কথাটির অভাবে নাট্যরস ব্যহত হয়। এই কথা-ব্যবহারে দীনবন্ধুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। নিমচাঁদের প্রতিটি শ্লেষাত্মক কথা প্রতিটি witty বাক্য পাঠক দর্শকের মন আনন্দে উদ্বেলিত করে রাখে। ঘটিরাম ডেপুটি রাম- মাণিক্য, অটল, ভোলা, কাঞ্চন — প্রত্যেকের কথা তাদের চরিত্র বিকাশে অভ্রান্তভাবে সাহায্য করেছে। দীনবন্ধু কথাকে আবরণ দিয়ে তার মান রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হননি, সেজন্য অশ্লীল ভাষিণী বারবাণিতা, মদ্যপ মাতাল, বখাটে আদুরে দুলাল প্রভৃতির মুখ দিয়ে সমাজের ভব্যতা ও শালীনতার মুখোশ খসে পড়েছে। এই কারণে অনেক রুচিবিলাসী সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকের অশ্লীলতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। রামগতি ন্যায় রত্ন মহাশয় ('বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য') ও ড° প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা (Origin & Development of Bengali Drama) নাট্যকারকে অনেক সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু কথা হল যে, দীনবন্ধু যে সব চরিত্র বর্ণনা করেছেন, তাদের মুখ দিয়ে ভব্য ও ভদ্র কথা বলালে তা শোভন হত বটে, কিন্তু নাটকের পক্ষে তা নিতান্ত অস্বাভাবিক হত, এটাও সত্য। এখানে উল্লেখ্য যে শেক্সপিয়রের ইয়াগো-ফলসটাফও কি খুব শালীন ভাষায় কথা বলত? প্রহসনখানির মধ্যে অদ্ভুত এক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। যেখানে মোগলবেশী অটলবিহারী ও তার কুমুদিনী হরণ বৃতান্তের মধ্যে হাস্যরস সশব্দ আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে।

নীতি, সততা ও আদর্শের প্রতি দীনবন্ধু শ্রদ্ধাবান ছিলেন তবুও জীবনের ভালোমন্দ দুদিক তিনি সমকরুণা দৃষ্টিতে দেখেছেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মত তিনিও ভেবেছেন —

"I am not the poet of goodness only,
I do not decline to be the poet of wickedness also."
(Song of myself – Leaves of grass by Walt Whitman)

সেজন্য তাঁর চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত থেকেই তাদের জীবনের করুণ ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে আমাদের মনকে অভিভূত করেছে। অনবরত হাস্যকৌতুকের মাঝেও করুণ ফল্গুধারা সমস্ত নাটকটিকে সিক্ত করে রেখেছে।

'সধবার একাদশী' বাংলার দুর্বল নাট্য সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ জীবন্ত সংযোজন, এতে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র শেক্সপিয়রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে আধুনিক ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মুকুটমণি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

'সধবার একাদশী'র সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক ও শিক্ষক উৎপল দত্তের 'আশার ছলান ভুলি' গ্রন্থের (পৃ: ২১৭) মূল্যবান উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা গেল — " 'সধবার একাদশী'ও 'নীলদর্পণে'র প্রতিবাদটাকেই অন্য শ্রেণীর পরিবেশে বিকাশিত করেছে, তাই এর বিদ্রোহ একাধারে বিষয়বস্তু ও আঙ্কিক দুই এলাকাতেই।" পরিশেষে বলা যায়, 'সধবার একাদশী' বাংলা ভাষায় রচিত একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে চিরদিন বিবেচেতি হবে।

## ৬.৬ সধবার একাদশী : নামকরণ

'সধবার একাদশী' নামকরণের নেপথ্য দীনবন্ধু মিত্রের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নামকরণটির পেছনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির ছায়া রয়েছে। নাটকের শেষ গানে এর একটি আভাস রয়েছে। 'সধবার একাদশী'তে সেরকম হয়েছে— অটলের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপকে লক্ষ্য করে। নিমচাঁদের কথিত ছড়ার একটি ছত্র দিয়ে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে।

দীনবন্ধুর অনেক রচনায় বিধবার দুঃখ-যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ এখানে তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। 'নীলদর্পণে' নীলকরদের অত্যাচার যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি নারীর ওপর পুরুষের এবং সামাজিক প্রথার অত্যাচারও এখানে তিনি লক্ষ করেছেন। নারীর প্রতি তাঁর প্রীতি, মমতা ও সহানুভূতি এখানে প্রকাশিত।

নামকরণটির মধ্যে রয়েছে সধবার বৈধব্য মানের স্বামীর মৃত্যু। অতএব মৃত্যুর প্রসঙ্গ নাটকটিতে এসেছে বারবার আর এই মৃত্যু ছাড়াই পারিবারিক ও গৃহজীবনের সুখ-শান্তি কিভাবে ব্যাহত হয়ে যায়। সেটাও নাটকে লক্ষ করা যায়। এদেশে সধবারা একাদশী পালন করে না, বিধবারা করে। এর অর্থ হল সধবা হয়েও যে মনে-প্রাণে নিজেকে বিধবা ভেবে একাদশী ব্রত পালন করে। এয়োতির চিহ্ন শুধু যেন বেদনার উপকরণ। নাটকের মূল উদ্দেশ্য সুরাপান নিবারণ বা মদ্যপান যে সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক, তা দেখানো। সমাজ যে কতটা বিষাক্ত নোংরা হয়ে উঠতে পারে, তা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। মদ্যপানে নারীর যন্ত্রণাকে মুখ্য করার মূলে আছে মধুসূদন দত্তের অনুপ্রেরণা। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে ইয়ংবেঙ্গলরা বিপথগামী হয়েছে। সেজন্য নবকুমারের স্ত্রী বৈধব্য কামনা করে। উনিশ

শতকে নবজাগরণের ফলে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার যে জোয়ার এসেছিল, এ তারই ফল। একইভাবে দীনবন্ধুও দেখিয়েছেন নারী জন্মের ব্যর্থতা, যার জন্য দায়ী মদ্যপায়ী পুরুষ। এই নাটকে তিনজোড়া দম্পতির সম্মুখীন হতে হয়, যারা খুব অসুখী। যাদের দাম্পত্যজীবন ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। নিমচাঁদ, অটল ও রামমাণিক্য তাদের স্ত্রীর জীবন যন্ত্রনাদায়ক করে তুলেছে। সধবা হয়েও তারা বিধবা নারীর মতোই স্বামী সঙ্গ সুখ বঞ্চিতা।

ঘরে সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান তবুও নিমচাঁদ ঘরে থাকে না, অটল তাকে বলে, "তোর মেগের কাছে যা।" সে যায় না। বরং স্ত্রী-প্রসঙ্গে নিমচাঁদ বলে, "Thou sticketh a dagger in me"। অন্যদিকে পতিব্রতা স্ত্রী ছেড়ে অটল রক্ষিতা পোষণে ব্যস্ত। সেজন্য তার স্ত্রী কুমুদিনীর অনন্ত দুঃখ। দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেই পাওয়া যায় কুমদিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন। সেখানে কুমুদিনীর ভাষ্য "আমি গলায় দাড়ি দে মরবো"। স্বামী থেকেও তো না থাকর মতোই। এজন্য হিন্দু সাধ্বী স্ত্রী হয়েছে দুঃখযন্ত্রণাপীড়িতা সে বলতে পারে, "এক মরে যায় জানলুম আপদ গেল।" এর চেয়ে বৈধব্য হয়তো বেশি যন্ত্রণার নয়। আবার বাঙ্গাল রামমাণিক্য তৎকালীন সমাজের আভিজাত্যের প্রতীক মদ ও মেয়ে-মানুষের আসক্ত হয়েও 'কলকাতাইয়া' হতে অপারগ, তার স্ত্রী ভাগ্যধরী কিন্তু সতী-সাধ্বী। ভাগ্যধরী কোনোদিন ব্যাভিচারী হবে না, পরপুরুষে আকর্ষিত হবে না অথচ সে নিজে ভ্রষ্টাচারী, ব্যাভিচারী। অটল তাকে মারলে, সে বলে, "হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেলচে, বাগ্যদরীরে রারী কর্‌চে" এবং সে কিভাবে একাদশী করবে ভেবে ব্যাকুল হয়েছে।

সামাজিক দৃষ্টিতে বলতে হয়, 'সধবার একাদশী'তে যেন গোটা সমাজের পচন তিনি লক্ষ করেছেন। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি যুবসম্প্রদায়ের জন্য অভিশাপস্বরূপ। সভ্যতার এই গ্লানিকর আস্থা সধবা নারীর একাদশী পালনের মতো যন্ত্রণাময়। নাটকের শেষে প্রহৃত নিমচাঁদকে অটল বাগানের মধ্যে মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানালে সে উঠে বসে। পূর্ণ উদ্যমে বলে — "মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার। মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি, সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।" বোঝা যাচ্ছে এখানে মদই মৃতসঞ্জীবনী মাতালের জন্য। আসল কথা, ফের মদ খেতে বাগানে চলে যাওয়ার একটি বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। অটলের বৈঠকখানা থেকে বাগান গমনের উদ্দেশ্য হল, প্রকাশ্যে মদ্যপানে তারা বিরত থাকল। মদ্যপানকে ঔষধরূপে বিবেচনা করল, যার পানের জেরে হয়তো শারীরিক ব্যথা বেদনায় কিছু উপশম ঘটতে পারে।

সমাজকে পচিয়ে ফেলার জন্য সদ্যাসক্তি যথেষ্ট। এর প্রভাবে নষ্ট হয় ব্যক্তি ও সমাজ চরিত্র। তাই যে মদ 'পতি' সে সধবার সতীন শুধু নয়, সর্বনাশও ঘটে। তার জন্যই স্ত্রীকে মরণ বরণ করতে হয় এবং পতির অমঙ্গল তথা মৃত্যুকামনা করতে হয়। তৎকালীন সমাজের ও পরিবার জীবনের চরম যন্ত্রণা ও তীব্রসংকট এই নাটকে ও নামকরণে শ্লেষাত্মাক হয়ে উঠেছে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই নাটকটির এ-ধরনের নামকরণ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

## ৬.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'সধবার একাদশী' নাটকের কাহিনি বিন্যাস বিচার করলে দেখা যায় যে কোনো সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কাহিনির ধারা এখানে নেই। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন কাহিনির অস্পষ্ট ধারাগুলোর মধ্যে একটি unity of impression কে অন্বেষণ করা যায়। নাটকের বড় ঘটনা দুটি নাটকের মূল চরিত্রের সঙ্গে জড়িত। যখন দুটি ঘটনাকে নাট্যকার এক বিন্দুতে এনে মেলাতে পেরেছেন, তখনই নাটকের গঠনের সঙ্গে এদের যোগ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং এর মধ্যেই ঘটনা-সংস্থাপনে নাট্যকারের কৌশল নিহিত রয়েছে। নাট্যকার climax বা সর্বোন্নয়নে রয়েছে নিমচাঁদের আত্মজাগরণ বা দু'জনের (নিমচাঁদ ও অটল) নবজন্ম ঘটা, নাট্য পরিণতিতে দুজনের পুনরায় মদ্যপান কিন্তু ব্যঞ্জনাময়, দুজনের সংস্কার একদিনেই যেমন অপরিত্যাজ্য, তেমনি নাট্যকার সূক্ষ্ম আভাসে অন্যদিনের তুলনায় আজকের পুনশ্চ মদ্যপানের পার্থক্য প্রদর্শন করে চরিত্রগত পরিবর্তন ও কাহিনিগত বির্বতনকে প্রকাশ করেছেন এবং এখানেই নাটকটির সার্থকতা, নীতি ও সততার প্রতি আস্থাবান অথচ প্রখর বাস্তববাদী দীনবন্ধু মিত্র তার সমকালীন ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়েই নাটকটিকে সৃষ্টি করেছেন। 'সধবার একাদশী' নামকরণটিও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময়, তখনকার সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, হিন্দুধর্মের গোড়াঁমি, কু-সংস্কার ইত্যাদির মূলে কুঠারঘাত করেছেন নবজাগরণের শিক্ষায় আলোকিত দীনবন্ধু মিত্র।

## ৬.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ৬.৯ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ- ৭

# সধবার একাদশী

## সধবার একাদশী : চরিত্র বিচার ও হাস্যরস

**বিষয় বিন্যাস**


৭.০ ভূমিকা (Introduction)

৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৭.২ চরিত্রমালা : প্রধান চরিত্র

৭.২.১ নিমচাঁদ

৭.২.২ অটল

৭.৩ চরিত্রমালা : অপ্রধান চরিত্র

৭.৩.১ গৌণ পুরুষ চরিত্র

৭.৩.২ 'সধবার একাদশী' নাটকে নারী চরিত্র

৭.৪ হাস্যরস

৭.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৭.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৭.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৭.০ ভূমিকা (Introduction)

'সধবার একাদশী' নাটকটির প্রধান বা মুখ্য চরিত্র দুইটি - নিমচাঁদ ও অটল। নিমচাঁদকেই নাটকটির নায়ক বলা যেতে পারে। অটল নিমচাঁদের বন্ধু, যেন নিমচাঁদেরই আরেক রূপ, বলা যেতে পারে দুজনের চরিত্রগত বিবর্তনের বিচারে তারা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই দুটি মুখ্য চরিত্র এবং অন্যান্য গৌণ পুরুষ চরিত্রগুলো যেমন নকুলেশ্বর, ভোলাচাঁদ, কেনারাম ও রামমাণিক্য এদের নিয়েই নাটকটি সমগ্রতা পেয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে নারী চরিত্র যেমন কাঞ্চনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঞ্চন, সৌদামিনী, কুমুদিনীর মতো চরিত্রগুলোও এ-নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া এ-বিভাগে সংযোজিত হয়েছে নাটকের সংলাপ ও হাস্যরসের আলোচনা এবং পরিশেষে রয়েছে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ও সমাজচিত্রের বিশ্লেষণ।

### ৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যা আপনাদের সাহায্য করবে —

- নাটকটির প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রদের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে।
- হাস্যরসের বিচারে নাটকটিকে অনুধাবন করতে।

## ৭.২ সধবার একাদশী : চরিত্র বিচার

এবার 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ ও অটলকে নিয়ে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

### ৭.২.১ নিমচাঁদ

'সধবার একাদশী' নাটকের প্রধান দুই চরিত্র হল নিমচাঁদ আর অটল। দুজনের মধ্যে নিমচাঁদকেই নায়ক চরিত্র হিসেবে ধরা যেতে পারে। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়র, 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৮৭১-৭২) ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত পত্রিকাতেই 'সধবার একাদশী' নামের একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ক্ষেত্রনাথই সর্বপ্রথম তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে, 'নায়ক বিপর্যয়' নামে অংশটিতে প্রশ্ন তোলেন : " 'সধবার একাদশী' নাটকে নায়কের বিপর্যয় ঘটেছে; অটলের বদলে নিমচাঁদ নায়ক হয়ে গেছে (তিনি বলেছেন, যেমন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ইন্দ্রজিতের বদলে রাবণ নায়ক হয়ে গেছেন; এবং ফলে নাটকের তাৎপর্যই পাল্টে গেছে।)"

কিন্তু নিমচাঁদকে অটলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করলেই এই নাটকের তাৎপর্য সূক্ষ্মতর, গঠনভঙ্গি নিবিড়তর হয়ে ওঠে। নিমচাঁদ চরিত্রের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার সংমিশ্রণের জন্যই (যার ফলে চরিত্রটির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যজ্ঞানের পরিচয় মেলে) চরিত্রটি খাঁটি ট্র্যাজিক বা লঘু কমেডি হয়নি, হয়েছে সিরিওকামিক একটি জটিল চরিত্র। নিমচাঁদের চরিত্রের মধ্যে এই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য লক্ষ করেই ক্ষেত্রনাথ আরো একটি মন্তব্য করেন — "দোষ গুণে জড়িত এই প্রকার পাত্রই নাটকের উপযোগী।"

তখন নবজাগরণের প্রভাবে, পাশ্চাত্য নাটক, বিশেষত শেক্সপিরীয় নাটকের রুচি গ্রহণ করার দরুন, যাঁদের সাহিত্যবোধ সূক্ষ্মতর হয়েছিল, তাঁরা দোষে-গুণ সম্পূর্ণ বাস্তব মানুষকেই নাটকের মধ্যে দেখতে ও দেখাতে চাইতেন।

কারোও মতে নিমচাঁদের জীবনে উচ্চাদর্শ বলতে কিছু ছিল না। এজন্য তার মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিক চরিত্রের সম্ভাবনা ছিল, তা অঙ্কুরিত হয়নি। নিমচাঁদ ট্র্যাজিক চরিত্রত নয়, কারণ নিজের অধঃপতিত জীবন সম্পর্কে নিমচাঁদ সদা-সতর্ক ও বেশি মাত্রায় সচেতন। এখানে উচ্চাদর্শ বলতে বোঝায় যা তার নিজের অধঃপতিত জীবন সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেয় এবং একটি পরিশুদ্ধ ও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্য আশাকে মনে জাগিয়ে রাখে। সুতরাং বিশুদ্ধ ও সুস্থ জীবনের এই উচ্চাদর্শের সচেতনতাই তাকে ট্রাজিক হতে দিল না। এই উচ্চাদর্শের সজাগতা থাকার জন্য আশাবাদ ও কিছু মূল্যবোধ তার মধ্য কাজ করে গেছে। নাটকের পরিণতিতে অটলের পারিবারিক scandal-কে যেভাবে

সে রামধনের সঙ্গে মিমাংসা করে নিতে বলেছে, তার চেয়ে বড় সামাজিক বিচক্ষণতা ও উচ্চাদর্শ খুব কমই আছে। এসব কারণেই হয়তো নিমচাঁদ 'সিরিও-কমিক' চরিত্রে রূপে প্রকাশিত।

প্রতিভা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিমচাঁদের দুর্দশার জন্য অনেকে তার ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনকে দায়ী করেছেন এবং সেই ব্যর্থতার বিস্মরণের জন্যই অটলের ও নকুলের টেবিলে তার মদ্যপান। নিমচাঁদের ব্যর্থতা কেবল ঘরের নয়, ঘর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেরই। আবার, দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার জন্য অন্তত তার স্ত্রী যে দায়ী নয় তার জবাবে নিমচাঁদ নিজেই বলেছে — "সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই; রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না ..." (৩/২)। নিমচাঁদের ব্যর্থতা নৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে; তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে তার দাম্পত্যজীবনে, তার উক্তি প্রণিধানযোগ্য — "কলকাতার লোকে গুণ দেখে না; কেবল বিষয় খোঁজে" (৩/১)। নিমচাঁদ নিজে "সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্র"। সম্ভবত, তার এই 'বিষয়হীনতা'র জন্যেই রূপ-গুণ সমন্বিতা, সর্বগুণ ভূষিতা উপযুক্ত পাত্রী বা স্ত্রী জোটনি, যদিও সেই স্ত্রীর প্রতি সে দোষারোপ করেনি। তবে, গোকুলের আধুনিকা স্ত্রীকে দেখে মন্তব্য করে — "এ রত্ন আমার পড়লে, রাইট ম্যান ইন্ দি রাইট প্লেস্ হতো।" (৩/৩)

বিভিন্ন সমালোচক নিমচাঁদকে নানা দিশি-বিদিশি চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ড০ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ('সমালোচনা সাহিত্য', ৫ ম সংস্করণ, ১৯৪৯। 'গ্রন্থ পরিচিত' অংশে) : নিমে দত্ত শেক্সপিয়রের ফলস্টাফের মতো; "সে কেবল ব্যক্তি বিশেষ মাত্র নয়; এক সমগ্র যুগের শীল-বৈশিষ্ট্য, একটি বৃহৎ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য তাহার মধ্যে সংহত হইয়াছে।" দু-পর্বে সম্পূর্ণ 'কিং হেনরি দি ফোর্থ', নাটকের ফলস্টাফ চরিত্র এক বিশ্বখ্যাত চরিত্র। বাঙালির কাছে প্রিয় এই চরিত্রটির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। ফলস্টাফের মতোই নিমচাঁদ একটি যুগের বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গে ধারণ করে আছে।

ড° শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, প্রথম খণ্ড) বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দেবেন্দ্রনাথ চরিত্রের সঙ্গে নিমচাঁদের তুলনা করেছেন।

ড° অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস' বইতে তিনি শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের জীবানন্দ চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন।

আমাদের অনুমানে যেন, স্বয়ং দীনবন্ধু ও নিমচাঁদ — এই দুই চরিত্রকে মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত চক্রবর্তী চরিত্র চিত্রিত করেছেন। কমলাকান্তের মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও গৃহসুখের জন্য কামনা, শেক্সপিয়র-মনস্কতা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সূক্ষ্মতার সঙ্গে কোথাও কোথাও সামান্য স্থূলতা (দ্র: 'আমার মন'), নেশা (আফিং। দীনবন্ধু শেষ হয়েছে আফিং ধরেছিলেন) — সবই নিমচাঁদে প্রাপ্ত। নিমচাঁদের মতোই কমলাকান্ত আশাসহ নৈরাশ্যপীড়িত, বিষাদগ্রস্ত। নিমচাঁদ ও কমলাকান্ত যেন এক-একটি যুগের প্রতীক। দুজনেই লালায়িত

গার্হস্থ্য জীবনের জন্য। নিমচাঁদের মতোই কমলাকান্তের সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও ব্যাপকতা অনেক বেশি। নিমচাঁদের মধ্যেও আমরা বাঙাল ভাষার প্রতি ভালবাসা লক্ষ করি। কেনারামকে তাই সে বলেছে : "কেন আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হয়েছ, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো?" (৩/১)

নিমচাঁদ চরিত্রের একটি ক্রমবিকাশ ও পরিণতি রয়েছে। তার মধ্যে আছে নিরপেক্ষতা, বিবেচনা করার সামর্থ্য। সে অন্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সমালোচনা করে গেছে। সে খুব স্পষ্ট বক্তা। নিজের জিহ্বাকে লক্ষ্য করে নিজেই মন্তব্য করেছে : "তুমি বাপু অনেক মনস্তাপের কারণ। এক এক সময় এমন তপ্ত ফ্যান নিসৃত কর, লোকের অন্তঃকরণের এক পুরু চামড়া উঠে যায়।" (৩/৩)। তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও অসাধারণ। প্রচণ্ড তৎপরতার সঙ্গে ধারালো ঝাঁঝালো উত্তর তার মুখ থেকে খসে। সংক্ষিপ্ত উত্তর, তবে তীব্র। হাসির সঙ্গে কান্না থাকায় সে যেন চিরকালীন মানুষ। সে মদ্যপ হলেও ব্যক্তিত্ববিহীন নয়। যখনই সে যেখানে উপস্থিত থাকে, সবার মধ্যে সে আকর্ষক, সম্মোহক। ক্রোধে উন্মত হয় সে সঙ্গত কারণেই, আবার নিজের বোধ-বিবেক-বিচারকে জাগ্রত করে সেই ক্রোধকে দমন করতেও সে সক্ষম। তার বাচন-ভঙ্গি যেমন আকর্ষণীয়, স্মৃতিশক্তিও তেমনি প্রখর। তার কৌতুকবোধ অতুলনীয়।

নিমচাঁদ মদ্যাপ তবে চরিত্রহীন লম্পট নয়, উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী হয়েও সে মদের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার সুরাপানে সে বেসামাল হয়ে পড়লেও শিক্ষা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সে মাতলামির ঝোঁকেও সদা সচেতন। কিন্তু সেই ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণের দিকটি সে কাজে লাগাতে পারেনি — মদ্যাসক্তির দোষে তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়েছে। তার সেই হতাশা, পরাজিত চরিত্রের আত্মহানি ও মনোবেদনা হাস্য পরিহাস-কৌতুক-রঙ্গব্যঙ্গ-ভাঁড়ামি যেন তার ব্যর্থ জীবনকে ঢাকা দেবার কৌশল। তার উত্তরোল হাস্য পরিহাসের মধ্যেও অন্তরের চাপাকান্না গোপন থাকেনি। এ-প্রহসন নাটক হয়ে উঠেছে, এর চরিত্র 'ক্যারিকেচার' ছাড়িয়ে যথার্থ নাটকীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সমালোচক ও ভাষাবিদ ড° সুকুমার সেন বলেছেন — "শুধু নিমচাঁদের ভূমিকার জন্য সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সধবার একাদশী বাঙ্গালার দুই - চারিখানি শ্রেষ্ঠ নাট্যগ্রন্থের অন্যতম বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইবে।" সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "শুধু এই মানুষের জন্য সধবার একাদশীর সবশিল্পচ্যুতি ভুলে থাকা যায়।"

### ৭.২.২ অটল

অটল হল নিমচাঁদের বন্ধু, জীবনচন্দ্রের পুত্র। 'আলালের ঘরের দুলাল' বলে আখ্যায়িত করা যায় তাকে। এই জাতীয় চরিত্রের সব ধরনের বিশেষত্ব তার অঙ্গে-অঙ্গে জড়ানো। সে হল সঠিক অর্থে কলকাতার 'বাবু কালচারে'র প্রতীক ও প্রতিনিধি। সে স্কুলে Baboo's ক্লাসে পড়েছে। তার স্ত্রী কুমুদিনীর কথায় প্রকাশ — "কিসে লোকে বাবু বলবে, কেবল তাই দেখে।" বাবুগিরি করতে গিয়ে সে মদ ধরেছে, বেশ্যা রেখেছে। তিনশ টাকা মাসোহারা দিয়ে সে যুগের কালচার বজায় রাখতে চায়। নিমচাঁদ ও অটলের

কথোপকথনে তা জানা যায়।

নিম। 'কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছে?'

তাই। 'বেটি তিন-শ টাকা মাসয়ারা চায়।' (১/১)

বাড়িতে পতিব্রতা স্ত্রী কুমুদিনী থাকলেও যুগের আভিজাত্যের ফাঁদে সে বেশ্যাসক্ত হয়েছে। নিমচাঁদ যার নাম রেখেছে 'বাব্বী'।

অটল নিয়ন্ত্রণহীন। তার মূরতা, নিলর্জ্জতা, উচ্ছৃঙ্খলতা সবই যথাযথ ও বাস্তব। নিমচাঁদের উক্তিতে —

"তুই ব্যাটা পাজির বাড়ী, তখন পিতৃআজ্ঞা লঙঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি — তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।" (১/১)

মদের নেশায় অটল ন্যায় অন্যায় জ্ঞানও হারিয়েছে। স্ফূর্তির জন্য গোকুলবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ খুড় শাশুড়িকে ঘর থেকে বের করে আনার পরিকল্পনা করেছে। হিজড়েরা ভুলে তার স্ত্রী কুমুদিনীকে ধরে আনলে তার ভাবান্তর আসে। অটল বলে — "মদ খেতে শিখে আমার এই সর্বনাশ হল। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিনকতক কাশী যাই।" দীনবন্ধুর উদারতা ও মানবিকতার জন্য অটল চরিত্রের মধ্যেও কিছু শুভসঙ্কেতের সন্ধান পাওয়া যায়। অটলের মধ্যেও যে কখনো প্রেম-অভিমান-লজ্জাবোধ আসতে পারে। তা দেখিয়েছেন বলেই চরিত্রটি নিতান্ত পাষণ্ড হয়ে পড়েনি।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ওই সময়ের কলকাতায় নবীন যুবকদের যে বিশেষত্বগুলির খবর পাওয়া যায়, তার আলোকে ও নাটকের নিজস্ব পটভূমিকায় বিচার করলে অটলকে যথাযথই মনে হবে। নিজস্ব কার্যকলাপ ও মানবিকতাহীন ব্যবহারের জন্য সে সবার ধিক্কারের পাত্র হয়েছে। তবে অটল যেন নিমচাঁদেরই অন্য পিঠ, তবে কিছু ভিন্নতাও তার মধ্যে বর্তমান।

প্রথম অঙ্কে নিমচাঁদ অটলকে মদ্যপানের প্রতি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু অটল তখন প্রতিজ্ঞায় 'অটল', মদ্যপানে আসক্তি নেই, অটল-নিমচাঁদ এখানে পৃথক। দ্বিতীয় অঙ্কে অটল-নিমচাঁদ কাছাকাছি এসেছে। তৃতীয় অঙ্কে নতুন পরণতি লাভ হয়েছে, দুজনের মিলনে। অটল নিতান্তই দুশ্চরিত্র, মদ্যপ, তার মধ্যে যদি কিছু ভালত্ব থাকে, তা নিমচাঁদরূপে প্রদর্শিত। অটলের ভবিষ্যৎ শুভবুদ্ধির প্রতীক নিমচাঁদ। তেমনি অটলের মধ্যে যে কু-প্রবৃত্তি আছে, চিৎপুর রোডের প্রকাশ্য পথে নিমচাঁদের মাতলামির মধ্যে তা প্রকাশিত। অটল ও নিমচাঁদ প্রবৃত্তিতে খুব কাছাকাছি, আরও লক্ষণীয় একজন যখন প্রস্তাব করে, তখন অপরজন তার বিরোধিতা করে। অটলের ক্রিয়াকাণ্ডকে শালীনতা, মূল্যবোধ ও নীতিবোধের জন্য নিমচাঁদ তা সমর্থন করেনি। দুজনের অভিন্নত্বের অন্য একটি প্রমাণ তৃতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অটল ও নিমচাঁদ যে যুগ্ম চরিত্র, এসব থেকে বোঝা যায়।

অটল-নিমচাঁদ দুজনেই দুজনের নিন্দা-সমালোচনা করেছে, নিমচাঁদ যেমন অটলের

বিরুদ্ধে মদে আসক্ত হবার ষড়যন্ত্র করে (১/১), অটলও তেমনি নিমচাঁদের বিরুদ্ধে ('কি বাবা ঘটিরাম Consipiracy কচ্চো'), এর মধ্যে ছিছ (২/২)। দুজনেই দুজনের স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে বলেছে। কেনারামের কাছে অটল বলে, সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নিমচাঁদ 'বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়' (২/২); নিমচাঁদ তেমনি 'হ্যামলেট' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিতৃঘাতক খুড়ো ক্লাডিয়াস-এর উদ্দেশ্যে হ্যামলেটের উক্তি করে বলে, সে দয়াহীন রক্তাপিপাসু, কামুক।

"Bloody bawdy villain!

Remorseless, tgreacherous, leacherous, kindless villianin!"

এভাবে বিচার করলে দেখা যায়, দীনবন্ধু এই দুটি চরিত্রের মধ্যে একটি নিগূঢ় যোগ প্রদর্শন করেছেন। দুজনেই দুজনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং দুজনের অভিন্নত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

আবার দুজনের মধ্যে ভিন্নতায় একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অটলের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল, নিমচাঁদ একাধিকবার 'প্যারাডাইস লস্ট' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তা ব্যক্ত করেছে। দেখা যায়, 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যের প্রথম কটি সর্গই (প্রথম চারটি) দীনবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর কারণও ছিল। শয়তান স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ন'দিন ন'রাত্রি জলন্ত হ্রদের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন তার গ্লানি-কষ্ট-যন্ত্রণা যেরকম তীব্র হয়ে উঠেছিল, দীনবন্ধু অটলের মধ্যে তা-ই প্রদর্শন করেছেন, নিমচাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ এখানে নিমচাঁদ-অটল পৃথক চরিত্রে পরিণত হয়ে গেল।

শয়তানের বেশেই যেন নিমচাঁদ অটলকে মদ্যাসক্তির গভীর অতলে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। নিমচাঁদের শেষ উক্তির (প্যা.ল. দ্বিতীয় সর্গ, পং ৮১৮-৮২১) মধ্যে অটলের পরিবর্তন নাট্যকার স্পষ্ট নির্দেশ করে দিয়েছেন। অটল ও নিমচাঁদ দুজনেই তাদের পরিবর্তনের কথা স্বমুখে ব্যক্ত করেছে। নিমচাঁদ বলে "তোর মতো অধমাত্মা পামরের আর আলাপ করবো না।" সব চরিত্রগুলো বিশেষত নিমচাঁদ ও অটল সুস্থতার দিকে পরিবর্তিত হয়েছে।

তবে শেষ দৃশ্যে শিল্পকলার দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেই দীনবন্ধু দুজনকে আর একবার স্বল্প মাত্রায় মদসেবনের অধিকার দিলেন। দুজনের সংস্কার একদিনেই যেমন অপরিত্যাজ্য তেমনি নাট্যকার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় দুজনের চরিত্রগত বিবর্তনের আভাস তুলে ধরেছেন।

### ৭.৩.১ অন্যান্য গৌণ পুরুষ চরিত্র

'সধবার একাদশী' নাটকে অন্যান্য পুরুষচরিত্রগুলো নিতান্তই গৌণ। এদের টাইপ চরিত্রও বলা যেতে পারে, কারণ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যে মুন্সীয়ানায় এইসব অন্যান্য গৌণ পুরুষ চরিত্রগুলোকে 'টাইপ' চরিত্রে পরিণত করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ-

নাটকে এ-ধরনের চারটি চরিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমাণিক্য, কেনারাম ডেপুটি, নকুলেশ্বর ও ভোলা।

**রামমাণিক্য :** নাটকে রামমাণিক্য যেমন Dramatic relief এনেছে, তেমনি তার মধ্যে উনিশ শতকের বিকৃত বাবু কালচারকে পাওয়া যায়। বাঙাল ভাষার চমৎকার প্রয়োগ ঘটেছে এ-নাটকে। রামমাণিক্য তার সংলাপে যেমন হাস্যরস সৃষ্টি করেছে, তেমনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ব্যবহারে দীনবন্ধুর দক্ষতা উপভোগ করার মতো। রামমাণিক্য কলকাতার তথাকথিত বাবু কালচারের অন্ধ অনুকরণ করে। বাড়িতে সতী-সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে কলকাতার বাবু যেমন অটলদের মতো বারবণিতা বিলাসী সুরাসক্ত। কিন্তু তার দুঃখ, সে অন্ধ অনুকরণেও কিছুতেই কলকাতার অভিজাত বাবুদের মতো হতে পারে না। তার সখেদ উক্তি —

"পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর‍্যা মস্তক গুরাই দিচে। বাঙ্গাল কউস ক্যান্ এতো অকাদ্য কাইচি তবু ক্বলকাত্বার মত হবার পারচি না? ক্বলকাত্বার মত না করচি কি?"

ভোলাচাঁদ যখন আবার রামমাণিক্যকে খেপিয়ে বলে —

"বাঙ্গাল, পুঁটি মাচের কাঙ্গাল —

বাঙ্গাল, গঙ্গা জলের কাঙ্গাল,

বাঙ্গাল ভেঙ্গা পথের কাঙ্গাল—

বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঙ্গাল —।"

তখন রামমাণিক্য মদের নেশায় বলে ওঠে —

"পুঙ্গির পুত কেডা! হিটকাইচেন্ আর খ্যাপাইবার লাগচেন, দ্যাশে হইতো প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাটা টানে বাইর কর্‌তাম, আর অমাবস্যা দেক্‌তেন —হালা গর্ভস্রাব, হুয়ার, বল্লুক, বুত।"

রামমাণিক্য কলকাতায় এসে কলকাতার নববাবু হতে চেয়েছে, তা হতে গিয়ে স্বধর্ম ও নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। সে কলকাতার বাবুর মতো মদ্যপান, রক্ষিতারক্ষণ রীতিতে অভ্যস্ত হতে চায়, তবু সে কলকাতার বাবুর মতো হতে পারে না। তার বাঙ্গাল ভাষা প্রয়োগ ও নকল নবিশি নীতি তাকে কলকাতর বাবু হতে দেয় না। এ তার খেদ।

**কেনরাম ডেপুটি :** আরেকটি গৌণ চরিত্র হল কেনারাম ডেপুটি, যে হল বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের নবতম সংস্করণ। যাকে নিমচাঁদ ঘটিরাম ডেপুটি বলেছে। "তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটা আছে?" উচ্চপদলোভী ও খেতাবলোভী তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এখানে সকৌতুক ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে। সমাজে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের প্রতি লোভ-লালসাতে লালায়িত সুবিধাবাদী এক শ্রেণির মানুষদের তাচ্ছিল্য-অবহেলা করা হয়েছে নিমচাঁদের উক্তিতে।

কেনারাম সমাজনিন্দায় ভীত হয়ে থাকে। সে মদ-মাংস সবই খায়, অথচ হিন্দুধর্মের লোকেরা তাকে নিন্দেবাদ করবে, এই আশাংকায় সে এ-সমস্ত গোপন রাখতে চায়।

নিজের সামান্য বিদ্যা জাহির করে সে সবার তাচ্ছিল্য ও উপহাসের পাত্র হয়। সে আবার ভড়ংবাজি প্রদর্শনে অভ্যস্ত। সকালে উপাসনা করেই তবে সে অন্য কাজে হাত দেয়। নিমচাঁদ তাকে তুই, তোকারি সম্বোধন করলে, তার প্রদর্শিত আত্মসম্মানে বাঁধে —

"আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই-মুই কল্যে আমাদের মর্মান্তিক হয়।"

উপরন্তু পদলোভী কেনারাম নিমচাঁদকে পরামর্শ দেয় — "দত্তজা যদি মদ ছাড়েন, উনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারেন।" কেনারামের লুকিয়ে বেশ্যালয়েও গতিবিধি রয়েছে। অথচ লোক-সমাজে সে শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্টেটের মুখোশে ঘোরাফেরা করে।

**নকুলেশ্বর :** নকুলেশ্বর হল নিমচাঁদ ও অটলের বন্ধু। সে পেশায় উকিল কিন্তু মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত। তবে বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষ। তাই শিক্ষিত নিমচাঁদের প্রতি তার সহানুভূতি লক্ষ করা যায়।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা পাই নকুলেশ্বরের বাড়ি। কুকেঁড়গাছায়, নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈঠকখানায় মদ ও মদ-নিবারণী সভার ব্যঙ্গ-আলোচনায় নকুলেশ্বর ও নিমচাঁদ ব্যপ্ত হয়ে থাকে। দুজনে মদের আসরে আকণ্ঠ মদ্যপান করে। মদের গুণগানে লিপ্ত হয়ে যায়। "নকু (মদ পান করিয়া) — 'আমি ত কাজের বার হইতি- আমার জন্যে বলি না — দেশের মঙ্গলের জন্য বলি—।"

আবার অটলকে মদ্যপানের জন্য জোরাজুরিও লক্ষণীয় — "নকু — খাও, একটু খেতে দোষ কি? তুমি ত আর মাতাল হচ্চো না। মড্‌রেটলি খাওয়ায় কোন অপকার করে না — আমোদ করা বই ও নয় —।"

সম্পূর্ণ নাটকটিতে নকুলেশ্বরের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে তাতে শিক্ষিত কিন্তু মদ্যপ, বাবু কালচারের আর এক প্রতিনিধি রূপেই দেখতে পাই।

**ভোলাচাঁদ :** ভোলাচাঁদ হল মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই, যাকে নিমচাঁদ ব্যঙ্গ বলেছে কূর্ম্ম অবতার। সেও পানাসক্ত তবে তার চরিত্রে রয়েছে কৌতুক উৎপাদনকারী উপাদান, বাংলা ভাষাকে আক্ষরিকভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করার হাস্যকর প্রয়াস। অর্থাৎ যেভাবেই হোক, দু-চার কথা ইংরেজিতে বলে কলকাতার ভদ্র শিক্ষিত সমাজে একটু কল্‌কে পাওয়া বা ইংরেজ বাবুদের সামনে নিজের বিজ্ঞতা জাহির করা। উপভোগ করার মতো ইংরেজি সে বলে — "ইউ মাই ফাদার ইন লা সার — (অটলের পদধূলি গ্রহণ), একস্‌কিউজ সার, সান ইনলা সার।" অথবা - "আই জাইন ইউ সার্ আই জাইন ইউ সার্, হোয়ের ইট গো, সার ইনলো জাইন ফাদার ইন্‌লা, আই জাইন ইউ সার্।"

তৎকালীন অল্পশিক্ষিত সামান্য ইংরেজি-জানা ব্যক্তিরা যেভাবে শিক্ষিত সমাজে নিজেদের বাহাদুরি ফলাতে চেষ্টা করত তার পরিণাম স্বরূপ তারা হাসির খোরাক হত, তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভোলাচাঁদ।

এভাবেই ক্রমে ক্রমে আমরা দেখতে পাই, রামমাণিক্য, কেনারাম ডেপুটি, নকুলেশ্বর তথা ভোলাচাঁদ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এক অনবদ্য টাইপ চরিত্র রূপে সৃষ্টি করেছেন দক্ষ নাট্যশিল্পী দীনবন্ধু মিত্র তার 'সধবার একাদশী' নাটকটিতে।

এছাড়া আরো তিনটি গৌণ পুরুষ-চরিত্র রয়েছে। জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র ও রামধন রায়।

জীবনচন্দ্র মমতাময় পিতা, পুত্রকে সুপথে এনে জীবনদান করতে চান, অতএব সার্থকনামা। তবে ব্যক্তিত্ব বড়ই সামান্য। স্ত্রীর কাছেও তিনি 'ডেকো'। পুত্রও তেমন মান্য করে না।

গোকুলচন্দ্র সুস্থমতি ব্যক্তি, একদা মদ খেতেন, আজ ছেড়েছেন। সে কথা তিনি গোপন করেন না। দীনবন্ধু জীবনচন্দ্রকে এবং তার সম্প্রদায়কে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

রামধন দুবার আবির্ভূত হয়েছেন। দুবারই রামবৎ। সুনীতি রক্ষার্থে। শেষ অঙ্কে তাকে আমরা পাই দুবন্ধুকে প্রহাররত অবস্থায়। তিনি অটলের পিতৃব্য, অটল এবং অটলের বন্ধু নিমচাঁদকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে চপেটাঘাত করেন শেষ দৃশ্যে। শুভবুদ্ধি, সুনীতি ও সদাচারের প্রতীক রূপে প্রদর্শিত হয়েছেন রামধন।

## ৭.৩.২ 'সধবার একাদশী' নাটকে নারী চরিত্র

চারটি নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন দীনবন্ধু তার 'সধবার একাদশী' নাটকে। এর মধ্যে দুটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য। কাঞ্চন ও কুমুদিনী। কাঞ্চন অটলবিহারীর রক্ষিতা, কুমদিনী অটলের স্ত্রী। এছাড়া রয়েছেন 'গিন্নী', যিনি অটলের মাতা ও জীবনচন্দ্রের স্ত্রী এবং সৌদামিনী অটলের ভগ্নী। মোটামুটিভাবে অটলকে কেন্দ্র করেই এই নারী চরিত্রগুলো আবর্তিত হয়েছে।

প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে 'কাঞ্চন' চরিত্রটি। সে বারবধূ, বারবধূর মতোই তার আচার ও আচরণ। অটলের বন্ধু নিমচাঁদকে সে সহ্য করতে পারে না এবং নিমচাঁদও তাকে নয়। কিন্তু সেই নিমচাঁদও শেষপর্যন্ত তার প্রতি সহৃদয় হয়েছে। অটলের তথাকথিত 'মৃত্যু' হলে স্বামী-সন্তানহীন কাঞ্চনের অকাল বৈধব্যের আশঙ্কায় সে মন্তব্য করে — 'পিতা! মাসী আমার অবীরে, এয়নি করে যাবেন যেন চাল ঝারতে না হয়" (৩/২)। কাঞ্চনের সংলাপও তার চরিত্রানুগ। কিন্তু দীনবন্ধু অটলের মতোই এই বারবণিতাকে পরিবর্তিত করেছেন এবং কিছু মানবিক বোধও জাগ্রত করেছেন। দেহ বিক্রি পেশা হলেও সে মানবিকতা শূন্য চরিত্র নয়। পেটের দায়ে সে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। অটলের প্রতি তার অনুরাগও রয়েছে। অটল নিয়মিত না গেলে সে অভিমান প্রকাশ করে। অটলের মাথা ধরলে গোলাপজল দেয়। বহুচারিণী হয়েও একচারিণী থাকে। বিশ্বস্ত থাকে অটলের প্রতি। বলে — "আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে। কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্য আমি ভাই এত সহ্য করি।" (৩/১)সে এই মন্তব্য করে এটলের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবসত। ঘটিরাম ডেপুটির ভণ্ডামিকে সেও সহ্য করেনি। তাই একসময় আমলাতন্ত্রের

ঠাটবাট অনুযায়ী ঘটিরাম স-আরদালি তার বাড়িতে গেলে সে ঘটিরামকে গ্রহণ করেনি। অটলের আবেগের মুখেও সে সংযত হয়ে থাকে, ভোলে না যে-সে গৃহবধূ নয়, বারবধু। অটলের মায়ের কাছে 'জীবিত' অবস্থায় সে অটলকে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। সেকালের সমাজচিত্রণে কেশ্যারূপী 'কাঞ্চন' একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাঞ্চনের চরিত্রচিত্রণে দীনবন্ধু যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাকে অনেক সমালোচক, সাহিত্যিক বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন — "আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে, কেবল অটলবিহারী নয় স্বয়ং লেখক অবধি কাঞ্চনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন।" (বাংলা সাহিত্যের নরনারী : প্রমথনাথ বিশী)।

কুমুদিনী চরিত্রের প্রতি ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' - ১ ম খণ্ডতে বেশ সমালোচনা করেছিলেন। কুমুদিনী চরিত্রের পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য নাকি অটলের অধঃপতন জীবনচন্দ্রের পরিবারে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। কুমুদিনীর কোনো গুণ নেই, তাই কোনো সমবেদনার পাত্রী সে নয়। যেহেতু নিজ মুখে নিজের বৈধব্য কামনা করেছে, অতএব সে হিন্দুনারীর সনাতন আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট। যে স্ত্রীলোকের নিজের দাম্পত্য-জীবনে সুখ-শান্তি নেই, নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে হেসে হেসে তার পরিবেশন করা খুবই অন্যায় কাজ বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু একটা বস্তু লক্ষ্যণীয় যে কুমুদিনীর কাহিনিকে নেপথ্যে রেখে তার জীবনের শোচনীয় দিকটি তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। কুমুদিনী এক হতভাগিনী নারী যার স্বামী থেকেও নেই, ননদিনী সৌদামিনীর সঙ্গে কথপোকথনে তার তীব্র দাম্পত্য-যন্ত্রণাই ফুটে উঠেছে। বিস্তৃত কাহিনি-কথনের আয়োজন এই ক্ষুদ্র নাটকে নেই, সুতরাং কুমুদিনীর বঞ্চিত জীবনের বেদনাকে পরোক্ষে ব্যক্ত করা হয়েছে। তা আমাদের সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সৌদামিনীর সঙ্গে বাক্যালাপে নাট্যকার সে ইতিহাস ব্যক্ত করিয়েছেন। কুমুদিনী ক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে তার মনের যন্ত্রণা সৌদামিনীর কাছে —

"এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল — আমি ভাই আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়ি দে মর্‌বো।" (২/১)

সৌদামিনী যখন তাকে বলে যে তাদের মা কাঞ্চনকে অনুরোধ করেছে গোপালরূপী অটলকে যাতে ছেড়ে না যায়, তখন সরোষে কুমুদিনী প্রত্যুত্তর করে —

"অমন গোপালকে নুন খাইয়ে মাত্তে হয়।" (২/১) সুতরাং দেখা যায় যে সুন্দরী এবং স্ত্রী হবার সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে অন্যায্যভাবে স্বামী-সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা। তার এই বঞ্চনা-যন্ত্রনা ক্ষোভে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতিবাদী নারীর বৈশিষ্ট্যও কখনো বা তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

অটল কুমুদিনীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ নাটকে দেখতে পাই ক্ষণেকের জন্য একবার — একেবারে শেষে, তাও ভুল করে, আকস্মিক ভাবে। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যেখানে প্রেম ও শান্তির দেখা নেই, নাটকে তাদের সাক্ষাৎকার অনুপস্থিত রেখেই নাট্যকার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কুমুদিনীর সক্রিয় হবার সুযোগ সেকালের পটভূমিকায় কমই ছিল।

অন্তিম দৃশ্যেও যখন কুমুদিনী স্বামী অটলকে রামধন কর্তৃক প্রহারে স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীলা হয়েছে, তখনও মদের নেশায় আত্মভিমানী অটল নিজের ভুল বুঝেও স্ত্রীকে দমিয়ে রাখতে দ্বিধাবোধ করেনি। অটল নিজের খুড়শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বের করে আনার যে পরিকল্পনা করেছিল, ভুলবশত তাতে নিজের স্ত্রী কুমুদিনী এসে পড়ে। কুমুদিনী স্বামীর কুকীর্তি জানতে পারলে। অটল সরোষে পত্নীর উদ্দেশ্যে ধমক দেয় —

"তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নীপনা করতে এলেন।"

দীনবন্ধু মিত্র সঠিক অর্থেই বঞ্চিতা কুমুদিনীকে চিত্রিত করেছেন, কারণ যথেষ্ট গ্লানি-অপমান-যন্ত্রণা হলেই কোনো সধবা নারী স্বামীর মৃত্যু কামনা করে নিজের বৈধব্য পালন করতে চায়।

গৌণ নারী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে সৌদামিনী, সৌদামিনী অটলের বোন, নিজে স্বামী সোহাগিনী হলেও বৌদির জন্য তার যথেষ্ট সমবেদনা আছে। মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত ভাইকে সে ঘৃণা করে। অমন স্বামী যেন কারো না হয়, সে বলতে পারে।

গিন্নী অর্থাৎ অটলের মায়ের মধ্যে অন্ধ বাৎসল্য আছে। তাই তিনি মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত পুত্র অটলের কোনো দোষেই দেখেন না। অটল তার একমাত্র পুত্র বলে তিনি অটলের খেয়ালখুশি, একগুয়েমির কাছে হার মেনে বারবণিতা কাঞ্চনকে ঘরে নিয়ে যেতে চান। অথচ বাড়িতে তার সুন্দরী পুত্রবধূ কুমুদিনী বর্তমান। এই ধরনের বিকৃত রুচি তার মাতৃত্বকে মহিমাহীন করেছে। হয়তো তার অপরিসীম স্নেহ-বাৎসল্যে ধনীঘরের একমাত্র আদরের দুলাল অটলের বিপথগামীর এক কারণ।

## ৭.৪ সধবার একাদশী : হাস্যরস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সধবার একাদশী'র স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীতে লিখেছেন, "অনেক সময়েই তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া মনে হইত। দেখা গিয়েছে যে, অনেকে 'আর হাসিতে পারি না' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে।" দিনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলো তার স্বভাবজাত পরিহাস-পটুতার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

দীনবন্ধুকে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলবার আসল অর্থ হল, তিনি তাঁর কাহিনি ঘটনা চরিত্রের পক্ষে হাস্যরসকে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য করে তুলতে পেরেছেন। এই দৃষ্টিকোণ বিচারে দেখা যায়, 'সধবার একাদশী'র আগাগোড়ায় হাস্যরস নেই, না থাকাটাই নাটকের জন্য সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয়েছে। নাটকের প্রারম্ভে এবং যে-সব দৃশ্যে চরিত্রের ভিড় বেশি, দীনবন্ধু সে ক্ষেত্রে নানা স্বাদের হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, নাটক যতই অগ্রসর হয়েছে। অটল ও নিমচাঁদের চরিত্রগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের লঘু আবহাওয়া ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়েছে, হাস্যরসও তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিলীন হয়েছে। এখানেই দীনবন্ধুর দক্ষতা।

'সধবার একাদশী' কমেডি নাটক, কিছু প্রহসনের প্রকৃতিও এতে আছে। নাটকের এই বিশেষ প্রকৃতির জন্যই হাস্যরসের যেমন অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি হাস্যরসের বৈচিত্র্যও এখানে অনস্বীকার্য।

'সধবার একাদশী'তে যে বিভিন্ন ধরনের হাস্যরসের পরিচয় পাই। তাকে মোটামুটি চারটি ধারায় সাজানো যেতে পারে : ১) দৈহিক ভঙ্গিগত; ২) বাচনগত ও ভাষাগত; ৩) পরিস্থিতি ও ঘটনাজাত; ৪) চরিত্রগত— এই চারটি ধারা একটি আর একটির সঙ্গে জড়িত ও সংপৃক্ত হয়ে আছে বলেই সমগ্র নাটকটিতে অখণ্ডতা বজায় আছে। শারীরিক ভঙ্গিগত হাস্যরস স্বাভাবিক কারণেই সূক্ষ্মতা ও গভীরতা দাবি করতে পারে না তবে তা অর্থবহ ও ইঙ্গিতময় হলে তাকে অবহেলা-উপেক্ষা করা যায় না। এ-নাটকে সেরকম কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দৈহিক ভঙ্গিগত হাস্যরস একদিকে সহজ ও লঘু কিন্তু অপরদিকে অর্থবহ বলে গভীর ভাবের দ্যোতক। দু-একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায় —

প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক — একাদিক্রমে বিশ বছর মদ্যপানের পর রামসুন্দরবাবু সম্প্রতি মদ্যপানে অব্যাহতি দিয়ে সুরাপান নিবারণী সভার সভ্য হয়েছেন; নিমচাঁদ এদের ভণ্ড বলে ব্যঙ্গ করে। "তিনি বিশ বৎসরে যে কারাগো বোঝাই নিয়েছেন ... সভায় বসে মদের জাবর কাটছেন (ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন)।" এখানে মন্তব্যের বিষয়বস্তুতে যে সূক্ষ্মতা রয়েছে, ভঙ্গি প্রদর্শনে তার অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। কিন্তু নিমচাঁদের চরিত্রের দুই বিপরীত দিককে ব্যক্ত করতে এই রসিকতা বিশেষ উপযোগী হয়েছে। এই মিশ্ররসেই রসিকতাটির সার্থকতা।

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক — 'কাঞ্চনের হস্ত ধরিয়া', অটলের প্রেমাবেগ প্রকাশ, মাতাল ভোলাচাঁদের অপর দুই মাতাল নিমচাঁদ ও অটলের 'পদধূলি গ্রহণ'; রামমাণিক্যকে ব্রাণ্ডি দিলে মন্ত্র পড়ে তা শোধন করে নেবার ভঙ্গি; মাতাল হয়ে রামমাণিক্য যেখানে 'কলকাতা'র মতো হতে না পারার দুঃখে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবার জন্য রঙ্গমঞ্চে ঝাঁপ দিয়ে 'পপাত ধরণীবলে'; কিংবা তাকে অচৈতন্য দেখে মৃত মনে করে, নিমচাঁদের শঙ্করাচার্য ও শেক্সপিয়র আবৃত্তি; 'ভোলাচাঁদের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া' শেক্সপিয়র আবৃত্তি; কেনারামকে মদ দিলে তারা 'অঙ্গুলীদ্বারা মুখে মদ্যপান'; 'প্যারডাইস্ লস্ট' (প্রথম সর্গ, পৃং ৯-৯২) থেকে আবৃতি করতে করতে (Into what pit thou seets, form what height fallen') বক্তব্য বিষয়ের আক্ষরিক অনুসরণে নিমচাঁদের 'ঢুলে ভূমিতে পতন' — সব ক-টি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে আছে বিরুদ্ধতার অসঙ্গতি ও তির্যক মনোভাবজাত হাস্যরস।

বাচনভঙ্গি ও ভাষাগত হাস্যরসের উদাহরণের মধ্যে ভাষাগত হাস্যরসই এ-নাটকে বেশি। কখনো যমক-শ্লেষ সৃষ্টি করে; কখনো বিশেষ কোনো উপমা সৃষ্টি করে, বক্তার উদ্দিষ্ট প্রশ্নের অপ্রত্যাশিত ভিন্ন উত্তর প্রদান করে, গান গেয়ে ও ছড়া বলে; কখনো বা প্রচলিত প্রত্যাশিত সংস্কার বিশ্বাস-মূল্যবোধের বিপরীত উক্তি করে; কখনো তীব্র কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও উজ্জ্বল মন্তব্য করে; এবং আগে নানা উপায়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। এ-ধরনের হাস্যরসের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে Ready wit বা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ভাষা ও চরিত্রের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের জন্ম হয়। উদাহরণ দিয়ে তা দেখানো যেতে পারে।

**রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সাদৃশ্যমূলকতা :** নকুল যখন জানতে চায়, অটল মদ ধরেছে কিনা, তখন নিমচাঁদের তীব্র ও সংক্ষিপ্ত জবাব : "পানায়, খায় না" (৯/১)। নকুলকে মদ্যপানে প্রবৃত্ত করাবার জন্য নিমচাঁদের উক্তি : "মনঃক্ষেত্রে মদ্যরসে আর্দ্র কর, তারপরে আমার উপদেশ বীজ বপন করবো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে" (১/১)। এখানে মদ্যপানের মতো তুচ্ছ কর্মের প্রসঙ্গে রূপকের প্রয়োগ এবং তৎসম শব্দের অতিরেক হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ব্রত-পার্বণ অনুষ্ঠান আমাদের দেশে 'দ্বাদশ ব্রাহ্মণ' ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। তারই সাদৃশ্যে নিমচাঁদ বলে, "এক ব্যাটা বড়ো মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়" (১/১)। 'সাধু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বীর অনুকরণে 'বাবু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বাব্বী' করেছে নিমচাঁদ (৩/১)। এই সাদৃশ্যমূলকতাকেই রামমাণিক্য যুক্তি হিসেবে প্রদর্শন করেছে ইংরেজি সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গ বিধানের ক্ষেত্রে, "যদি মর্দাগোর হি, হিজ, হিম অইল, তবে মাইয়াগোর শি, লিজ, শিম্ অইবে না ক্যান?" (৩/৬) ধ্বনি সাদৃশ্যে শ্লেষ যমক : দারোয়ান বলেছে 'বাবুজির হৌস'; নিমচাঁদ বুঝেছে 'বাইজির হাউস' (২/৩)। রামমাণিক্য 'পুলিশে'র কথা বললে নিমচাঁদ বলে : "এইবার ফুলিশের মতো কথা বল্যেন" (৩/৩)

সংলাপে তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা : প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব —

"অটল। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি?

নকুল। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেজেছে।

নিমচাঁদ। পালা আরম্ভ করি (মদ্যপান)..." (১/১)

আবার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যায় —

"অটল। আমি বেঁচে উঠিচি।

নিমচাঁদ। "ফাঁসী কাষ্ঠের সৌভাগ্য" (৩/২)।

চিরাচরিত সংস্কার বিশ্বাসের বিরোধী উক্তি : প্রায় Paradox - এর মতো শোনায়, নিমচাঁদ মদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে মদকে 'মহাত্মা' বলেছে (১/১)। মদ্যপান করেই 'বুদ্ধিকে সজীব' করা (ওই), "পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ — কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা" (ওই)। "The more we drink, the more we think" (২/২) ইত্যাদি।

বিকৃতি সাধন : নিমচাঁদ মদ্যপানের সময়ে বলে : 'মাসীর হেল্‌তো পান করি' (২/২)। রামমাণিক্য ব্রাণ্ডিকে বলে 'বাণ্ডিল' (ওই) ইত্যাদি।

কাউকে বা কোনো বস্তুর নাম প্রদান; অটলকে 'মাখনলাল' এবং 'মদের গোপাল' বলা (১/১), সই করা = বাঁদরে আঁচড়ানো (ওই)। পতিপ্রাণা = 'ভাতারকামড়া' (২/১), ভোলাঁচাদকে 'কুর্ম্ম অবতার' আখ্যা দান, কেনারামকে 'বরাহ অবতার'। অটলের তুচ্ছ রচনার জন্য তাকে 'ইণ্ডিয়ন বায়রন' আখ্যা দান ইত্যাদি (২/২)।

নির্বোধেয় উক্তি : রামমাণিক্য বলে : "বিক্রমপুর কলকাত্বা আষ্ট দিনের ব্যবধান,

ক্যাবোল নিকট ...” (২/২) কিংবা, ‘ভগ্যাদরী বাইবামতার করবে, স্যাও বালো পরের লগে দেহ দেবে না —” (২/২)।

মাতালের উক্তি : নিমচাঁদ রামমাণিক্যকে : “একটু বিলাতী মদ খা, তোর দেহ পবিত্র হক্” (২/২)। “এখন রাত্র হয়েছে — সূর্যমামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন”। (২/৩)। এর মধ্যে আবার একই ব্যক্তিকে একাধিক আত্মীয় সম্বোধন করা হয়েছে এবং তার মধ্যে আবার লিঙ্গ বিপর্যয় ঘটেছে। “যেন উস্মজা বোতল্ সুন্দরী আমার সহধর্মিণী হন” (২/১)। ‘আমি খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি। লোকে মাতাল বলে নিন্দে করে” (২/১)। নিমচাঁদের এই ধরনের সংলাপ সম্পর্কে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য তার ‘সধবার একাদশী’ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : “বায়ু-বিকৃতিময় বলিয়াই তাহার (নিমচাঁদের) উক্তি এত হাস্যরসোদ্দীপক। পাগলের প্রলাপ শুনিতে বড়ো মিষ্ট লাগে। আবার যদি সে প্রলাপের মধ্যে গূঢ় ভাব থাকে, তবে আরো মিষ্ট লাগে।...”

বিভিন্ন চরিত্রের (বিশেষত নিমচাঁদের) মুখে গান, ছড়া প্রদান— এগুলির আভিনায়িক দিকত হাস্যরসাত্মক। পরিস্থিতি ও ঘটনাজাত হাস্যরস : বিশেষ situation বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে হাস্যরস পরিবেশনের প্রয়াস এ-নাটকে দু-একটি মেলে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বৃদ্ধাঞ্জলি হয়ে নিমচাঁদের কাঞ্চন বন্দনায় হাস্যরস সৃষ্টির একটি ভালো situation তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, সৌদামিনীর মুখে অটল-কাঞ্চনের বাড়াবড়ির যে পরোক্ষ বর্ণনা আছে, তাকে প্রত্যক্ষ করলে একটি পরিস্থিতি নির্মিত হত। অটলের মায়ের স্নেহাধিক্য ও আতিশয্যমূলক আশঙ্কা হাস্যরসের উপযুক্ত পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করে অটলের গান গাওয়া ও পদ্যরচনা এ বিষয়ে উল্লেখনীয়। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে চিৎপুর রোডে নিমচাঁদের পড়ে থাকা, সার্জেন্টের ধরে নিয়ে যাওয়া একটি পরিস্থিতি নির্মাণ করেছে। এরকম আরো অনেক উদাহরণের খোঁজ পাওয়া যায়।

অন্তিম পর্যায়ে চরিত্রগত হাস্যরসের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিমচাঁদই অন্য দিকগুলির মতো এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে। তার বাগ্ভঙ্গি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাকে নিক্ষেপ করা ইত্যাদির মধ্যে তারই চরিত্র বিকশিত হয়েছে। নিমচাঁদের চারিত্রিক দ্বন্দ্ব থেকে মূলত হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। সে মদ্যপ হয়েও নিজের বোধ-বুদ্ধি হারায় না, সে মদ্যপ হয়েও সুস্থ। কখনোই তাকে পূর্ণ মদ্যাপ রূপে পাওয়া যায় না — তার কৌতুক ও পরিহাস প্রিয়তা চরম মত্তাবস্থাতেও জীবন্ত থাকে। সে অর্ধসুপ্ত : অর্ধজাগ্রত। এই জটিলতাই তার কথা ও কাজে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। বাহ্যিকরূপে সে কৌতুক চরিত্র, কিন্তু তার অন্তর-গভীর সংবেদনশীল। অনুভবী ও জ্ঞানী।

চরিত্রগত অন্যান্য হাস্যরসের মধ্যে কেনারাম, ভোলাচাঁদ, রামমণিক্য প্রভৃতির চরিত্র উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকের চেহারা, বেশবাস বিশেষত নিমচাঁদের মুখে প্রকাশ হয়েছে। নিমচাঁদের মন্তব্যে এবং নিজেদের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ দ্বারা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তরূপে নিমচাঁদের মুখে কাঞ্চনের পরিচয়টি দেখা যেতে পারে : “উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধান নর্তকী, শালভ্রষ্টে ধরণীধামে বারবিলাসিনীরূপে

জন্মগ্রহণ করেছেন : "ওকে তুমি 'কাঞ্চন' বলে সম্বোধন কল্যে" (৩/১)। নিমচাঁদ ও অটল ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলো টাইপমূলক বলে চরিত্রগত দিক থেকে হাস্যরসের বিস্তার ও জটিলতা নেই। কেনারাম, ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য প্রভৃতি নিছক নির্ভেজাল হাস্যরস বিস্তারের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে।

## ৭.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'সধবার একাদশী' নাটকে স্বনামধন্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের চরিত্র চিত্রণে পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের মূল উপজীব্য নিমচাঁদ চরিত্র যার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপময় সংলাপে নাটকটি প্রাণ পেয়েছে।

নিমচাঁদে প্রকাশ পেয়েছে দীনবন্ধুর বিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা। দীনবন্ধু মিত্র শৈশব-যৌবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। এরকম মানুষই আসন্ন সমাজ-বিপ্লবে ন্যস্ত করে রাখে তার সব আশা-ভরসা। নিমচাঁদ আমাদের দেখায় দীনবন্ধু সরল অকপট হৃদয় কতটা আশায় আকিয়ে ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলের দিকে, ডিরোজিয়ানদের পানে। তারপর যখন সে আশা চুরমার হল, তখনই দীনবন্ধুর বেদনাজর্জরিত হৃদয়স্থল থেকে জন্ম নিল নিমচাঁদের ট্র্যাজিক চরিত্র। হাসি-ঠাট্টা-মস্করা-উপহাসের বুর্জোয়া আঙ্গিক ও পরিবর্তিত হয়ে গেল ধ্রুপদি কর্মে। কমেডির সূক্ষ্ম আড়ালে নিহিত রইল ধ্রুপদি ট্র্যাজিক, এক সমাজচিত্র, সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষী।

অন্যদিকে ধনীর আদরে লালিত বিপথগামী অটলও যেন নিমচাঁদেরই আরেক প্রতীক। অটল 'আলালের ঘরের দুলাল', কলকাতার বাবু কালচারের এক প্রতিনিধি। তার মূরতা, মূর্খতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, নির্লজ্জতা, সবই যথাযথ ও বাস্তব দৃষ্টিতে চরিত্রায়িত করেছেন দীনবন্ধু মিত্র।

অন্যান্য পুরুষচরিত্রগুলোও সমাজ চিত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। নারীচরিত্রগুলোর মধ্যে কাঞ্চনের আচার-আচরণ বারবধূর মতোই, তবে সে বিবেকশূন্যা নয়। কিছু মানবিক মূল্যবোধ তার মধ্যেও জাগ্রত রয়েছে বলেই নাটকের অন্তিমে সে অটলকে মুক্তি দেয়। কুমুদিনী, দাম্পত্য-ব্যর্থা এক অসুখী নারী, যে মদ্যপ, লম্পট স্বামী অটলের বৈধব্য কামনা করতে বাধ্য হয়। কুমুদিনীর মতো বঞ্চিতা নারীর শোচনীয় জীবনকে তুলে ধরাও নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল।

সংলাপ ও হাস্যরসের আড়ালে এ-নাটকে রয়েছে সুগভীর ব্যঞ্জনাময় অন্তর্দৃষ্টি। তার সঙ্গেই প্রসঙ্গক্রমে চলে এসেছে সমাজচিত্র ও নারীর অবস্থান। সেই তখনকার বাবু-কালচারের দৃশ্যপটকে নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন। যে দৃশ্যপটে চরম অবহেলা, অবমাননা ও বঞ্চনার কষ্টভোগ করেছে নারীরা। 'সধবার একাদশী' তাই কমেডির আচ্ছাদনে এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ সমাজচিত্র। সেজন্য সেকালের পটভূমিকায় এ-নাটককে বিচার করতে হবে। 'সধবার একাদশী' তখনকার নব্য সভ্যতার ধ্বজাবাহী 'ইয়ংবেঙ্গল' এর নিখুঁত চিত্র। এ-নাটকে পাশ্চাত্য-সংস্পর্শ দুষ্ট সমাজের দোষগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

## ৭.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ৭.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

অষ্টম বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

## বিভাগ- ৮
## সধবার একাদশী
### সধবার একাদশী : সংলাপ ও সমাজচিত্র

**বিষয় বিন্যাস**

৮.০ ভূমিকা (Introduction)

৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৮.২ সংলাপ

৮.৩ সমাজ চিত্র

৮.৪ সমাজে নারীর অবস্থান

৮.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৮.৬ দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত

৮.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৮.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ৮.০ ভূমিকা (Introduction)

ঊনবিংশ শতাব্দী প্রেক্ষাপটে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তৎকালীন সমাজ-জীবনে বাবু-সম্প্রদায়ের যে চারিত্রিক বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে, তার নিখুঁদ চিত্র রয়েছে এই নাটকে। পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক জীবনের সামাজিক অবস্থান ও পারিবারিক সমাস্যারও উজ্জ্বল চিত্র রয়েছে আলোচ্য নাটকে। এই নাটকে সংলাপ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। যথোপযুক্ত সংলাপ রচনায় নাট্যকার অসাধারণ কৃতিত্বে দেখিয়েছেন।

### ৮.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যা থেকে আপনাদের সাহায্য করবে—

- নাটকের সংলাপ বিচারে নাটকটিকে অনুধাবন করতে,
- তৎকালনীন সমাজে নারীর অবস্থান এবং সমাজচিত্রের নিরিখে নাটকটিকে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য প্রস্তুত হতে।

## ৮.২ সধবার একাদশী : সংলাপ

নাটকের প্রাণ সংলাপ। সংলাপ হতে গেলে কথোপকথনকে হতে হবে নাট্যিক, প্রাসঙ্গিক, যথাযথ সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাগর্ভ এবং সর্বোপরি চরিত্রানুগ। বাস্তবানুগ বা চরিত্রানুগ সংলাপ যেমন চরিত্রগুলোকে ব্যক্ত করে, তেমনি এ-ধরনের সংলাপ নাটকের গতিবেগ সঞ্চারে সাহায্য করে। সংলাপ যদি আড়ষ্ট ও মন্থর হয়, তবে নাট্যধর্মও ব্যাহত হয়। নাট্যকার নাটকের চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে সংলাপ ব্যবহার করে থাকেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বৈশিষ্ট্য চরিত্রানুসারী ভাষা ও সংলাপ সৃষ্টি। 'সধবার একাদশী' নাটকের সংলাপও যথেষ্ট সন্তোষজনক।

নিমচাঁদের সংলাপ দিয়ে বিচার করা যায়, নিমচাঁদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও মানসের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে তার সংলাপ। তার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, সপ্রতিভতা, নিরাসক্তি, পরিহাস, কৌতুকপ্রিয়তা, মাতালবৎ শব্দসংযোজন দীনবন্ধু সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার সংলাপে। লেখাপড়া করা নিমচাঁদ কথায় কথায় ইংরেজি বলে, উদ্ধৃতি দেয়, যা ইয়ংবেঙ্গলদের স্বভাব, তা যথাযথভাবে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম দর্শনেই, সামান্য কটি উক্তিতেই নিমচাঁদ দর্শকের মন জয় করে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে, যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে, নকুলের সঙ্গে আলাপচারিতায় নিমচাঁদ ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে যে উক্তিগুলো করেছে, সবই আকারে সংক্ষিপ্ত। স্বভাবে তীব্র-ধারালো এবং তাতে দর্শকমনে নিমচাঁদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। উপমা, রূপক উল্লেখময় তার সংলাপ। তার সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে দেহভঙ্গি ও অঙ্গ ভঙ্গিও দ্রষ্টব্য। যেমন, অটলের হাতে শ্যামপেন দিয়ে বলে — "ঢক করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ আমার" (১/১), এই ছোটো সংলাপটির মাধ্যমে আমরা দৃশ্যটিকে অভিনীত হতে দেখি।

বুদ্ধিদীপ্ত তার কথা, কবিতা; সে সুর করে ছড়া আবৃত্তি করতে পারে। (দ্র. কাঞ্চনের প্রশস্তি), ওড়িয়া ভাষায় গান গাইতে পারে (দ্র. কাঞ্চনের কোলে অটলের মাথা রাখা), মাতালের অভিজ্ঞতাকে সে কাজে লাগায় যেমন — "শ্যামপেন খেয়েচ অ্যাসিডিটি হবে — একটু ব্রান্তি খাও অ্যাসিডিটির আদ্যকৃত্য হয়ে যাবে" (১/১)। কাঞ্চনকে সে যখন বলে, 'পুণ্য পণ্ড দেবি স্বৈরিনি। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি!" তখন তার বিচক্ষণতা উপলব্ধি করতে পারা যায়, (১/১)।

নিমচাঁদের ইংরেজি সংলাপও এখানে উল্লেখনীয়। ইংরেজি কাব্য ও নাটক থেকে নিমচাঁদ অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছে, সেগুলোই তার সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো বাংলার সঙ্গে মিশিয়ে, কখনো অবিকৃতভাবে উদ্ধৃতি দিয়ে, কখনো নিমচাঁদ স্বরচিত ইংরেজি বাক্যে তার সংলাপ বলেছে —

সংলাপের সার্থক হয়েছে যখন নাটকের সহ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংলাপ অংশগ্রহণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপে নিম্নোক্ত সংলাপটি — "নিমচাঁদ। That's like a good boy–

অটল। A good boy will mind his book, but a bad boy will only mind his play-

নিমচাঁদ। And will be a dunce, like you, all the days of his life. (১/১)।" এখানে নানা কারণে এই সংলাপ সার্থক। প্রথমত, নিমচাঁদের উক্তির উত্তরে অটল এখানে অংশগ্রহণ করেছে; দ্বিতীয়ত, প্রথম জনের উক্তির জের টেনেছে দ্বিতীয়জন, ফলে সংলাপের পারমার্থ বজায় আছে।

কিংবা এই গর্ভাঙ্কের নিমচাঁদ-নকুলের ব্যঞ্জনাময় সংলাপের উদাহরণ রয়েছে।

"নিমচাঁদ। My boat sails freely, both wind and strean

নকুল। চলো একটু বাতাসে খাই" (১/১)।

নিমচাঁদের ষড়যন্ত্রের নৌকা উপযুক্ত বাতাস ও স্রোত পেলে যথাস্থানে পৌঁছাবে। নকুল তার সহযোগী হয়ে সেই ষড়যন্ত্রের নৌকায় 'বাতাস' যোগাতে চায়। অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে ভোলাচাঁদ ও রামমাণিক্যের সংলাপে বিশেষত্ব আছে। ভোলাচাঁদের ইংরেজি দু-দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ — একদিকে নিমচাঁদের কণ্ঠে বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ইংরেজির বৈপরীত্য; অপরদিকে বাংলা ভাষাকে আক্ষরিকভাবে ইংরেজিতে অনুবাদ করার প্রয়াস। ভোলাচাঁদের ইংরেজি সংলাপের বাক্যগুলি অপূর্ণ, কর্তা-ক্রিয়া-কর্মের পারম্পর্য-শূন্য, মেরুদণ্ডহীন, ও অসম্পূর্ণ। তার চরিত্রের সঙ্গে এমনি করেই তার সংলাপ গদ্য সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। ভোলাচাঁদের ইংরেজি উপভোগ করার মতো "ইউ মাই ফাদার ইন্ লা সার্ — (অটলের পদধূলিগ্রহণ)। একস্‌কিউজ সার্ সান্ ইন্ লা সার্। (২/২) কিংবা "নো সার্, সান ইন্ লা সার্' ডেড্ সার্, ইয়োর ডাটার্ সার্' উইভো সার্, ইলেভেন ভেজ ডু সার্, হাঙরী সার্, ইয়োর ডাটার সার্, উইভো সার্, ইলেভেন ডেজ ডু সার্ হাঙরী সার্, দিস্ সাইভ্ সার্, দ্যাট্ সাইভ্ সার্, ওয়াটার ওয়াটার ওয়াটার হেলা নাইট্ সার।" (২/২)

বাংলা ভাষায় চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে এ-নাটকে। রামমাণিক্য তার সংলাপে যেমন হাস্যরস সৃষ্টি করেছে, তেমনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ব্যবহারে দীনবন্ধুর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। রামমাণিক্যের ভাষায়', 'পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর‍্যা মস্তক গুরাই দিচে — বাঙ্গাল কউস ক্যান্ — এতো অকাদ্য কাইচি তবু ক্বলকাত্বার মত হবার পারচি না? ক্বলকাত্বার মত না কর্‌চি কি?" (২/২) অথবা "পুঙ্গির পুত কেড়া! হিট্‌কাইচেন্ আর খ্যাপাইবার লাগ্‌চেন — দ্যাশে হইতো, প্যাটে পারা দিয়া জিহ্বাটা টানে বাইর করতাম আর অমবেস্যা দেক্‌তেন — হালা গর্ভস্রাব, হয়ার, বল্লুক, বুত।" (২/২)। ভোলাচাঁদ রামমাণিক্য বলে খ্যাপালে রামমাণিক্য উপরোক্ত উক্তিটি করে।

কেনারাম ডেপুটি, যাকে নিমচাঁদ ঘটিরাম ডেপুটি বলে সম্বোধন করে, তার সংলাপও চরিত্রানুগ। নিমচাঁদ কেনারামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাচ্ছিল্য করলে, কেনারাম বলে, "আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই মুই কল্যে আমাদের মর্মান্তিক হয়" (২/২)। তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক মোসায়েবিয়ানাকে কেনারামের সংলাপে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সুদক্ষ নাট্যকার দীনবন্ধু। এই নাটকে হিন্দি সংলাপও এক বিশেষ সম্পদ। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে অযোধ্যা সিং ও রঘুবীর রায়ের সংলাপ এর উদাহরণ। অযোধ্যা — "হামারা লিলাট্‌মে ভগবান অ্যাছা দুখ লিখা হ্যায়।" রঘুবীর — "ম্‌নমে ধীর রাখ ভাইয়া, লিলাট্‌মে যো লিখা থা হো গিয়া।" (২/৩)

স্ত্রী-চরিত্রগুলোর মধ্যে কাঞ্চনের সংলাপ তার পেশায় সঙ্গে তার বাক্‌ভঙ্গিকে নাট্যকার সুন্দররূপে মিলিয়েছেন, কথায় কথায় মাইরি বলা। পুরুষদের বাবু বলে সম্বোধন করা, ঘনিষ্ঠদের 'ভাই বলা, 'তুই তোকারি' করা — একেবারে গণিকাদের ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। নিমচাঁদকে সে তুই সম্বোধন করে — "তুই আমায় বেটি বেটি করিস্ নে বল্‌চি।" আবার অটলের সম্বন্ধে সে বলে — "অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়," (১/১) অথবা 'আমি ভাই বাড়ি যাই।' (৩/১)। এই স্ত্রীলোকদের জীবনে 'মাসী' এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। নিমচাঁদ কাঞ্চনকে 'মাসী' বলে ডাকত, — এ-বিষয়ে কাঞ্চনের প্রতিক্রিয়া তার সংলাপে চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তার গানের মধ্যে ('বিনে নটবর, জ্বলে কলবর, তাপিত অন্তর পুড়ে হল ছাই,') (১/১)। তার জীবনের অকথিত দুঃখ এক অসতর্ক মুহূর্তে যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন এই বারবনিতার প্রতি করুণা উদ্রেক হয়।

মেয়েদের সংলাপে তৎকালীন ঘরোয় বা লৌকিক ভাষাভঙ্গি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সৌদামিনী ও কুমুদিনীর কথোপকথনের একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল।

সৌদামিনী — "তা ভাই দুধের স্বাদ তো ঘোলে মেটে না, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।"

কুমুদিনী — "তুই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে— তুই যে ভাতার কামড়া তুই আবার অন্য লোককে দিবি..."

এইভাবে দেখা যায় যে নাট্যকার অতি সচেতনভাবে, নিপুণতায় নাটকের মধ্যে এমনভাবে সংলাপ ব্যবহার করেছেন যা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও স্বাদু হয়ে উঠেছে। সংলাপই এই নাটককে জনপ্রিয়তার উচুঁ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

## ৮.৩ সধবার একাদশী : সমাজচিত্র

উনিশ শতকের যে সময়ে দীনবন্ধুর জন্ম ও নাটক রচনা, তখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত এবং ইয়ং বেঙ্গলদের প্রাদুর্ভাব। ছিল ব্রহ্মধর্মের প্রসার, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, ঘরজামাই প্রথা এবং মদ্যপান। এ-সবই তাঁকে দেখতে হয়েছে। অভিজ্ঞতার ফসল ব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর নাটকগুলিতে, এবং সমাজ সংস্কারক ও চরম বাস্তবতার পথিক দীনবন্ধু সমাজের অন্যান্য ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেননি। বৃদ্ধের বিবাহ, কুসঙ্গে চরিত্রহানি প্রভৃতি তৎকালীন বাঙালি সমাজের দোষগুলিকেও নানা নাটকে ও প্রহসনে প্রকাশিত করেছেন।

আমাদের আলোচিত নাটকে (সধবার একাদশী) সমসাময়িক কালের শিক্ষিত যুবক ও ধনীর আদরে লালিত বখাটে বিপথগামী সন্তানদের প্রকৃতি ও পরিণাম চিত্রিত হয়েছে — নাট্যকার-অভিনেতা গিরিশচন্দ্র সেই অর্থেই সমাজ-দর্পণ রূপে নাটকটিকে গ্রহণ করে 'সমাজচিত্র' আখ্যা দিয়েছিলে। তিনি তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকটি দীনবন্ধুর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পৃষ্ঠাতে দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার খতিয়ান করতে গিয়ে

'সধবার একাদশী'কে 'সমাজচিত্র' আখ্যা দেন। (গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর 'যমলায়ে জীবন্ত মানুষ' নামের গদ্য রচনার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং দীনবন্ধুর নাটকের কলাকৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।)

অবশ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড° সুকুমার সেন মশাই অবশ্যে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার করে গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন এই বলে : "সধবার একাদশী প্রহসন।" ঊনবিংশ শতকের বাঙালির কাছে 'প্রহসন' অভিধাটি কোন্ অর্থে গৃহীত হত, ভাগ্যক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মশাই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (চতুর্থ সংস্করণ ১৯২৫। পৃ. ২৩৩) গ্রন্থে তার উল্লেখ করেছেন : "সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সুবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোষক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনা করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" রামগতির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মতের অমিল থাকলেও, যেহেতু তাঁরা সমকালের বাঙালি, সেদিক থেকে বিচার করলে 'প্রহসন' ও 'সমাজচিত্র' — এই দুই অভিধার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, দুই-ই সমপরিমাণে দেখা যায়। লক্ষ করতে হয়, 'সমাজ' এর প্রসঙ্গটি দু'জনেই লক্ষ করেছেন, কিন্তু রামগতি যে 'পরিহাস ও ঘৃণা' 'উৎপাদনের উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করেছেন, 'সমাজচিত্র' অভিধার পরিধির মধ্যে তা ধরা পড়ে না।

'সমাজচিত্র' যেন গিরিশচন্দ্রেরই স্ব-কথিত 'সামাজিক নক্সা'র অনুরূপ। গিরিশচন্দ্র নিজেও তাঁর একাধিক সামাজিক নাটকে তৎকালীন কলকাতার সমস্যাদির রূপ দিয়েছেন। 'সধবার একাদশী'র মধ্যে কোনো পরিপাটি কাহিনি নেই, ঘটনাগুলিকে বাহ্যত বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, এমনকি, কোনো-কোনো চরিত্রের অবতারণার সার্থকতা পর্যন্ত সংশয়ে আচ্ছন্ন— মনে হয়, 'সমাজচিত্র' আখ্যা-দানের মধ্যে গিরিশচন্দ্র নাটকের গঠনগত এই দিকের প্রতিই অঙ্গুলি—সঙ্কেত করেছেন। দ্বিতীয়ত, অনেকের ধারণা, অটল-নিমচাঁদ প্রচণ্ড প্রহারের পরও যে মদ খেতে বাগানে গেল। তার অর্থ — দুজনের চরিত্রের কোনো সংশোধন প্রদর্শন করা হল না। যদিও গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে পরিবর্তন এসেছে সূক্ষ্মভাবে। কাহিনি-বিন্যাসেও গভীর ঐক্য ও ব্যঞ্জনার বোধ আছে। রামগতির মত যদি তদানীন্তন বাঙালির সাধারণ মত হয়, তাহলে 'প্রহসন' হতে গেলে দোষ দেখিয়ে চরিত্রের সংশোধন করতে হয় — 'সধবার একাদশী'তে যা দেখানো হয়নি; অতএব তা 'প্রহসন' পদবাচ্য হতে পারে না। 'সমাজচিত্র' হতে পারে মাত্র। এই আখ্যা দানের মধ্যে তাই নির্বিশেষভাবে সেকালের এবং বিশেষভাবে গিরিশচন্দ্রের মানসিকতা বিম্বিত হয়েছে।

বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ড° অজিতকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস' (প্রথম সংস্করণ ১৯৪৬, পৃ. ৬০) গ্রন্থে 'সধবার একাদশী'কে 'বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসন' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন ও সংশোধন করেন। 'দীনবন্ধু রচনাবলী' (জুলাই, ১৯৭৪, পৃ. ৩৪)-এর সম্পাদক-রূপে তিনি রচনাটিকে 'উচ্চাঙ্গের কমেডি' বলেছেন। কমেডির সঙ্গে প্রহসনের পার্থক্য প্রদর্শন করে রচনাটির মধ্যে কমেডির লক্ষণ কতখানি আছে, তা দেখিয়েছেন। ড০

শ্রীভনাবীগোপাল সান্যাল মহাশয় তাঁর 'দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য সমীক্ষা' (সেপ্টেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১৫৬) বইতে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করলেও ঈষৎ ভিন্নতাও পোষণ করেছেন।

"... দীনবন্ধু নিমচাঁদকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত করেছেন কমেডি। তবুও তাঁর নাটক প্রহসনের থেকে একেবারে মুক্ত নয়।" অর্থাৎ ড০ সান্যালের মতে রচনাটি খানিক কমেডি (নিমচাঁদের চরিত্রের বিশেষত্ব দিক থেকে), খানিক প্রহসন (রচনাটি অন্যান্য দিককে অবলম্বন করলে)।

ড° অজিতকুমার ঘোষ তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে পুনরায় বলেছেন : "নিমচাঁদ চরিত্রে কমেডি ও ট্র্যাজেডি যেন মিলে মিশে আছে। তার কথা ও আচরণে কমেডির উপাদান। কিন্তু তার নিভৃত আত্মানুভূতি ও আত্মগ্লানিপূর্ণ স্বগতোক্তিতে ট্র্যাজেডির উপকরণ বর্তমান" (পৃ. ৩৫)। তা হলে, দুজন সমালোচকের মন্তব্যের আলোকে এই সিদ্ধান্ত আসা যায় যে, 'সধবার একাদশী' অনেকটা কমেডির সঙ্গে ট্র্যাজেডি; অনেকটা আবার প্রহসনের সঙ্গে কমেডি। দুজনেই একটির সঙ্গে অপরটির মিশ্রণ লক্ষ করেছেন।

আমাদের মতে নাটকটি এই সবকয়টি অভিধারই একটি মিশ্রিত দিক, এবং সেটাই এর শ্রেষ্ঠত্বের বড় দিক। এ নিছক প্রহসন নয়, কেননা কেবল হাস্যরস পরিবেশনই এর লক্ষ্য নয়। প্রহসন হল জীবনের একটি লঘুতর দিক, অথচ সবকটি একটি গভীরতার দিক আছে। আবার 'ট্র্যাজিডি', 'কমেডি' বা 'সমাজচিত্র'তও এর পূর্ণ স্বরূপ ধরা পড়ে না।

তবে সম্পূর্ণ নাটকটিতে তৎকালীন সমাজের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে, তাতে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে নিমচাঁদ অটল প্রমুখ শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের পানাসক্তি। নিমচাঁদ চরিত্রটির মাধ্যমেই নাট্যকার সুনিপুণভাবে তখনকার শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় বিপথগামিতার দৃশ্য তুলে ধরেছেন। নিমচাঁদ কিছুটা কমিক চরিত্র তবে সে মাতাল হয়েও সাহিত্যরসিক, চরম অবহেলিত হয়েও যে ঠিক-ঠিক মুহূর্তে ঠিক-ঠিক ভাবে শেক্সপিয়র-মিল্টন মন্থন করে বাক্য উদ্ধৃত করতে পারে, যে যত গভীরভাবে মাতাল, অত সূক্ষ্মভাবে সাহিত্যরসিক। নিমচাঁদের কান্না-বেদনা-গ্লানি অধঃপতনে আমাদের মনে করুণা-সমবেদনা জাগ্রত হয় ঠিকই, কিন্তু তাকে ট্র্যাজিক বলা যায় না। নাটকের মধ্যে নিমচাঁদ বরাবর মাতাল। এমনকি অটলকে মদ ধরিয়ে নিজের মাতাল-যাত্রা নির্বাহের পরিকল্পনায় (এখানে ওথেলোর দাম্পত্য-জীবনের বিরুদ্ধে ইয়াগোর ষড়যন্ত্রের ভাষা ব্যবহার করেছে সে) রত। নিমচাঁদ ও অটল দুজনে পৃথক চরিত্র হলেও একই ভাবনার দুটি দিক। নিমচাঁদ 'সুরাপান নিবারিণী' সভার ব্যঙ্গ করে। অটল সমাজের বাবু 'কালচারের প্রতিনিধি। তার স্ত্রী কুমুদিনীর কথায় জানা যায় "কিসে লোকে বাবু বলবে কেবল তাই দেখে।" বাবুগিরি করতে গিয়ে সে মদ খেয়েছে, বেশ্যা রেখেছে। ন্যায় অন্যায় জ্ঞানও হারিয়েছে।

নিমচাঁদের আরেক বন্ধু নকুলেশ্বরও মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত। তবে সে পেশায় উকিল, শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তি। শিক্ষিত নিমচাঁদের প্রতি সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। রামমাণিক্য নাটকে এসেছে উনিশ শতকের বিকৃত বাবু-কালচারের আরেক প্রতিনিধি রূপে। সে বাঙাল, কলকাতার মতো হতে তার আপ্রাণ চেষ্টা সমগ্র নাটকে পরিলক্ষিত হয়। সে নববাবু হতে গিয়ে স্বধর্ম ও নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। একই কথা বলা যায় কেনারাম

প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের নবতম সংস্করণ সে, যাকে নিমচাঁদ 'ঘটিরাম ডেপুটি' বলে অভিহিত করেছে। "তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটা আছে?" পদলোভী ও খেতাবলোভী তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিমচাঁদের উক্তিতে ব্যঙ্গবিদ্ধ করা হয়েছে। অটলের আরেক ইয়ার দোস্ত ভোলাচাঁদ। সে ভুল ইংরেজি বলে। তখনকার ডেপুটি আরেক ইয়ারদোস্ত ভোলাচাঁদ। সে ভুল ইংরেজি বলে। তখনকার ডেপুটি বা উচ্চপদবী আধিকারিকদের মোসায়েবিপনার এক দৃষ্টান্ত ভোলাচাঁদের চরিত্রে পরিস্ফুট। যদিও তার জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন।

প্রবল পানাসক্তির প্রভাবে যুব সম্প্রদায়ের স্ত্রীদের দুরবস্থাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। অটলের স্ত্রী কুমুদিনী নিজেকে বিধবা বলে — "এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল — আমি আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়ি দে মর্‌বো।" বারবণিতা কাঞ্চনের আচার আচরণ বারবধূর মতোই। কথায় কথায় মাইরি বলা, ঘনিষ্ঠদের তুই-তোকারি ও অটল প্রমুখদের বাবু সম্বোধন করা, তার বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।

এভাবে ক্রমে ক্রমে দেখা যায়, নাটকটি নাট্যবিচারে, প্রহসন, সমাজচিত্র, কমেডি, ট্র্যাজেডি যে অভিধারই হোক বা এদের মিশ্রিত রূপই হোক, কিন্তু তৎকালীন সমাজের মদ্যপানের সংস্কৃতি, বেশ্যারক্ষণ মদ্যপানের বিপথগামিতা, বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় ও বিকৃত রুচির এক সঠিক সমাজচিত্র নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুনিপুণ কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

## ৮.৪ সধবার একাদশী : নারীর অবস্থান

'সধবার একাদশী' নাটকে সমসাময়িক কালের শিক্ষিত যুবক এবং ধনীর আদরে লালিত বিপথগামী সন্তানদের প্রকৃতি ও পরিণাম, সামাজিক অবক্ষয় এবং সে সঙ্গে যে যুগের নারীদের সামাজিক অবমাননা, গ্লানি চিত্রিত হয়েছে — নট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সম্ভবত সে অর্থেই সমাজ-দর্পণ রূপে নাটকটিকে গ্রহণ করে 'সমাজচিত্র' আখ্যা দিয়েছিলেন। তীব্র পানাসক্তি ও তার বিরূপ পরিণামে নারীদের জীবন যন্ত্রণাময়। সে অর্থেই হয়তো মদ্যপান ও তার দুষ্পরিণাম প্রদর্শনে নাটকটির নাম 'সধবার একাদশী' রাখা হয়েছে। মূলত সেসব পুরুষদের স্ত্রীদের জীবন যে এই সামাজিক ব্যাধির ফলে কতটা দুর্বিষহ, কষ্টদায়ক হতে পারে, তারই এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে 'সধবার একাদশী'তে।

নাটকটির নায়ক নিমচাঁদের ব্যঙ্গসচেতন উক্তিতে ধরা পড়ে মদ্যপানের বিভীষিকাময় ঘৃণ্যরূপ। নিমচাঁদ শিক্ষিত, আত্মসচেতন তবে পানাসক্ত এবং একইসঙ্গে সাহিত্যরসিক। নাটকের অন্তিম লগ্নে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সুরসিক নিমচাঁদের উক্তিতে পাওয়া যায়—

"কি বোল বলিলে বাবা বলে আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।

মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যায় পতি।" (৩/৩)

অর্থাৎ যে মদ্যপানের প্রভাবে তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ এবং ফলস্বরূপে প্রহারের, সে প্রহারই পরই আবার বন্ধু অটল সহযোগ নিমচাঁদের পুনঃ বাগানে প্রবেশ এবং মদ্যপান। নিমচাঁদ জ্ঞানপাপী, মদ্যপানের বিষফল জেলেও সে তা ছাড়তে আপরগ, হয়তো বা তার দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা ঢাকতেই তার এই পানাসক্তি। কিন্তু এরফলে সমাজের নারীদের দুরবস্থার জন্যও তারা কোনোরকম নিজেদের দায়ী করতে রাজি নয়। অটলের স্ত্রী কুমুদিনী ও বোন সৌদামিনীর আলাপচরিতায় আমরা তার কিছুটা আভাস পাই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। এদেশে সধবারা একাদশী পালন করে না। বিধবারা সেই সংযম-নিয়ম-রীতি-নীতি ইত্যাদি পালনে বাধ্য থাকে। তথাপিও জীবিত পতি (অটল) থাকা সত্ত্বেও কুমুদিনী নিজের বৈধব্য কামনা করে।

কুমু। "এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল — আমি আর সইতে পারেনি, আমি গলায় দড়ি দে মর্‌বো।'

বাবু-কালচারের নিদর্শনে অটল বারবণিতা বিলাসী। বারবধু কাঞ্চনকে সে রক্ষিতা করে। সে অপমান স্পষ্টতই তার স্ত্রীর মনে বিরূপ প্রভাবে ফেলে।

সমসাময়িক সমাজের অবস্থানে কাঞ্চন তার পেশার সঙ্গে মানানসই বাক্‌ভঙ্গির ব্যবহার করে। কথায়-কথয়া 'মাইরি' বলা, পুরুষদের 'বাবু' বলে সম্বোধন করা, ঘনিষ্ঠদের 'ভাই' বলা, 'তুই তোকারি' করা — একেবারেই গণিকাদের ভাষা, তবে কখনো তার গানের মধ্যে ('চিনে নটবর, জ্বলে কলবর, তাপিত অন্তর পুড়ে হল ছাই,' ১/১), তার জীবনের অকথিত দুঃখ এক অসতর্ক মুহূর্তে যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন এই বারবণিতার প্রতি করুণা জাগে। কাঞ্চন কিন্তু মনে মনে অটলের প্রতি গোপন অনুরাগী, বহুচারিণী হয়েও একচারিণী থাকে। পেটের দায়ে সে গণিকা। অটল নিয়মিত না গেলে সে অভিমান প্রকাশ করে। অটলের মাথা ধরলে গোলাপজল দেয়। তার উক্তিতে, "আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে,/ কারো কাছে যেতে দেয় না/ ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি।" (৩/১)

কুমুদিনী এই নাটকে হতভাগিনী নারী যার স্বামী 'অটল' থেকেও নেই। ননদিনীর সঙ্গে কথোপকথনে তার সেই বঞ্চিত জীবনসুখের ক্ষোভযন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। বারংবার সে লম্পট ও মাতাল স্বামীর মৃত্যুযন্ত্রণা কামনা করেছে। সে সমাজেও সে যেন এক প্রতিবাদ স্বরূপ। বিদ্রোহী নারীর আভাস। যদিও তার সেই ব্যক্তিগত বিদ্রোহ ভাবনা তার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনেই সীমাবদ্ধ। অটলের বোন সৌদামিনী নিজে স্বামী সোহাগিনী হলেও বৌদির জন্য তার সমবেদনা যথেষ্ট। ভাইকে সেও ঘৃণা করে। সে কামনা করে যেন অমন স্বামী করো না হয়। ভাই অটল মদের বেহুঁশ বেহোশ হয়ে থাকলে পুত্রপ্রাণ মা, পুত্রের সেবা করলেও, সৌদামিনী তা পারে না। তার উক্তিতে —

সৌদা। (স্বগত) "সাধে বৌ বলে, বিধবা হয়ে থাকা ভাল — সাত জন্ম থুব্‌ড়ো হয়ে থাকি সেও ভাল। তবু যেন দাদার মত ভাতারটি না হয়। গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে।" (৩/২)।

তবে অটলের মায়ের মধ্যে অন্ধ বাৎসল্য আছে। যার জন্য পুত্রের দোষ দেখেন না। ছেলের গায়ে মদের গন্ধকে তিনি ঘামের গন্ধ বলে ঢাকেন। পুত্রবধূ থাকা সত্ত্বেও ছেলের জন্য বারবণিতা কাঞ্চনকে ঘরে রাখতে চান, যেহেতু ছেলে কাঞ্চন-অন্ত প্রাণ। এ ধরনের বিকৃতি রুচি মাতৃত্বকে মহিমাহীন করেছে।

বাঙাল রামমাণিক্যের স্ত্রী ভাগ্যধরীও পতিপ্রাণা, সতীসাধ্বী, অথচ রামমাণিক্য সেই একই দোষে দোষী। বারবণিতাবিলাসী ও পানাসক্ত।

বারবধূ কাঞ্চনও অবশ্যে মানবিকতাশূন্য নয়। নাটকের শেষের দিকে সে অটলকে ছেড়ে চলে যায়। সম্পূর্ণ নাটকটিতে নারী চরিত্রের তেমন প্রাধান্য না থাকলেও, কুমুদিনীর কাহিনিকে নেপথ্য রেখে তার জীবনের শোচনীয় দিকটি তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। বিস্তৃত কাহিনি-কথনের আয়োজন এই ছোটো নাটকে নেই, কাজেই কুমুদিনীর বঞ্চিত জীবনের বেদনাকে পরোক্ষেই ব্যক্ত করা হয়েছে। কতখানি দুঃখে-যন্ত্রণায় কুমুদিনী আপন বৈধব্যের কামনা করেছে, তা আমাদের সহৃদয়তার সঙ্গেই বিবেচনা করতে হবে। অটল-কুমুদিনীর মুখোমুখি সাক্ষাৎ নাটকে দেখতে পাই ক্ষণেকের জন্য একবার — একেবারে শেষে, তাণ্ড ভুলে, আকস্মিক ভাবে, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যেখানে প্রেম বা শান্তি নেই, নাটকে তাদের সাক্ষাৎকার অনুপস্থিত রেখেই নাট্যকার তা দক্ষতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। কুমুদিনীর সক্রিয় হবার সুযোগ সেকালের পটভূমিকায় ছিলই না। এভাবে স্বল্প কাহিনি-কথনে পরিচয়ে, তৎকালীন নারীদের যে যন্ত্রণামুখর দাম্পত্য জীবন বা অবস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা আমাদের সমবেদনা জাগিয়ে তোলে।

## ৮.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'সধবার একাদশী' নাটকে স্বনামধন্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে সংলাপের পারদর্শিতা প্রকাশ পেয়েছে।

সংলাপের ও হাস্যরসের আড়ালে এ-নাটকে রয়েছে সুগভীর ব্যঞ্জনাময় অন্তর্দৃষ্টি। তার সঙ্গেই প্রসঙ্গক্রমে চলে এসেছে সমাজচিত্র ও নারীর আস্থান। সেই তখনকার বাবু কালচারের দৃশ্যপটকে নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন। সে দৃশ্যপটে চরম অবহেলা, অবমাননা ও বঞ্চনার কষ্টভোগ করেছে নারীরা। 'সধবার একাদশী' তাই কমেডির আচ্ছাদনে এক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ সমাজচিত্র। সেজন্য সেকালের পটভূমিকায় এ-নাটককে বিচার করতে হবে। 'সধবার একাদশী' তৎকালিন নব্য সভ্যতার ধ্বজাবাহী 'ইয়ংবেঙ্গলে' এর নিখুঁত চিত্র। এ-নাটকে পাশ্চাত্য সংস্পর্শ - দুষ্ট সমাজের দোষগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

## ৮.৬ দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিমত

● **রামগতি ন্যায়রত্ন :**

"সধবার একাদশী মদের কথাতেই আবদ্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্যবসিত, ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ, সমাজে প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোরাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্রশোধণ প্রভৃতি পরিহাসস্থলে বর্ণনা করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয় প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতগুলা বখামির গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত। তাহা হইলে কলিকাতার মোছোবাজার ও সোনাগাছী প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত। উল্লিখ্যমান প্রহসনে অটল ও নিমে দত্ত বরাবর সমান মাতলাম ও বেশ্যা প্রভৃতি লইয়া সমান ঢলাঢলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ও রূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসন রচনার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ বড়ই দুঃখের বিষয়ে যে, দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসামাজিক লোকের হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে।" ( 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয় প্রস্তাব')

● **কালীপ্রসন্ন ঘোষ :**

"দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাট্যকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'নীলদর্পণ' রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্য-রস তরল হইতে থাকে। তাহার পরিচয় — 'সধবার একাদশী' তাঁহার নিমে দত্ত কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। নিমে দত্ত স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকাগ্নি। নিমচাঁদ, এখন তা স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নকরাগ্নি দিবারাত্র গলধঃকরণ করিতেছে। এই স্বর্গ-নরক-সমষ্টিকে দীনবন্ধু তরল বঙ্গীয় যুবকের দলে স্থাপিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিমচাঁদ পুনর্ফলের হইয়াও স্ফূর্তি পায় নাই। নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়। যে নরকাগ্নি হরিশচন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে নিমচাঁদকে পাঠান কেন? নিমচাঁদকে সেই হরিশ, সেই রামগোপাল মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়। তবে নিমচাঁদ স্ফূর্তি পাইত। আর নীলদর্পণ কাব্যে যেরূপ পল্লীগ্রামের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগরিক চিত্তে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইতেন। তাহা হয় নাই; দীনবন্ধু ক্রমেই তরলভাব অবলম্বন করেন। সেই জন্য তিনি নবীন তপস্বীনীতে নাট্য লিখিতে প্রহসন করিয়াছেন। আবার 'জামাই বারিক' প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক করিয়াছেন। তাঁহার লীলাবতীর নায়ক-নায়িকাকে যত না মনে পড়ে। তাহার নদের চাঁদকে তাহার অধিক মনে পড়ে। প্রহসনে দীনবন্ধু অদ্বিতীয়।" ('নাটক')

● **Ramesh Chandra Dutta** :

"The lash of Iswar Chandra's satire cuts deep, Dinabandhu's milder and gentler admonitions inflict no wound, but hold up voice only in its natural and hideous colours. Iswar Chandra is a more powerful satirist, Dinabandhu is a pleasantar humorist, Iswar Chandra's ready and witty verse was the war cry of his party and the banded and pointed shafts of his vigorous if course sareasm were the weapons of their war. Dinabandu waged no party strife; his good natured humour spread a sunshine of gladness around him, and his ridicule of voice and folly was appriciated by all." ['Literature of Bengal']

● **প্রথমনাথ বিশী :**

"আবার কেমন যেন সন্দেহ হয় যে, কেবল অটলবিহারী নয় স্বয়ং লেখক অবধি কাঞ্চনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। আর কেবল কাঞ্চনের কাছেই বা বলি কেন নিমে দত্তর কাছেও বটে। নিমে দত্তর আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়, সে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে witty মাতাল; আর প্রকৃতিস্থের মধ্যেও, কী সাহিত্য জগতে কী বাস্তব জগতে, তার মতো বাগ্‌বাণিজ্যের রথ্‌চাইল্ড একান্ত দুর্লভ। অটলবিহারী মদের মায়া কাটাতেই পারে নাই, কাঞ্চনের মায়া কাটাইতে পারে নাই — এসবের মূলে বোধ করি বাগ্‌-বৈভবের মায়া। নিমে দত্তর ইন্দ্রজাল ছেদ করিতে পারিলে অটল কামিনী কাঞ্চনের ঘোর কাটাইতে সক্ষম হইত! কিন্তু তা কী করিয়া সম্ভব। যখন স্বয়ং তাহার সৃষ্টিকর্তা অবধি সেই মোহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন?

দীনবন্ধুর শিল্পসৃষ্টির এই একটা সংকট! তিনি এমন সব আপাদমস্তক জীবন্ত witty চরিত্র সৃষ্টি করিতেন যে শেষপর্যন্ত তাহারই চরিত্রভ্রংশের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। একটি চরিত্রের খাতিরে, সমস্ত চরিত্রগুলি যে উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্ট লেখক তাহাই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, গল্প আর 'সমে' পৌঁছিত না, অর্ধপথে মাতলামি করিয়া পূর্ণতার অবকাশে বাধা জন্মাইত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, সহৃদয়তা দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠগুণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। ওইটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গুণ, আবার শ্রেষ্ঠ দোষ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শ্রেষ্ঠ বিপদ। জীবন্ত চরিত্রের খাতিরে গল্পের সমগ্রতাকে নষ্ট করিয়া দিতে দীনবন্ধুর জুড়ি নাই।

তাঁহার সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিমে দত্ত, তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন। আর এই দুটি শ্রেষ্ঠ নরনারী যে- নাটকে বর্তমান সেই 'সধবার একাদশী' যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা তাহা বলাই বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যে নির্মম রচনা সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। নির্মম রচনা বলিতে বুঝি সেই শ্রেণির রচনা যাহাতে লেখক সম্পূর্ণ মমত্ববোধহীন হইয়া গল্পের নিদিষ্ট পথে রাশ ছাড়িয়া দিয়াছেন — ঘোড়ার পদাঘাতে পথিককে পীড়িত হইতে দেখিয়াও রাশ টানেন

নাই। গাড়ির টান সামনাইতে গিয়া আরোহীকে ব্যস্ত হইতে দেখিয়াও দয়া অনুভব করেন নাই, লেখক নির্লিপ্ত স্রষ্টার মতো আপস সৃষ্টির নিয়মে আপনি বদ্ধ জীবনের মতো আচরণ করিয়াছেন যে সব গল্পে বা নাটকে — তাহাই নির্মম সাহিত্য। মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় নির্মম সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষ্ণুবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ওই জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ কুন্দনান্দিনীর মৃত্যু এবং রোহিনীর হত্যাকে ব্যতিক্রম মনে করিবেন। ওই ব্যাপারে গল্পের নিয়তির চেয়ে লেখকের অভিরুচি যেন অধিকতর প্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি কতকাংশে নির্মম সাহিত্য, সম্পূর্ণত নয়; কেননা বিনোদিনীর স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ নিতান্তই নির্মম।

যেমন নির্মম রচনা আছে তেমনই নির্মম চরিত্র আছে, কেননা একটি নহিলে আর একটা হয় না। দীনবন্ধুর কাঞ্চন নির্মম চরিত্রের শিরোমণি, নিষ্ঠুর বলিয়া নির্মম নয়। নির্মম বলিয়াই সে নিষ্ঠুর; কামিনীকাঞ্চনের এ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত আর আছে কি! কাহারও প্রতি তাহার আকর্ষণ নাই, কিছুতেই তাহার মোহ নাই, কামসাধনার সিদ্ধির ফলে কামকেও সে অনেক পেছনে ফেলিয়া গিয়াছে — তাহার কামকলায় একেবারেই 'কামগন্ধ নাহি', কামসাধনায় এক্ষণে সে সম্পূর্ণ নিষ্কাম, তাই সে অটলের জীবনে যেমন সহজে আসিয়াছিল তাহার জীবন হইতে তেমনই অনায়াসে বিনা নোটিশে চলিয়া গিয়াছে — এমনই কতজনের জীবন হইতে আগম-নির্গম অভ্যাসের ফলে তবে সে আশ্চর্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। অটলের জীবন হইতে তাহার বিদায় একেবারে বিনা নোটিসে ঘটিয়াছে। এই ব্যাপারের দীনবন্ধু যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। সকলেই ভাবিতেছে সে এখনই ফিরিবে, অটল ও নিমে দত্ত ও তাহার পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী— কিন্তু আর সে ফিরিবে না, মাশোহারা বাড়াইয়া দিলেও ফিরিবে না, কারণ ফিরিবার কারণ নাই। যেমন আসিবারও কোন কারণ ছিল না। ওই খানেই নির্মম চরিত্রটির নির্মমতম প্রকাশ।" ('বাংলা সাহিত্যের নরনারী)

● **সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় :**

"দীনবন্ধুর দ্বিতীয় প্রহসন 'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগল বুড়ো'র পূর্বে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। এখনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গা-সপ্তমী পূজার রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্জে পাড়াস্থ প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে বাগ্‌বাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পরবর্তীকালের কোন অভিনয় রজনীতে নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকা লইয়া সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর সম-সাময়িক সমাজে মদ ও বেশ্যার প্রভাব কিরূপ দ্রুতপদে সামাজিক গণকে অভিভূত করিতেছিল তাহারই চিত্র এই প্রহসনে চিত্রিত হইয়াছে। জনৈক ধণাঢ্য পরিবারের একটি মাত্র আদুরে সন্তান অবনতির পিচ্ছিল সোপানে পদস্খলিত হইতে হইতে কিরূপে তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই অবতরণিকার সোপান-পরম্পরা দৃশ্যে-দৃশ্যে এই প্রহসন মধ্যে দেখানো হইয়াছে। অটল গ্রহকে কেন্দ্রে রাখিয়া

অপর যে সকল পাপগ্রহ আপনাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কক্ষপথে ঘুরিতেছিল, তাহার সকলেই একে একে কক্ষচ্যুত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। নিমচাঁদ কিন্তু অটলকে ছাড়ে নাই। পরিশেষে এমনি অবস্থান্তর ঘটিল যে, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রের ন্যায় নিমচাঁদের চতুঃপার্শ্বে অটলই ঘুরিতে লাগিল।

মাতাল হইল প্রহসনের আলোক (Light) এবং গণিকা তাহারই ছায়া (Shade)। তজ্জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দেশীয়-ভিন্নদেশীয় বিবিধ মাতালমূর্তি কাঞ্চনরূপ ছায়া-নির্মিত পটভূমিকার উপর চিত্রিত হইয়াছিল। এই চিত্রগুলি এতই স্বাভাবিক যে নাট্যকার যেন এক হস্তে ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা এবং অপর হস্তে গ্রামোফোন্ যন্ত্র লইয়া তাহাদের প্রকৃত অধিষ্ঠানভূমি হইতেই ঐগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আসব ও গণিকা যে গ্রন্থের উপজীব্য তাহার চরিত্র কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইলে সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পুর্তিগন্ধে নাসিকা কুঞ্চন করিলে চলিবে কেন?

নিমচাঁদ এই প্রহসনের একটি নূতন সৃষ্টি। মদের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিলে শিক্ষা-দীক্ষা যে অতল জলে ভাসিয়া যায় তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ নিমচাঁদ। প্রকৃতিদেবী নিমচাঁদের প্রতি অকরুণ ছিলেন না, ঘোর মাতাল অবস্থাতেও নিমচাঁদের মনে চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছিলেন, কিন্তু মদ যাহাকে খাইয়াছে তাহার চৈতন্য স্থায়ী হইতে পারিল না। নিমচাঁদের সমুদয় উচ্চশিক্ষা মাতালের প্রলাপোক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। ইংরাজী কাব্য-সাগর মন্থন করিয়া সে তাহার যুক্তির অনুকূলে যে সকল রত্ন উদ্ধার করিত, তাহা 'বেনাবনে মুক্তা 'ছড়ানোর' মতো তাহার বন্ধু মহলকে বিস্মিত করিত বটে, কিন্তু বিমুগ্ধ করিতে পারিত না।

নকুলেশ্বর ও কেনারাম এই প্রহসনের অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র। উকিল মাতাল দেখাইয়ার জন্য নকুলেশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাহার ক্রিয়া এত বিরল যে পাত্রান্তরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইলেও গ্রন্থের অঙ্গহানি হইত না। কেনারাম চরিত্রটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, নাট্যকারের লোক-চরিত্র জ্ঞানের ফলস্বরূপ গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে।

অটল গ্রন্থের নায়ক, দুর্বলতাই তাহার অবনতির কারণ। দৈহিক বলশালী নিমচাঁদের ব্যক্তিত্বের (Personal magnitism) কাছে সে পরাজিত — তাহার বিদ্যাবত্তায় সে অভিভূত — কাঞ্চনের মান-অভিমানে সে বিমূঢ় এবং পরিবেশে মদের নিকট যখন সে আত্মবিক্রয় করিল, তখনি তাহার পাপের পরাকাষ্ঠা জন্মিল। অগম্যাগমনের অভিলাষ জন্মিয়া সেই অভিলাষ চরিতার্থ করিবার প্রয়াস ঘটিল এক আশ্চর্য কৌশলে ঐ কার্যে বাধা উপস্থিত হইল, এবং সেই বাধাজনিত বেদনায় অটলের জ্ঞানদীপ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় অন্ধতমসায় ডুবিয়া গিয়াছিল। অটল তখন বলিল — 'নিমচাঁদ! ওঠ বাবা না আস্‌তে — আস্‌তে আমরা বাগানে যাই। যে মার খেয়েছি অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদ্‌না যাবে না।'

নিমচাঁদ নিরাশ সাগরে যেন কুল পাইল, এবং অটলের মুখে মদের নাম শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল ঃ —

'কি বোল্ বলিলে বাবা বল আর বার।

মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।।

মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি।

সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।।'

এই কথার পর তাহার পুনরায় উৎছন্নের পথে ধাবিত হইল, এবং প্রহসনের মূল রহস্যটি (Key-note) প্রকাশিত করিয়া গেল।"

● **উৎপল দত্ত :**

য়ুরোপীয় নাট্যধারায় কমেডির একটি চিরন্তন কলাকৌশল হচ্ছে ছদ্মবেশ এবং পরিচয় ভ্রান্তি। ধ্রুপদী প্রহসনের কিছু শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক দৃশ্য এই সব কৌশলের প্রয়োগ সৃষ্ট হয়েছে — 'টু জেন্টলমেন অফ্ ডোরোনা'য়, 'টুয়েলফৎ নাইটে', এমন কি মার্চেন্ট অফ ডেনিসে'র শেষাংশে। গিরিশচন্দ্রও এই কৌশল অপূর্ব মুন্সিয়ানায় ব্যবহার করে গেছেন একাধিক বার। কিন্তু দীনবন্ধু বার বার এই কৌশল অবলম্ব করেছেন স্রেফ একটা ঐতিহ্য রক্ষা করতে। স্রেফ থিয়াটারি দাবি মেটাতে। গোঁজামিল দিয়ে নাটক শেষ করার জন্য। 'লীলাবতী'তে চাঁপাই দাড়ি এঁটে অরবিন্দ সেজে আসে, 'জামাই বারিকে' কামিনী আসে বৈষ্ণবী সেজে। 'কমলে কামিনী'তে ধুনির হাত সাফাইয়ে অন্য শিশু রাজপুত্রের পরিচয় বড় হতে থাকে।

এ সবের উল্লেখ শুধু বুর্জোয়া রাজনীতিরও সমাজ-প্রগতির অন্তঃসারশূন্যতা যিনি অবশেষে বুঝে ফেলেছেন, তিনি নাট্য-গঠনের প্রশ্নে বর্জোয়া অভ্যাসে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ছিলেন, সেই বিরোধটা না বুঝলে দীনবন্ধুকে বোঝা যাবে না। 'নীলদর্পণ' যে মোহমুক্তির অভিজ্ঞান, সেই মোহমুক্তির প্রক্রিয়াই প্রসারিত হয়েছে 'সধবার একাদশী' নাটকে; তাই সে নাটক এ সব থিয়েটার প্যাঁচ থেকে মুক্ত। এবং অন্যান্য নাটকগুলি যেহেতু গতানুগতিক বুর্জোয়া ভাবধারা মেনেই রচিত, তাই আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও সেগুলি কৃত্রিম থিয়েটারি কৌশলে ভারাক্রান্ত। 'সধবার একাদশী' 'নীলদর্পণ'- এর প্রতিবাদটাকেই অন্য শ্রেণির পরিবেশে বিকশিত করেছে। তাই এর বিদ্রোহ একাধারে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক দুই এলাকাতেই।

যথারীতি দীনবন্ধুর সমসাময়িক সমালোচকদের গোঁড়া তিলক-কাটা কপাল কুঞ্চিত হয়েছিল 'সধবার একাদশী'র চ্যালেঞ্জ শুনে। রামগতি ন্যায়রত্ন পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন :

'ইহার আদ্যোপান্ত কেবল বখামি ও মদের কথাতেই পরিপূর্ণ।'

লালবিহারী দে বা কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, কেউই নাটকটাকে সুনজরে দেখেননি। যাঁরা এ নাটকটার সদর্থক দিক খুঁজছেন তাঁরা সকলে একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন : 'নাটকটা দেখাচ্ছে মদ্যপানের ফলাফল কি ভয়ানক।' [যথা ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য

: সমালোচনা সাহিত্য (কলিকাতা ১৩৭০) পৃষ্ঠা ১৫০] অর্থাৎ মদ্যপান-নিবারণী সমিতির প্রচারকার্য হিসেবে নাটকটির কিছু সামাজিক মূল্য থাকতেও পারে, এই রকম একটা অনিচ্ছুক স্বীকৃতি। আমরা আগেই দেখেছি পিউরিটানদের নিরেট শিল্পবিরোধি তার গুরুভার ঐতিহ্য বুর্জোয়াদের নাট্যসমালোচনার ঘাড় নুব্জ করে রেখেছিল। ড্রাইডেনরা কমেডি বা প্রহসনকে সহ্যই করতে পারতেন না। যে-নাটক সমাজের মাস্টারি করে না, যাতে কোনো Moral নেই, সেই কোনও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বা আন্তবাক্যের গুরু গম্ভীর বিন্যাস, সে নাটক নেহাত চ্যাংড়ামি ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই 'সধবার একাদশী'কে মদ্যপানের কুফল বর্ণনার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে তাঁরা ভেবেছিলেন সমাজটা কাজের যেখানে প্রকৃতই আঘাত হানছে সেই ক্ষতস্থানটিকে চোখের আড়াল করে দেওয়া যাবে। সমাজ সংরক্ষণের তাগিদ এভাবেই অচেতনের ভেতরে কাজ করে। 'সধবার একাদশী'র আক্রমনটা ছিল এমনই শাণিত এবং তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধগুলি নাটকে এমনই হাস্যকর ও বিপজ্জনক রূপে প্রতিভাত হয়েছে সে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের আশঙ্কিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাই একদিকে নাটকটিকে বলা অন্যদিকে দীনবন্ধুকে মদ্যপানবিরোধী বামুন-ঠাকুর সাজাবার চেষ্টা।

আসলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র নিমচাঁদের মুখোমুখি হতে সাহসই করছিলেন না কেউ। নিমচাঁদ একাধারে হাস্যকর ও ট্র্যাজিক মহিমায় ভাস্কর। বুর্জোয়া কমেডি মোটামুটি হাসি-ঠাট্টা-ইয়ারকিতে আবদ্ধ থাকত, য়ুরোপের নূতন শিল্পবিরোধহীন বুর্জোয়া দর্শককে আনন্দ দেবার জন্য। ধ্রুপদি কমেডির সেটা ধাত ছিল না। প্রাচীন কমেডির মধ্যে অনেক সময়ই একটা চাপা বিষাদের-বিরহের রাগিনী ধ্বনিত হত বলেই সে সব কমেডি কালজয়ী হয়েছিল।

নিমচাঁদ এক ভীষণ মোহমুক্তির প্রতিচ্ছবি, একটা আস্ত সমাজের ভগ্ন মনোরথের বিধস্ত ছবি। ইংরাজি শিক্ষায় উদ্দীপ্ত যে ইয়ংবেঙ্গল, মিল্টন আবৃত্তি করতে করতে, টম পেইনের গ্রন্থ হাতে নিয়ে কড়া নাড়ছিল রেনেসাঁসের রুদ্ধদ্বারে। তাদের পরাজয় ও হতাশা এসে নিমচাঁদ জমাট বেঁধেছে। বাংলার রেনেসাঁস এক অলীক স্বপ্ন। নেশার রাজ্যে নিজেদের বন্দী করে এ-শ্রেণি ভুলতে চাইছে তাদের লজ্জাকর পরাজয়কে, ব্যর্থতাকে। যে মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের জন্ম ও পুষ্টি, সে সমাজ বন্ধ্যা, নিষ্ফলা। বুর্জোয়া প্রগতির লেশমাত্র তাদের স্পর্শ করেনি। অতি অগ্রসর ইয়ং বেঙ্গলরা পেছনে তাকিয়ে দেখছে বাকি সমাজটা বহু পেছনে সংস্কারের গারদের মধ্যে আটকে আছে। অগ্রসর-বাহিনীর সব যোগাযোগ ছিন্ন তার মাতৃ জঠর থেকে; কেউ আসেনি পেছনে। নিমচাঁদ সেই আশাভঙ্গের কাহিনী। সে এতদূরে এগিয়ে গেছে যে সে একা, আত্মীয় পরিজন বিহীন। তাই অবিরাম মদ্যপান-ব্যতীত তার একাকীত্বের জ্বালা ভুলবার আর কোনও উপায় নেই। 'সধবার একাদশী' মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচার নয়, সে সমাজ তার সর্বাগ্রসর ডিরোজিয়ানদের মদ খেয়ে চূর হতে বাধ্য করে সমাজের বিরুদ্ধে এক চিৎকার। তাই বলছিলাম এ নাটক সিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের পটভূমিকায় সেই বিষয়টাকেই আরও প্রাঞ্জল করছে, যা আমরা দেখেছি 'নীলদর্পণ'-এ কৃষক-বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে — বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যর্থ প্রত্যাশাও সে আশা-বিসর্জনে।

... নিমচাঁদে প্রকাশ পেয়েছে দীনবন্ধুর বিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমরা দেখেছি দীনবন্ধুর শৈশব-যৌবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। এ রকম মানুষই আসন্ন সমাজ-বিপ্লবে ন্যস্ত করে রাখে তার সব আশা-ভরসা। মাইকেলের বাল্য-পরিবেশে যে প্রাচুর্য। তারই ফলে হয়ত এ সমাজকে পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই জমিদার ও হিন্দুধর্মের অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি যতটা সচেতন ছিলেন, কলেজ থেকে বেরুনো সম্ভাব্য বিপ্লবীদের সম্পর্কে ততটা স্বপ্ন দেখেননি। কিন্তু নিমচাঁদ আমাদের দেখায় — দীনবন্ধুর কত সরল অকপট আশায় তাকিয়ে ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলদের দিকে। ডিরোজিয়ানদের দিকে। তারপর যখন সে আশা ধূলিসাৎ হল, তখনই দীনবন্ধুর বেদনাহত মর্মস্থল থেকে নির্গত হল নিমচাঁদের মতট্র্যাজিক চরিত্র। এবং স্রেফ-ঠাট্টা-ইয়ারকির বুর্জোয়া আঙ্গিকও এক নিমেষে পরিত্যক্ত হল; দীনবন্ধু সাবেক ধ্রুপদি ফর্মে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন কমেডিকে।

নিমচাঁদ ইয়ংবেঙ্গলদের বিধ্বস্ত প্রতিনিধি হয়ে ওঠে শুধু মিল্টন-শেকস্‌পিয়ার আউড়ে নয়, বিয়ে বাড়িতে সকলের দ্বারা প্রহৃত হতে হতে নিমচাঁদ অকস্মাৎ শক্ এর 'One human understanding' গ্রন্থের প্রসঙ্গ টেনে আনে। 'তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি' বলে তাকে ভয় দেখালে নিমচাঁদ বলে :

অনেক বৃষ পার করেছি এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগবে না।

নিমচাঁদ প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে সে গোমাংস খেতে অভ্যস্ত। আমাদের স্মরণ হয় ডিরোজিয়ানরা প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে কলকাতায় আলোড়ন ফেলেছিলেন। দিক্ষিণারঞ্জনের একটি বিখ্যাত বক্তৃতার বিষয় ছিল 'গোমাংসের উপকারিতা'। হিন্দুধর্মের প্রতি নিমচাঁদের বিতৃষ্ণাও ডিরোজিয়ানদের মনে করিয়ে দেয় : সে উপাসনা করে ক্লিওপাত্রার ছবি সামনে রেখে এবং মদের বোতলকে পত্নীত্বে বরণ করে। মা-কালীর পট যখন কলকাতার ঘরে ঘরে, তখন ক্লিওপাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিমচাঁদ মধ্যবিত্তর একটি প্রধান অবলম্বনে পদাঘাত করেছে। মধ্যবিত্তের সব মূল্যবোধকেই দীনবন্ধু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে দগ্ধ করেন এই নাটকে। ব্যর্থ স্বপ্নের জ্বালা বড় তীব্র, পার পায় না কেউ।

জীবনবাবু গোকুলকে বলেন, অটলকে সংশোধন করার একটিই উপায় আছে :

ওকে তোমার হৌসে নিয়ে হৌসের কাজ শেখাতে হবে। এবং অন্য এক দৃশ্যে অটলকে আদর্শ মানুষ দেখিয়ে বলেন — 'ওঁর মতন হ'। আচ্ছা অটল, তুই একবার ভেবে দেখ্ দিখি, এ কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, কেমন শান্ত, দেখে চক্ষু জুড়োয়।'

হৌসে একটি কেরানীর চাকরি বাগাতে পারলে তখন কলকাতার মধ্যবিত্ত গৃহে স্বর্গ হাতে পাওয়ার মত উদ্বাহু নৃত্য শুরু হয়ে যেত; আর কেনারাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যা হতে পারলে মধ্যবিত্ত মনে করত মানবজীবন সার্থক হল। হৌসে চাকরি কী হয় তার পরিচয়, ভোলা-চরিত্রে পরিস্ফুট; সকালবেলা দিশি মদ খেয়ে সে অনবরত অশ্রুতপূর্ব ইংরাজি উদগার করে এবং 'স্যার-স্যার' করতে করতে নিমচাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। আর কেনারামও কুখ্যাত, ... 'ঘটিরাম ডেপুটি', হাস্যকর এক মর্কট বিশেষ। এই হচ্ছে অটলের সামনে দুই আদর্শ পুরুষ।

... টাকা যে সমাজে শক্তির মাপকাঠি সেখানে নিমচাঁদ যে অটলকে মদ্যপানে ও বেশ্যাগমনে প্ররোচিত করে, এটা নিমচাঁদের একধরণের প্রতিশোধ। ভৃত্য দামা যেমন বাবুরা অচেতন হয়ে পড়লে পয়সা চুরি করে। নিমচাঁদের কার্য-কলাপ তারই এক উচ্চতর পুনরাবৃত্তি।

নিমচাঁদের এ-সমাজে কোনও পদমর্যদা নেই। সে হৌসে চাকরি করে না, ডেপুটি ম্যাজিস্রেটি করে না। তার কোনও ঠিকানাই নেই; সে ঘোষদের বাড়িতে আশ্রিত ... এর ওর কাছ থেকে মদ্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে যে, সে হতে পারত দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।

... মধ্যবিত্ত-বিবাহের বিরাট প্রতারণাটা নিমচাঁদ ধরে ফেলেছে। ছাগল, গর্দভদেরও জামাই করতে তারা প্রস্তুত, ভোলাও যেন কার 'সান ইন লা', ঘটিরামও এক আদর্শ মানুষ। এ সমাজের পদমর্যদা হচ্ছে টাকা। নিমচাঁদের তা নেই। সুতরাং তার কোনও ঘরও নেই, নেই আর কোনও বন্ধন। এ সমাজের সঙ্গে মানুষের একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে টাকা। তা নিমচাঁদের নেই, সুতরাং সে নিজেকে সমাজের একজন বলেই আর বিবেচনা করে না। সেই বাইরে থেকে এ সমাজের দেহে মাধ্যমত মুষ্ট্যাঘাত হেনে চলেছে, প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। তার মদ্যপান এ ভবঘুরে স্থিতিস্থাপকতাহীন জীবন এক বৌদ্ধিক সমাজদ্রোহিতা যা দীনবন্ধুর সমাজ বরদাস্ত করতে পারেনি আদৌ।

... নিমচাঁদের সব লক্ষ্যটাই সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ, যে সমাজ অর্থের দম্ভে নিমচাঁদের বিশাল পাণ্ডিত্যকে অবজ্ঞা করেছে, সেই সমাজকে নাস্তানাবুদ করেই নিমচাঁদের জীবনের যা আনন্দ, মদ খেয়ে তার যে নেশার আনন্দ। তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে সমাজিক সংস্কারকে অস্বীকার করার উল্লাস। এই যে পরিত্যক্তা বিরহিনী স্ত্রীর উল্লেখ নিমচাঁদ করেছে এবং দৃশ্যান্তরে অটল এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই নিমচাঁদ ম্যাকবেথের ভাষায় আর্তনাদ করে উঠেছে : 'Thou sticket a dagger in me!' শুধুমাত্র এর ওপর নির্ভর করে এক বিশিষ্ট নাট্যবিশেষও লিখেছেন :

নিমচাঁদের সমস্ত আচরণের মধ্যেই তাহার জীবনের এই প্রছন্ন বেদনায় অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাইয়াছে।

[আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ ম খণ্ড (কলিকাতা ১৯৬০), পৃ: ১৭০]

যদিও বিশেষজ্ঞ স্বীকার করেন আভাসটা 'অস্পষ্ট' মাত্র। ঠিক কথা, এটিকেই যদি নিমচাঁদের চারিত্রিক বিপর্যয়ের কারণ ও প্রেরণা হিসেবে আনতে চাইতেন নাট্যকার, তাহলে এত অস্পষ্ট করে রাখতেন না আভাসটাকে। এটিকে স্বেচ্ছায় পশ্চাদপটে ঠেলে দিয়ে দীনবন্ধু অন্য কারণগুলিকে এনেছেন সামনে। পত্নীর দুঃখের উল্লেখ যেখানে নিমচাঁদ করছে, সেই ভাষণেই হতাশ, পিতামাতার শোকও সে বর্ণনা করছে। অর্থাৎ আত্মীয়-পরিজনরা সবাই তাকে ঘৃণা করে, এটাই নিমচাঁদের ব্যাপ্ত বক্তব্য। তার মধ্যে আলদা করে পত্নীর বুক ভেঙে যাওয়ার ঘটনাকে বিশেষভাবে চিহ্নিতই করা যায় না। অনেক ছোট ছোট ঘটনায় একটা মানুষের মানস গঠিত হয়। সেগুলি ছড়ানো রয়েছে নিমচাঁদের অসুবিধা

না হয়, তাই কোনও বিশেষ একটি ব্যক্তিগত দুঃখকে স্পষ্ট হতে দেননি দীনবন্ধু। নিমচাঁদে Tragedy ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। একটি শ্রেণির অধঃপতন। একটি শ্রেণির আত্মহত্যা হচ্ছে এ ট্র্যাজেডির কারণ। এটাই মূর্ত হয় যখন অটল নারীর খোঁজে নিজের পত্নীকেই অপহরণ করার ব্যবস্থা করে। এ শ্রেণি নিজেকেই বাব বার আঘাত করে অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে নাটকের রায়।" [ সংক্ষিপ্ত 'আশার ছলনে ভূলি' প্রথম প্রকাশ - ৩১ আগস্ট, ১৯৯৩]

## ৭.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। 'সধবার একাদশী' নাটকের কাহিনি বিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। 'সধবার একাদশী' নাটকের ঘটনা-সংস্থাপন ও climax কীভাবে এগিয়েছে বিশ্লেষণ করুন।

৩। 'সধবার একাদশী' নাটকের নাট্যপরিণতি বিচার করুন।

৪। 'নীলদর্পন' ও 'সধবার একাদশী' তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৫। 'সধবার একাদশী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিশ্লেষণ করে দেখান।

৬। 'সধবার একাদশী' নাটকের নায়ক চরিত্র কে? বিচার করুন।

৭। 'নিমচাঁদ ও অটল একই ভাবনার দুটি দিক।' মন্তব্যটির সারসত্তা প্রমাণ করুন।

৮। 'সধবার একাদশী' নাটকে টাইপ চরিত্রগুলোর ভূমিকা আলোচনা করুন।

৯। 'সধবার একাদশী' নাটকের নারী চরিত্রগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

১০। 'সধবার একাদশী' নাটকে হাস্যরসের প্রয়োগ কীভাবে ঘটেছে, বোঝান।

১১। 'সধবার একাদশী' নাটকটি প্রহসন কিংবা কমেডি কিংবা সমাজচিত্র, আপনার আলোচনার সপক্ষে যুক্তি দেখান।

১২। 'সধবার একাদশী' নাটকে নারীদের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৩। টীকা লিখুন।

(ক) অটলবিহারী, (খ) রামমাণিক্য, (গ) ভোলাচাঁদ, (ঘ) কাঞ্চন, (ঙ) নকুলেশ্বর

## ৮.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


১। সধবার একাদশী — সম্পাদনা : নির্মলেন্দু ভৌমিক

২। সধবার একাদশী — সম্পাদনা : সমরেন্দ্রকুমার জানা

৩। নীলদর্পণ : পাঠ সমীক্ষা — তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা — অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল

৫। বাংলা নাটকের ইতিহাস — অজিতকুমার ঘোষ

৬। লিটারেচার অফ বেঙ্গল — রমেশচন্দ্র দত্ত

৭। বাংলা সাহিত্যে নরনারী — প্রথমনাথ বিশী

৮। আশার ছলান ভুলি — উৎপল দত্ত

৯। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — সুকুমার সেন।

* * *

## বিভাগ- ৯
## বিবিধ প্রবন্ধ
### বিবিধ প্রবন্ধ : প্রসঙ্গ-কথা ও পটভূমি

**বিষয় বিন্যাস**


৯.০ ভূমিকা (Introduction)

৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৯.২ বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্কিম মননের আলোকে

৯.৩ বিবিধ প্রবন্ধ প্রবন্ধের শ্রেণিকরণ

৯.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৮.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৯.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৯.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


### ৯.০ ভূমিকা (Introduction)

আমাদের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্য যতটা চর্চিত হয়েছে, সেই তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযের জীবন ও সাহিত্য ততটা চর্চিত হয়নি। আসুন এই অংশে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্য রচনার সূচনা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ বিশেষভাবে অনুধাবন করতে ও তার সঠিক মূল্যায়নে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণা থাকা দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ১২৪৫ ঘালের ১৩ আষাঢ়. ইংরেজি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চার ভাই ও এক বোন। তাঁর এই চার ভাইয়েরা হল যথাক্রমে শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র এবং তাঁর বোনের নাম নন্দরানি। যাদবচন্দ্র অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অত্যন্ত রুচি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ও অনুজ পূর্ণচন্দ্রও সাহিত্যচর্চা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাত্র পাঁচবৎসর বয়সেই বঙ্কিম শৈশব শিক্ষা শেষ করেন। হুগলি কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। ছাত্র জীবনেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় কবিতা

লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা শুরু হয় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকেই। এই গদ্য শিরোনামহীন ছিল এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী চারবছরে 'সংবাদ প্রভাকর', 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের পনোরোটি কবিতা এবং দুটি গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'ললিতা'। পুরাকালিক গল্প তথা। মানস এটি একটি কবিতাগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ আগষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র যশোহবের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে থেকে যে সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর দু-বছর পূর্বে তার সমাপ্তি ঘটে। এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কর্ম জীবনের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে তিনি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। তাঁর এই নিরলস প্রয়াসে বাংলা সাহিত্য নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজগতে সদর্প আবির্ভাব উপন্যাস নিয়ে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'রাজমোহনস ওয়াইফ' ইংরেজিতে লেখা। এটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী, প্রকাশকাল ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। তারপর একে একে বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭২), 'যুগলাঙ্গুবীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'রাধারাণী' (১৮৮৬), 'সীতারাম' (১৮৮৭) এই সর্বমোট চৌদ্দখানি উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল শুক্রবার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'ভ্রমর' (১৮৭৪) পত্রিকাটিও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনা প্রসূত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি আলোচনা প্রসঙ্গে যদিও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আমাদের প্রথমে মনে আসে, তবে বঙ্কিম প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে মননধর্মিতা ও চিন্তার গভীরতা উপন্যাসের নির্দিষ্ট শিল্পপ্রকরণের জন্যে ফুটে ওঠার সুযোগ পায়নি, প্রবন্ধেগুলোর মধ্যে তার সার্বিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে থেকেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করতে শুরু করেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত ঘটে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবর্গ, রামমোহন রায় প্রমুখের হাত ধরে 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮ খ্রি:), 'দিগদর্শন' (১৮১৮খ্রি:) থেকে 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) এই সাময়িক পত্রিকাগুলোতে বাংলা গদ্য ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছে এবং চিন্তাশীল প্রবন্ধ সাহিত্য মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তার বিজয় অভিযান শুরু করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তীকালে ও সমসাময়িককালে যারা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, (১৭৬২-১৮১৯) রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩),

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮১৩-১৮৮৫) , ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) , দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) , বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০) প্রমুখ। তবে প্রবন্ধ সাহিত্যের সমস্ত স্বধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ আলোচনার পূর্বে 'প্রবন্ধে' সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেওয়া আমাদের উচিত । 'প্রবন্ধে' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'থেকে আরম্ভ করে কাশীরাম দাসের মহাভারতে 'প্রবন্ধ' শব্দের উল্লেখ ও শব্দটির দ্বারা বিশেষ কৌশল বা উপায় বুঝনো হলেও উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 'প্রবন্ধ' শব্দটির দ্বারা যুক্তি চিন্তা-শৃঙ্খলার দ্বারা নিবন্ধ গদ্যরচনাকে বুঝানো হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য সর্বপ্রথম সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। প্রবন্ধের প্রকৃষ্টরূপে বন্ধনের মধ্যে স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা, যুক্তিবাদিতা থাকা যেমন দরকার, তেখনি প্রবন্ধের বক্তব্যকে রসমণ্ডিত করে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে। এই দুইদিকের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটলে প্রবন্ধ যথার্থ সাহিত্য পদ বাচ্য হয়ে ওঠে। বঙ্কিম পূর্ববতীকালের অধিকাংশ প্রাবন্ধিকের রচনায়ই এই দুইদিকের ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। অনেকের প্রবন্ধে হয়তো পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণ দক্ষতা ও যুক্তিনিষ্ঠার অভাব হয়নি কিন্তু বক্তব্য রসে মণ্ডিত হয়ে। উঠতে পারেনি। ফলে সেই প্রবন্ধ যেরকম পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না, তেখনি সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতেও পারে না। তাঁদের মধ্যে অনেকে বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবন্ধকে অলঙ্কার বহুল ধ্বনি ও শব্দবিন্যাসে অতিরিক্ত মাত্রায় কাব্যিক করে তুলে মূল বক্তব্যকে গৌণ করে ফেলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইদিকের ভারসাম্য বজায় রেখে তাঁর বক্তব্যকে যথার্থ প্রবন্ধ করে তুলেছেন। মনে হয় বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে এই দুইগুণের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে। বঙ্কিম পূর্ববতীকালে যাঁরা গদ্য রচনা করেছেন তাঁদের রচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল উদ্দেশ্যমূলক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার প্রমুখ অধিকাংশ লেখক বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের গদ্য রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। প্রাবন্ধিকের মননশীলতা, জ্ঞানের গভীরতা, আত্মপ্রত্যয় যুক্তিধর্মিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রবন্ধটিকে তার নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছে দেয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সচেতনভাবে যুক্ত হয়েছিল সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠা পূরণের জন্যে এবং জাতির সঙ্কটের দিনে তাদের মোহমুক্তির উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনা করলেও এই প্রয়াসের পেছনে ছিল সাহিত্যিক বঙ্কিমের সারস্বত সাধনা । তাই তাঁর প্রবন্ধ উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হল ১। 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) ২। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) ৩। 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫) ৪। 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) ৫। 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১৮৭৭), ৬। 'সাম্য' (১৮৭৯), ৭। 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), ৮। 'কৃষ্ণচরিত্র' ১ম ভাগ' (১৮৮৬), ৯। 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) ( ১৮৯২), ১০। 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম ভাগ (১৮৮৭), ১১। ধর্ম্মতত্ত্ব ১ম ভাগ (অনুশীলন) (১৮৮৮)

ও ১২। 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২ য় ভাগ (১৮৯২)। এই গ্রন্থগুলো ছাড়াও পুস্তককারে অপ্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের আরো কিছু প্রবন্ধ ছিল, যেগুলো পরবর্তীকালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর উদ্যোগে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া ও তাঁর 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ-পুস্তক' - এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থদ্বয়ের প্রবন্ধগুলো অপেক্ষাকৃত লঘু কৌতুক ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ও স্বদেশ চিন্তামূলক ভাবনা যেগুলোতে পুরোমাত্রায় বজায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মননশীলতা ও ভাবগম্ভীর যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থের সূচনা ঘটেছে 'বিজ্ঞান-রহস্য' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকেই।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

'প্রবন্ধ' শব্দের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করুন এবং প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্টতার পরিচয় দিন। (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ৯.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধগুলো আলোচনার গুরুতে আমরা এই আলোচনা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমাদের বিষয়বিন্যাসে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করব। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের মূল প্রবন্ধ সংখ্যা ৩৮। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ দুই ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ প্রথমভাগ ' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয়ভাগ ' একত্র করে 'বিবিধ প্রবন্ধ ' প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে আগাগোড়া বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার স্বচ্ছতা অনুভব করা যায়। যে বিষয় নিয়েই তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন না কেন সেখানেই তাঁর সেই বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির কারণেই কোনো প্রবন্ধের কোথাও তাঁর সামান্যও দ্বিধান্বিত মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধগ্রন্থে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

আলোচ্য এই অধ্যায়ে বিষয় বিন্যাসে উল্লিখিত অংশগুলো নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলো সম্বন্ধে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে পারবেন—

- বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন তাঁর পূর্ববর্তী প্রাবন্ধিক,
- প্রবন্ধের সংজ্ঞা
- 'বিবিধ প্রবন্ধ ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো রচনাকালে বঙ্গদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বঙ্কিম মানসিকতা।
- 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস।

## ৯.২ বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্কিম মননের আলোকে

এইবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তভুর্ক্ত প্রবন্ধগুলো আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধ রচনার অন্তরালে যে সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং তাঁর মনন ও চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল যে সম্বন্ধে আলোচনা করব। বাংলা সাহিত্যে মুদ্রণ যন্ত্র, সাময়িক পত্র ও গদ্য হাত ধরাধরি করে এসেছিল। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ভাবধারা বাঙালি সমাজে এক তরঙ্গমুখর ভাব বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছিল। পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বাঙালি মানসকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় স্নাত হয়ে একদল যথার্থ অর্থেই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবনা-চিন্তা-জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁদের জীবনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল এবং নিজেদের সমাজকে উন্নত করার জন্যে তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে অন্য একটি দল শিক্ষিত হয়ে ওঠে স্বকীয় ঐতিহ্য থেকে চ্যুত হয়ে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকেই জীবনের অমোঘ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। পরধর্ম তাদের কাছে মোহনমূর্তিতে আবিভূত হয়েছিল এবং বিজাতীয় ভাবনায় নিজেদের সমাজকে ভিন্ন ধারায় পরিচালিত করার ব্রত যেন তারা গ্রহণ করেছিল। এই তথাকথিত শিক্ষিত মহলের মধ্য একদিকে যেমন যুক্তিবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা লক্ষ করা যায়, অন্যদিকে তেখনি অসংযত ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁদের স্বধর্ম থেকে যে চ্যুত করে তুলেছিল। তাও লক্ষিত হয়। পরাধীন জাতির পক্ষে এই বিশেষ গোষ্ঠী এক সঙ্কটকালতৈরি করেছিল। এই সঙ্কট সময়ে মানুষের বিচার বুদ্ধি যখন ভ্রান্ত, চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন, ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত, তখন সেই জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশ করার জন্যে একজন মহান ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। বাঙালি জাতিকে তাঁর সাহিত্য কর্মের দ্বারা সঠিক পথ নির্দেশ করতে এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ নিবন্ধে তাঁর মননশীল চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ আমরা পাই যার দ্বারা বাঙালি নিজের স্বক্ষেত্র ফিরে পাওয়ার সূত্র খুঁজে পেয়েছিল।

বাঙালি পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পরিচয় ঔপন্যাসিক রূপে। উপন্যাসের বিশেষ একটা শিল্পরূপ রয়েছে আর সেখানে কল্পনা শিল্প মনের আধিক্য থাকায় লেখক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক সেকারণেই তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা-মতাদর্শ উপন্যাসে নিয়ে আসতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রথম থেকেই জীবন ও জীবন স্বরূপের রহস্যচিন্তা, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের

সম্পর্ক প্রভৃতি ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। বঙ্কিম উপন্যাসে বিশেষ তত্ত্বের অবতারণাও করেছিলেন। তবে শিল্পধর্মের নিয়মে সেই ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন মননশীল এবং চিন্তামূলক ভাবনা প্রবন্ধ জাতীয় রচনায়ই তার সার্বিক বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই জাতির সঙ্কটের দিনে জাতি গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও তত্ত্বাদর্শকে বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতরাম' (১৮৮৭) রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাত বছর আর কোনো উপন্যাস রচনা করেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। যথার্থ সাহিত্য চর্চা তথা মননশীল প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশের অভিপ্রায়ে তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন। তাই পত্রিকার পৃষ্ঠাপূর্তির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন যাঁদের রচনার দ্বারা 'বঙ্গদর্শন' সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 'বঙ্গ দর্শন' এর প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিম ছিলেন অন্যতম। বঙ্কিমের বহু প্রবন্ধ এই বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমদিকে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে অপেক্ষাকৃত লঘু বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গিতে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে এই প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোতে পরিহাস ও ব্যঙ্গের ছলে যে আপাতলঘু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলো হালকা মেজাজের রচনা হলেও জীবনের দাবি পূর্ণ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থের সঙ্গে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোতে বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষণীয় এবং সব প্রবন্ধই গুরু গম্ভীর বিষয় নিয়ে রচিত। সব প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিন্তা, ইতিহাস চেতনা, স্বদেশ, স্বজাতি, স্বসমাজ সম্বন্ধে ভাবনা এই প্রবন্ধগুলোতে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতির চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। কিন্তু গুরু বিষয়ে নিয়ে আলোচনা মননশীলতা, যুক্তিনির্ভর ভাবনা প্রকাশ উপন্যাসে সম্ভব নয়। তাই খ্যাতির প্রলোভন ত্যাগ করে বঙ্কিম দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রবন্ধ রচনায় আত্ম নিয়োগ করেন। যদিও উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধ গদ্যের আপাত নীরস মাধ্যম। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের রচনাগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডিত্য, যুক্তিবোধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসসৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছেন। বক্তব্যকে প্রধান করে তুলতে গিয়ে পাণ্ডিত্যের অযথা প্রকাশ তিনি ঘটাননি । শুধু সাহিত্য নয়, ইতিদাস, ধর্ম, দর্শন,প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এই সব বিষয়গুলোই বঙ্কিমের প্রতিভার স্পর্শে যথার্থ মননশীল ও রসগ্রাহ্য প্রবন্ধ হয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধ গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। এই প্রবন্ধগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্রে গবেষণাধর্মী মনোভাবের পরিচয় ফুটে হয়েছে। আবেগ বিহ্বল অযৌক্তিক ভাবনা চিন্তাকে তিনি তাঁর কোনো প্রবন্ধেই স্থান দেননি। তাঁর বহু প্রবন্ধে উল্লেখ করে নিজস্ব মতামতের পাশে বিদেশী পণ্ডিত ও ইতিদাসবিদদের মতামত উল্লেখ করে তাঁর প্রবন্ধটিকে মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলেছেন।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

বঙ্কিমের প্রবন্ধ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার বিচার করুন? (১০০ শব্দের মধ্যে)

---

---

---

---

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

---

---

---

---

## ৯.৩ বিবিধ প্রবন্ধ : প্রবন্ধের শ্রেণিকরণ

এইবার আমরা 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর বিভিন্ন শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থটি দুইভাগে প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ' এর প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ ।পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো একত্র করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। এতে মোট ১৬ টি প্রবন্ধ ছিল। এই প্রবন্ধগুলো হল —

১. উত্তর চরিত ২. গীতিকাব্য ৩. প্রকৃত ও অপ্রকৃত ৪. বিদ্যাপতি ও জয়দেব ৫. আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প ৬. দ্রৌপদী ৭. অনুকরণ ৮. শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা ৯. বাঙ্গালীর বাহুবল , ১০. ভালোবাসার অত্যাচার, ১১. জ্ঞান ১২. সাংখ্য দর্শন ১৩. ভারতকলঙ্ক ১৪. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, ১৫. প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ১৬. প্রাচীনা ও নবীনা।

এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিছু প্রবন্ধ 'প্রচার' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। এতে মোট প্রবন্ধ সংখ্যা ২২। প্রবন্ধগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হল—

১. ধর্ম এবং সাহিত্য ২. চিত্তশুদ্ধি ৩. গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি ৪. কাম ৫. বাঙ্গালার নব্য লেখকাদিগের প্রতি নিবেদন ৬. ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে,

৭. বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা ৮. সঙ্গীত ৯.বঙ্গদেশর কৃষক ১০. বহুবিবাহ ১১. বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার ১২. বাঙ্গালা শাসনের কল ১৩. বাঙ্গালার ইতিহাস ১৪.বাঙ্গালার কলঙ্ক ১৫. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১৬. বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, ১৭. বাঙ্গালীর উৎপত্তি ১৮. বাহুবল ও বাক্যবল ১৯. বাঙ্গালা ভাষা ২০. মনুষ্যত্ব কি? ২১. লোকশিক্ষা ২২. রামধন পোদ।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন তখন প্রবন্ধগুলোর কোনো শ্রেণি বিভাগ করেননি। কিন্তু প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্য রয়েছে। সেই বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে প্রবন্ধগুলোকে আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি।

১. সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পবিষয়ক ২. ইতিহাস বিষয়ক ৩. ধর্ম ও দর্শন বিষয়কও ৪. শিক্ষা সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক।

এবার আমরা এই শ্রেণিসমূহের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলোর নাম উল্লেখ করছি —

১. সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পবিষয়ক : উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, সঙ্গীত, আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প, শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা, ধর্ম এবং সাহিত্য, বাঙ্গলার নব্য লেকদিগের প্রতি নিবেদন, বাঙ্গালাভাষা ইত্যাদি।

২. ইতিহাস বিষয়ক : ভারতকলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এং পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙ্গালা শাসনের কালে, বাঙ্গালার ইতিদাস, বাঙ্গলার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ইত্যাদি।

৩. ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ : ভালোবাসার অত্যাচার, কাম, জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, চিত্তশুদ্ধি, গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি, ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, মনুষ্যত্ব কি! প্রভৃতি।

৪. শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ : অনুকরণ, বাঙ্গালীর বাহুবল, প্রাচীনা ও নবীনা, তিনরকম, বহুবিবাহ বাহুবল ও বাক্যবল, রামধন পোদ, দ্রৌপদী ও বঙ্গদেশের কৃষক।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোকে কটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

---

---

---

---

## ৯.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বাংলাসাত্যের একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জুন চব্বিশ পরগণাজেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনার সূত্রপাত হয় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যথার্থ রূপ লাভ করে। যুক্তিনিষ্ঠতা ও রসসৃষ্টি, যে দুই গুণের দ্বারা প্রবন্ধ বিশেষ রূপ লাভ করে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তার সুষ্ঠু প্রকাশ আমরা দেখি। উনিশ শতকে বাঙালি যখন বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে দিকভ্রান্ত বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় তাঁর প্রবন্ধগুলোর দ্বারা বাঙালিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের প্রবন্ধগ্রন্থ 'লোক রহস্য' 'কমলাকান্তের দপ্তর' এ জীবনের গভীর ভাবনা প্রকাশিত হলেও সেগুলি অনেক সময়েই লঘু সুর ও রঙ্গব্যঙ্গ প্রধান হয়ে উঠেছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' -এ কিন্তু বঙ্কিমের হালকা মেজাজের পরিচয় নেই। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে তিনি সেখানে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থটি দুইভাগে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ভাগ' এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে 'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত । এই প্রবন্ধ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধগুলোকে আমরা প্রধানত চারভাগে বিভক্ত করতে পারি :

১. সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পবিষয়ক

২. ইতিহাস বিষয়ক

৩. ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক

৪. শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক

সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে রয়েছে 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'সঙ্গীত', 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প ' ইত্যাদি।

ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলো হচ্ছে 'ভারতকলঙ্ক', 'ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা','বাঙ্গালার ইতিদাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ইত্যাদি।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ হচ্ছে 'ভালোবাসার অত্যাচার', 'জ্ঞান', 'চিত্তশুদ্ধি' ইত্যাদি।

শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ হচ্ছে, 'অনুকরণ', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'বহুবিবাহ', 'বঙ্গদেশের কৃষক' ইত্যাদি।

## ৯.৫ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

**বঙ্গদর্শন :** 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের হিতার্থে একমাসি পত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১ লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রাবন্ধিক, কবি এবং লেখকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই মাসিকপত্র ধারাবাহিকভাবে চারবছর প্রকাশিত হয়। ১২৮৩ এর চৈত্রসংখ্যার পর বঙ্গদর্শনের আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।

## ৯.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

এই বিভাগের আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্নগুলি দ্রষ্টব্য।

## ৯.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

দ্বাদশ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ- ১০
## বিবিধ প্রবন্ধ
### বিবিধ প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ - ১

**বিষয় বিন্যাস**


১০.০ ভূমিকা (Introduction)

১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১০.২ বিদ্যাপতি ও জয়দেব

১০.৩ শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা

১০.৪ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

১০.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১০.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

১০.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১০.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১০.০ ভূমিকা (Introduction)

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে তাঁর গভীর রসবোধ এবং সেইসঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী মনোভাবের পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন সব্যসাচী। কারণ বঙ্গিমচন্দ্র একইসঙ্গে সাহিত্য রচনা ও সাহিত্য সমালোচনা করে গেছেন। বাংলাসাহিত্য রঙ্গলালই সর্বপ্রথম কাব্যালোচনা ও সমালোচনার সূত্রপাত করেন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বাটন সোসাইটিতে হরচন্দ্র দত্ত ইংরেজি কাব্যের তুলনায় ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিদের কাব্যের অপকারের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। রঙ্গলাল এতে খুবই মর্মাহত হন এবং তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'- এ বাংলা কাব্যের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ঈশ্বর গুপ্তও তাঁর 'কবিজীবনী'তে তাঁর সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের পরিচয় দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে তাঁর সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃত গ্রন্থ ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' -এ তাঁর নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মূলত তাঁদের পথ ধরেই সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনা অগ্রসর হন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ক অনেকগুলো প্রবন্ধ রয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো নিয়ে তিনি আলদা কোনো প্রবন্ধ সংকলন করেননি। তাঁর এই ধরনের প্রবন্ধগুলো মূলত তাঁর

'বিবিধ প্রবন্ধ'- গ্রন্থের প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। প্রথমত সাহিত্য রূপকল্প বিষয়ক দ্বিতীয়ত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক। সাহিত্যের রূপকল্প বিষয়ক প্রবন্ধগুলো হল গীতিকাব্য, প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত, সঙ্গীত, বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন। সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো হল উত্তরচরিত, শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা, বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে প্রভাবিত হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম সাহিত্যের প্রকৃতি ও উপাদান নিয়ে সাহিত্যালোচনায় ব্রতী হন। তবে প্রাচ্য সাহিত্যাদর্শকেও তিনি অস্বীকার করেননি। এ-বিষয়ে সমালোচকের অভিমত গ্রহণ যোগ্য। প্রাচ্য নির্দেশ এবং পাশ্চাত্য অভিমতকে তৌল করে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করাই তাঁর সমালোচনার প্রধান উদ্যম হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত (সমালোচনার দুই পর্ব: বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ, ড° জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসঙ্গী, সংযোজিত ২য় সংস্করণ পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শের প্রবক্তা অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ীই বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যের দুটি প্রবণতা সৃষ্টিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। একটি সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং অপরটি স্বভাবানুকারিতা। আবার রসসৃষ্টিকে সাহিত্যেক প্রধান উদ্দেশ্য স্বীকার করেও প্রাচ্য আলংকারিকরা রসের বিচিত্র দিকের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে যে সংখ্যার হিসেব দিয়েছেন সেখানে শ্রেষ্ঠরস হিসেবে শৃঙ্গাররসের স্বীকৃতিতেও তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তবে সাহিত্য চতুর বর্গ ফলপ্রাপ্তির ক্ষেত্র হিসেবে মেনে নিতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। ... কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন- চিত্তশুদ্ধিজনন।" এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলো এক বিশেষ স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলো মূলত বুদ্ধিবৃত্তি কেন্দ্রিক এবং একারণে প্রবন্ধগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতারই পরিচয় পাই, অন্তরঙ্গতার স্পর্শ সেখানে তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু তাঁর সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলো বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তির দ্বারা অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছে। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রাণতা সেগুলোকে সরস ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

## ১০.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আমরা ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের আলোচনার গ্রন্থের প্রসঙ্গ-কথা ও পটভূমি সমাপ্ত করেছি। এখন আমরা এই গ্রন্থের নির্বাচিত তিনটি প্রবন্ধের আলোচনা আরম্ভ করব। এই বিভাগে আমরা 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রবন্ধের আলোচনা করব। সেগুলি হচ্ছে ১. বিদ্যাপতি ও জয়দেব, ২. শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা, ৩. বাঙ্গালার নব লেখকদিগের প্রতি নিবেদন।

## ১০.২ বিদ্যাপতি ও জয়দেব

যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ পারম্পর্যে বিশ্বাস করতেন। সাহিত্য যে কোনো দেশের কার্যকরণ সূত্রে সৃষ্টি হয় এই তত্ত্বে বিশ্বাস রেখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে সাহিত্যসৃষ্টির এই বিশেষ দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই প্রবন্ধে একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলাদেশের গীতিকাব্যের স্থূল লক্ষণগুলো সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন।

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে গীতিকাব্যে রচিত হয়েছে। জয়দেব বাংলাদেশের এই বিশেষ শ্রেণির কাব্যের প্রণেতা। জয়দেব লক্ষণ সেনের রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ'। পরবর্তীকালে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিগণও গীতিকাব্য রচনা করেন। জয়দেবের সময়কাল অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের 'গীতিগোবিন্দ' থেকে বাংলাদেশে যে গীতি কাব্যধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ভারতচন্দ্র কবিওয়ালাদের যুগকে অতিক্রম করে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। জয়দেবে 'গীতিগোবিন্দ', বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিদের বৈষ্ণব পদসমূহ, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস প্রমুখ কবিওয়ালাদের কিছু কিছু গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গীতিকাব্যের পর্যায়ভুক্ত। প্রবন্ধের সূচনায় এভাবে উদাহরণ সহযোগে গীতিকাব্যের নির্দিষ্ট শ্রেণিনির্দেশ করে বঙ্কিঁমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির কার্যকরণ সূত্রের গভীরে প্রবেশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন এই পৃথিবীতে কারণ ছাড়া কোনো কার্যই ঘটে না সবকিছু নিয়মের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সহজ-সরল অতিপরিচিত উদাহরণের দ্বারা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। জল যে রকম পৃথিবীর অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বাষ্প, কখনো বৃষ্টি, কখনো শিশির, কখনো হিমকণা, কখনো বরফ, কখনো বা কুয়াশায় পরিণত হয়, সাহিত্যও তেমনি অবস্থা বিশেষে নিজের রূপ পরিবর্তন করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারণার পেছনে রয়েছে তাঁর পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে গড়া মানসিকতা। পাশ্চাত্যের কার্যকারণ সূত্র এখানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। পসিটিভিস্টদের মতো তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতে সাধারণ নিয়মকেই স্বীকার করেছেন। নিয়মের ফলেই সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে থাকে। সে কারণে সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হয়ে রূপান্তরিত হয়। কোনো বিশেষ বিশেষ দেশের সামাজিক অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী যে ভাবে রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ দেখা যায়, সাহিত্যেও সেই একই কারণে প্রকারভেদ ঘটে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের এই যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়ে তিনি ইউরোপীয় হিতবাদ-মতপ্রিয় বক্‌লের সঙ্গে একমত। ভারতীয় সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি এবং গীতিকাব্য সৃষ্টির মূলে এই সমাজ ও জাতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বিশেষ অভিমত এই প্রবন্ধে যুক্তিসহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং এই বিশেষ কারণেই ভারতীয় সাহিত্যের স্থূল লক্ষণসমূহ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সাহিত্যের স্থূল লক্ষনসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্যের উল্লেখ করেছেন। এই রামায়ণ সৃষ্টির মূলে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন আর্য-অনার্যের বিবাদ। ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বীর আর্যজাতি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের কাছে বাধা পেলেও অতি সহজে তাদেরকে পরাজিত করে। আর্য-অনার্যের সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রামায়ণ রচিত বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন আর্যরা তখন বীরস্বভাব সম্পন্ন ছিল আর সেকারণেই রামায়ণের প্রধান চরিত্র রামচন্দ্র মহাবীর এবং গম্ভীর ও ধৈর্যপরায়ণ চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত হয়েছেন। এখানে রামচরিত্রে জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। ভবভূতির 'উত্তর চরিত' এবং রামচরিত্র কোমলপ্রকৃতির। এর কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তর চরিত' নিবন্ধে বলেছিলেন ভবভূতির সময়ে আর্যচরিত্রের পতন ঘটেছিল এবং সেকারণে ভোগাকাঙ্ক্ষা ও অলসতার জন্যে রামচরিত্র কোমল প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল। রামায়ণের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাব্য হচ্ছে 'মহাভারত'। 'মহাভারত' মহাকাব্য। এই কাব্যে জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। আর্যরা ভারতবর্ষে এসে অনার্যদের পরাভূত করে ভারতবর্ষকে তাদের করতলগত করেছে। এখন তারা শত্রুভয়মুক্ত ও আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষকে ভোগ করতে গিয়ে তারা নিজদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলস্বরূপ রচিত হয়েছে মহাভারত। মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধের মধ্যে সমকালীন ভারতবর্ষের এই যুগচিত্র ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে পেয়েছেন। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। তাই এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বীর পাণ্ডবেরা। তারা এই বৃহত্তর ভারতের অধীশ্বর হয়ে মুখে-শান্তিতে রাজ্যশাসন করতে থাকে। এবার এই বীরজাতি দেশের সম্পদ, শ্রী এবং সভ্যতা বৃদ্ধি করার জন্যে ব্যবসা-বানিজ্যে মন দিল। রোম থেকে যবদ্বীপ হয়ে চীন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যতরী ছুটে চলল। সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধিতে তারা নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করতে লাগল। তারা সুখী এবং কৃতী। এবং এই সুখও কৃতিত্বেন ফলস্বরূপ রচিত হল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু একসময় সমস্ত সমাজ ধর্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল এবং ধর্মমোহের কারণে তাদের বিচারশক্তি লুপ্ত হল। প্রকৃত অপ্রকৃত বোধ আর রইল না। এর ফলস্বরূপ রচিত হল পুরাণগ্রন্থসমূহ। ধর্মান্ধিতার কারণে বোধবুদ্ধির বিলোপ ঘটিয়ে তারা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন এই বিলাসিতার কারণেই কালিদাস প্রভৃতি কবিরা তাঁদের কাব্য-নাটকগুলো রচনা করেন যার মধ্যে যুগের স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাই।

বাংলাদেশের গীতিকাব্য সৃষ্টির মূলেও এই সামাজিক পরিবেশ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে জাতীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ওতপ্রোত যোগ রয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। আর্যরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়তে একসময়ে বাংলাদেশে এসে প্রবেশ করে। বঙ্গদেশের তাপমাত্রা অত্যন্ত প্রখর, বায়ুজলবাষ্পপূর্ণ এবং প্রধান খাদ্য ভাত যা তেজহানিকারক বলে সকলে মনে করে। বঙ্গদেশের এই ভৌগোলিক পরিবেশ এবং বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ খাদ্যের কারণেই আর্যবা কোমল, অলস এবং গৃহমুখাভিলাষী হয়ে উঠল। তাদের এই নতুন চরিত্র বৈশিষ্ট্যর কারণেই গীতিকাব্যের উদ্ভব হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন— "এই উচ্চাভিলাসশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট,

গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্টি হইল।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পা ড° ভবানীগোপাল সান্ন্যাল—, দ্বিতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড পৃ. ৫৬)। গীতিকবিদের চরিত্রানুযায়ী এই গীতিকাব্যও হয়ে উঠল উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত ও গৃহসুখপরায়ণ প্রতীক তার কোমল, সুমধুর এই গীতিকাব্যের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় প্রধান হয়ে উঠল। জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই এই গীতিকাব্য সাত আট বছর ধরে বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে এসেছে। গীতিকাব্যের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরতে পেরেছে বলেই বঙ্গদেশবাসী এত অধিক সংখ্যক গীতিকাব্য রচনা করতে পেরেছে। জয়দেব থেকে মাইকেল পর্যন্ত এই গীতিকাব্যের ধারা বিস্তৃত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের গীতিকাব্যগুলোর মধ্যে দুই ভিন্ন শ্রেণি দেখতে পেয়েছেন। প্রথম শ্রেণির প্রধান কবি জয়দেব আর দ্বিতীয় শ্রেণির প্রধান কবি বিদ্যাপতি। মূলত তাঁদের কবিস্বভাব অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের এই শ্রেণিভেদ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন জয়দেব তাঁর কাব্যে প্রকৃতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মানবচরিত্রকে সেই প্রকৃতির পটেই স্থাপন করেছেন। অপরদিকে বিদ্যাপতি মানবচরিত্রকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, প্রকৃতির সেখানে ভূমিকা নেই বললেই চলে। উদাহরণ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রচুর প্রাকৃতিক বস্তু উল্লেখ করেছেন যেগুলো মানবচরিত্রকে স্পষ্ট করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মাধবী যামিনী, মলয় সমীর, ললিত লতা, কুবলয়দল শ্রেণি, স্ফুটিত কুসুম, শরচন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধরত ইত্যাদি (বিদ্যাপতি ও জয়দেব, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পা. ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:, পৃ. ৫৭) প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবিল্লী, বাহুলতা, বিম্বৌষ্ঠ, সবসীরুহলোচন, অলস নিমেষ, স্থাপন করে মনুষ্যহৃদয়কেই জয়দেব স্পষ্ট করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণির কবিদের রচনায় বাহ্যপ্রকৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি যে ধরনের কাব্যের স্রষ্টা সেখানে বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদরোর সম্বন্ধ থাকলেও বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা মানব হৃদয়স্থিত ভাবসকলকে প্রধান হয়ে উঠতে দেখা যায়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক দৃষ্টিতে জয়দেবের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি ও বিদ্যাপতির কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতির প্রাধান্য ধরা পড়েছে। এর স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি উভয়ের কাব্যের এক সাধারণ বিষয়কে গ্রহণ করেছেন। জয়দেব ও বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় নিয়ে গীত রচনা করেছেন। কিন্তু জয়দেবের কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী হওয়ার জন্যেই অনেকটাই ইন্দ্রিয়ানুসারিনী হয়ে পড়েছে। আসলে স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেই নিকট সম্পর্ক থাকে এই যুক্তিতেই বঙ্কিমচন্দ্র উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আবার বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিতা বাহ্য-প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেননি বলেই তাঁদের কাব্য বহিরিন্দ্রিয়কে অস্বীকার করে হৃদয়কথাকে প্রধান করে তুলেছে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব দিয়েই জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন— "জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ, বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ ; বিদ্যাপতি আকাঙক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা

উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী কোবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের গান, সুরজ বীণাসঙ্গিনী --কণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্নসমীরণের নিশ্বাস।" মনুষ্যজীবনের বহির্দিক ও অন্তর্দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বঙ্কিমচন্দ্রের জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের এই পার্থক্য নির্ণয় সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। বঙ্কিমমতানুযায়ী জয়দেব বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর কাব্যকে শৃঙ্গাররস প্রধান করে তুলেছেন। কিন্তু শৃঙ্গার রসপ্রধান হলেও জয়দেবের কাব্যে যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা রয়েছে সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি পড়েনি। এই আধ্যাত্মিক ভাবনার জন্যে জয়দেবের কাব্য সমগ্র উত্তর ভারতে ভক্তিরসের কাব্যহিসেবে গৃহীত হয়েছিল। জয়দেবের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্ভোগমিলন প্রধান হয়ে উঠলেও এর অন্তরালে যে গভীর আধ্যাত্মিকতা রয়েছে তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের বিপরীত দিকও বিদ্যাপতির পদে আমরা লক্ষ করি। বিদ্যাপতির কাব্যকে বঙ্কিমমতানুযায়ী একেবারে ইন্দ্রিয় সংশ্রবশূন্য বলা যায় না। তাঁর বয়ঃসন্ধির পদগুলো অনেক স্থলেই ইন্দ্রিয়প্রধান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বিদ্যাপতির পদে প্রকৃতির ভূমিকা নেই বললেই চলে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিদ্যাপতি ও জয়দেব উভয়েই তাঁদের কাব্যে প্রকৃতির দ্বারাই পটভূমিকা তৈরি করেছেন। বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকৃষ্ণের বিরহপর্যায়ের পদে বর্ষার পটভূমিকায় রাধার বিরহকে ব্যাপ্তি দিয়েছেন আর জয়দেব বসন্ত প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করেছেন। জয়দেব ভোগের কবি, বিদ্যাপতি ত্যাগের কবি বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। এই উক্তিটির মধ্যে। এই উক্তিটির দ্বিতীয় অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় উভয় কবির শিল্পপ্রকরণের ক্ষেত্রে। জয়দেবের কাব্য সুললিত পদপ্রকাশে, ভাষার সুকৌশলী প্রয়োগে, রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, 'স্বর্ণহার', বিদ্যাপতির পদ ভাবের সুচিতা ও সংযম, ভাষার সংযমী প্রয়োগ প্রেমের অপার্থিব ভাব রুদ্রাক্ষমালার মতো— বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটির দ্বিতীয় অর্থ হল তাই। জয়দেব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সব পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশেষ উক্তি বিদ্যাপতির প্রার্থনা, বিরহ ও ভাবসম্মিলন বিষয়ক পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বয়ঃসন্ধির পদগুলোকে কোনা অবস্থায়ই ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য বলা যায় না। জয়দেবের মতো বিদ্যাপতিও রাজসভার কবি। জয়দেব যেভাবে রাজা লক্ষণ সেনের রাজসভায় বসে রাজসভার উপযুক্ত করে তাঁর প্রধান কাব্য গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন, বিদ্যাপতিও তেমনি রাজা শিবসিংহ প্রমুখ রাজাদের রাজসভায় বসে রাজোপযুক্ত করেই তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলোকে সাজিয়েছিলেন। বৈরাগ্যের সুর নয়, রাজোপযুক্ত ভোগের উপাদান তাঁর পদেও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এই ভাবনা প্রকাশকালে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদগুলোর দিকে দৃষ্টি দেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পরবর্তীকালের জয়দেব অনুসারী কবি ভারতচন্দ্র এবং বিদ্যাপতি অনুসারী কবি গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন বিদ্যাপতির কাব্যের যে বৈশিষ্ট্যর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন

তা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রেই অধিকমাত্রায় প্রযোজ্য, বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে ততটা নয়।

ওপরে বর্ণিত গীতিকাব্যের দুটি শ্রেণি ছাড়াও তৃতীয় আর একটি শ্রেণি আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। এই গীতিকবিতায় বাঙালি কবিকুল ইংরেজি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে এক বৃহত্তর জগতের স্বাদে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই সীমিত গণ্ডির সবকিছুই তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতেন, তাঁদের রচনায় এই অননুকরণীয় অভিজ্ঞতার চিত্রগুলো তাঁরা অঙ্কন করে গেছেন। আধুনিক কবিগণের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। নানা বিষয়ে তাঁদের অগাধ জ্ঞান। বিজ্ঞান, ইতিহাস, অধ্যাত্মভাবনা— সব বিষয়ে তাঁরা যথার্থ অর্থেই জ্ঞানী হয়ে উঠলেন। জীবনে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ তাঁদের কবিতায় বৈচিত্র্য নিয়ে এল, তাঁদের কবিতা হয়ে উঠল বহু বিষয় আশ্রয়ী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই বহুবিষয় আশ্রয়ী বিস্তৃতগুণসম্পন্ন কবিতার মধ্যে প্রগাঢ়তাগুণের অভাব লক্ষ করেন। বিষয়ের বিস্তৃতির কারণেই প্রগাঢ়তাগুণের অভাব ঘটেছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। তাঁর মতে বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিদের অভিজ্ঞতা সীমিত বলেই, কবিতায় সেই সীমিত অভিজ্ঞতাই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। প্রগাঢ়তাহীন কবিত্ব শক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। বিষয়ের বিস্তৃতির কারণেই তাঁদের কাব্যে প্রগাঢ়তাগুণের অভাব ঘটেছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। কারণ 'জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয়' বঙ্কিমচন্দ্র মনেপ্রাণে এই বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত সবক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র উল্লিখিত আধুনিক কবিদের কাব্যে কল্পনার ঐশ্বর্য, বিষয়কে ভাবে রূপান্তরিত করে প্রকাশের প্রয়াস, ভাব ও রীতির যোগবন্ধনে আত্মপ্রকাশের চমৎকারিত্ব সহজেই আমাদের মুগ্ধ করে। আত্মপ্রকাশের এই বিশেষ বিশেষ মাধ্যমগুলোর মধ্যেই আধুনিক কবিরা নিজের অনুভূতি লব্ধ সমগ্র অভিজ্ঞতাগুলোকে সঞ্চারিত করে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের ইন্দ্রিয়পরতা দোষের জন্যে নিন্দা করেছেন আবার বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিদের ইন্দ্রিয় সংসর্গবর্জিত অপার্থিব পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। আসলে জয়দেবের এই ইন্দ্রিয়পরতা দোষের মধ্যে মানবিক প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবিগণ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনায় নানা তত্ত্বের অবতারণা করলেও প্রেমের মানবিক দিককে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই তাঁরা রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে পদ রচনা করতে গিয়ে বৈষ্ণবতত্ত্বকে মাথায় রেখেও জয়দেবকে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেনি। এই অর্থে জয়দেবকে বাঙালির প্রথম কবি বলতেই হবে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে নিয়ে আলোচনায় বিদ্যাপতির মধ্যে যে গুণগুলো আবিষ্কার করেছেন সেগুলো গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রমুখ কবিদের মধ্যে রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিদের রচনায় গভীরতা আছে, কিন্তু বিদ্যাপতির মতো কল্পনার বিশালতা, সৃষ্টিরহস্যভেদকারী পরিধি নেই। আবার জয়দেবের মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতা দোষ রয়েছে তা মনে করা অসঙ্গত, কারণ তিনি শৃঙ্গারসকে কেন্দ্র করেই আধ্যাত্মিকতার ভাবগর্ভ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে বহিঃপ্রকৃতিকে জীবন নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করলে তাতে কখনও ইন্দ্রিয়পরতা, কখনও বা আধ্যাত্মিকতা

দোষ জন্মে। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ হিসেবে তিনি জয়দেবের উল্লেখ করেছেন এবং আধ্যাত্মিকতাদোষের উদাহরণরূপে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নাম করেছেন। কিন্তু আসলে এই ইন্দ্রিয়পরতাদোষ দ্বারাই আধ্যাত্মিকতার ভাব গর্ভ ব্যঞ্জনা তৈরি করেছেন আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের আধ্যাত্মিকতা প্রকৃতি ও মানবজীবনের সুগভীর সম্বন্ধ নির্ণয়ে নিয়োজিত হয়েছে।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা প্রকাশ করুন। (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ভারতবর্ষে ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র রচিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

কালিদাস প্রমুখ কবিদের কাব্যসৃষ্টির কারণ লিখুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

গীতিকাব্য সৃষ্টির কারণ কী? বঙ্কিম অনুসরণে লিখুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

গীতিকাব্যের শ্রেণিবিন্যাস করে এই ধরনের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

জয়দেব ও বিদ্যাপতির গীতিকাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত কতখানি যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

পাশ্চাত্য কার্যকরণ সূত্রকে মেনে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের সাহিত্য সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ধারা এবং বাংলা গীতিকাব্যের শ্রেণি নির্দেশ করে সেই কাব্যের বিশেষ বিশেষ দোষ-গুণের সন্ধান করেছেন তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে। এতে সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা রতি আমরা লক্ষ করি। তাঁর 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের বিশেষ শ্রেণিগত পার্থক্যের আলোচনা করে বিভিন্ন চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে সেই বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমেই কোনো চরিত্রে নিজস্ব স্বরূপ যে সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরা যেতে পারে, আলোচ্য প্রবন্ধে-আমরা তাই লক্ষ করি। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিষয়ক সমালোচনার অন্তর্ভূক্ত।

## ১০.৩ শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটির মধ্যে তিনিটি নারী চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনো মূলত এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের আলোচনা করতে চেয়েছেন। সেই নির্দিষ্ট পাঠ অবলম্বনে শকুন্তলা চরিত্রের আলোচনা করলে এই চরিত্র যে সম্পূর্ণভাবে আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে না সেটা বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন। তাই প্রতিতুলনার দ্বারা শকুন্তলা চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ তিনি স্পষ্ট করে তুলতে চাইলেন। তাই শকুন্তলা চরিত্রের স্বরূপবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়ারের 'দি টেমপেস্ট' নাটকের মিরন্দা এবং 'ওথেলো'

নাটকের নায়িকা দেসদিমেনোর সঙ্গে শকুন্তলার চরিত্রের প্রতিতুলনা করলেন। এতে শকুন্তলা চরিত্রের প্রকৃতস্বরূপ যেভাবে উজ্জ্বলতর আভায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তেমনি অপর দুটি চরিত্র মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনাও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই প্রবন্ধে দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম অংশে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

প্রথমত, প্রথম অংশের আলোচনা করা যাক। এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্রের মধ্যে কিছু সারূপ্য ও বৈরূপ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সরূপ্য ও বৈরূপ্যের মূলে রয়েছে দুই কাহিনির বহুল পরিমাণে মিল ও কাহিনির গভীরে নিহিত কিছুটা অমিল। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়ে ঋষিকন্যা। শকুন্তলা অপ্সরাগর্ভে জাত ঋষি বিশ্বামিত্রের কন্যা, মিরন্দা ঋষিসুলভ জীবনাচরণে অভ্যস্ত প্রাস্পরোর কন্যা। বিশ্বামিত্র রাজা ও হয়েও ঋষির মতো জীবনযাপন করতেন আর প্রস্পেরো মিলানের ডিউক হলেও চক্রান্তের শিকার হয়ে নির্জন দ্বীপে সংসার পরিত্যক্ত হয়ে ঋষিসুলভ জীবনযাপন করেছেন। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়ে ঋষিকন্যা বলেই অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। স্বর্গের অপ্সরা শকুন্তলাকে জন্মদান করে অরণ্যে তাঁর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে যায়। আবার শেক্সপীয়রের নাটকে অপ্রাকৃত শক্তি এরিয়েল মিরন্দাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। শকুন্তলাও মিরন্দা উভয়েই ঋষিপালিতা। পিতা-মাতা দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিতা হয়েছেন আর মিরন্দা রাজপ্রাসাদ থেকে পরিত্যক্তা হয়ে ঋষির মতো পিতার দ্বারা লালিতা-পালিতা হয়েছে। উভয়েই গতানুগতিক সংসার জীবন থেকে বহুদূরে অরণ্য জীবনে আশ্রমে বর্ধিতা। তাই উভয়েই বনলতা সদৃশ। কিন্তু সেই বনলতারা স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অতি সহজেই উদ্যানলতাকে পরাভূত করতে পেরেছে। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়ে অরণ্যজীবনে প্রতিপালিতা বলে সংসার কালিমা থেকে মুক্ত। সংসার-জটিলতামুক্ত অরণ্যজীবনের সরলতা তাদের চরিত্রকে সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ করে তুলেছে, কারণ সংসারজীবনের পুরুষের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে নারীচরিত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হয়ে ওঠে। আশ্রমপালিতা শকুন্তলা ও মিরন্দার মধ্যে বিকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগেই ছিল না। শকুন্তলা পালকপিতা কণ্বের আশ্রমে বল্কল পরিধান করে প্রকৃতিজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন অতিবাহিত করেছে। সে প্রকৃতি জগৎকে ভালোবেসে নিজহস্তে কলসী দ্বারা আলবালে জলসিঞ্চন করেছে। নবমল্লিকার ওপর তার ভগিনী স্নেহ, মাতৃহীন হরিণ শিশুর ওপর তার পুত্র স্নেহ— তাই পতিগৃহ গমনকালে শকুন্তলার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। আশ্রম ছেড়ে যেতে যে কাতরা এবং বিবশ। তরুলতা এবং হরিণীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে শকুন্তলা আত্মীয় বিচ্ছেদবেদনা অনুভব করেছে। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হলেও অশিক্ষিতা নন। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। শকুন্তলা যে অশিক্ষিতা নন তার প্রমাণ তাঁর লজ্জা। লজ্জাই তাঁর শিক্ষাচিহ্ন। তাই শকুন্তলা কথায় কথায় দুষ্মন্তের সামনে লজ্জাবনত হয়ে পড়েন, সখীদের সামনে তাঁর প্রণয়পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে লজ্জাশীলা হয়ে উঠেন।

কিন্তু মিরন্দা চরিত্রে লজ্জার চিহ্নমাত্রও নেই। এর প্রধান হচ্ছে মিরন্দা পিতা ও কালিবন ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে দেখেনি এবং তার পিতাও তাঁকে সংসারের কোনো নিয়ম-নীতি শিক্ষার দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তাই সামাজিক কোনো সংস্কার তার গড়ে ওঠেনি। তাই পিতার কাছে প্রেমিকের রূপ বর্ণনা করতে কিছুমাত্র সংকোচ অনুভব করেননি। মানুষ যে রকম কোনো মনোরম চিত্রপট দর্শন করলে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তার প্রশংসা করে, মিরন্দা তেমনি ফর্দিনন্দকে দেখে প্রশংসা করেছে। কিন্তু লজ্জা না থাকলেও মিরন্দার স্বাভাবিক পবিত্রতা, সরলতা, নবীনতা ও মাধুর্য শকুন্তলা থেকে অধিক ছিল। মিরন্দার পিতা ফার্দিনান্দকে পীড়ন করলে মিরন্দা ব্যথিত হয়ে পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে, স্বর্গের দেবতা অপেক্ষা তার প্রতি অধিক প্রেমের কথা ঘোষণা করেছে। মিরন্দার এই আচরণের দ্বারাই প্রমাণিত হয় মিরন্দা সংস্কারবিহীনা। কিন্তু মিরন্দা স্নেহশীলা, পরদুঃখে যে অতি সহজেই কাতর হয়ে উঠে, তবে তার লজ্জা নেই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ পবিত্রতা তার মধ্যে বর্তমান।

শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্রে পরিবেশের কারণে আমরা যেভাবে সাধর্ম্য খুঁজে পাই, ঠিক তেমনি একই কারণে দুটি চরিত্রে বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করি। শকুন্তলা লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যে আশ্রমে প্রতিপালিতা হয়েছে বলে ঋষিগণ ভিন্ন অন্য পুরুষ দেখেনি। তাই সুপুরুষ দুষ্মন্তকে দেখেই তিনি তাঁর প্রতি প্রর্ণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। ঠিক তেমনি মিরন্দাও নির্জন দ্বীপে পিতার সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই ছিলেন বলে পিতা প্রস্পেরো ও কালিবন ভিন্ন অন্য পুরুষ দেখেনি। তাই জনমানবশূন্য দ্বীপে ফার্দিনান্দকে দেখেই তিনি তাঁর প্রণয়ে আকৃষ্ট হন। কিন্তু শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়ের প্রণয়লক্ষণে কিন্তু বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে রয়েছেন বলে দুই কবি যে শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়ের প্রণয়াচরণে ভিন্নতা দেখিয়েছেন তা নয়। পরিবেশগত কারণেই দুই চরিত্রে এই ভিন্নতা তৈরি হয়েছে। এক কবি যদি শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র সৃষ্টি করতেন তা হলেও কিন্তু দুই চরিত্র এরকমই ভিন্ন আচরণ করত। শকুন্তলা কণ্বমুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা হয়েছেন। লোকালয় থেকে বহুদূরবর্তী হলেও শকুন্তলা সেই আশ্রমিক পরিবেশেও সামাজিক সংস্কারে শিক্ষিতা হয়ে উঠেছেন। ব্রহ্মচর্য পালন নয়, শকুন্তলাকে সংসারী করার গোপন অভীস্পা কণ্বমুনির ছিল। তাই সাংসারিক রীতি-নীতিতে শকুন্তলাকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন তিনি। সমাজপ্রদত্ত সংস্কার অনুসারে শকুন্তলা লজ্জাশীলা। দুষ্মন্তের প্রতি গভীর প্রণয় অনুভব করলেও লোকসংস্কারে শকুন্তলা সেই প্রণয় মুখে ব্যক্ত করেননি। আচার আচরণে, ভাবে-ভঙ্গিতে শকুন্তলার সেই প্রণয় ব্যক্ত হয়েছে। মিরন্দার ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। প্রস্পেরো মিরন্দাকে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে কোনো শিক্ষাই দেননি। জনমানবশূন্য সেই নির্জন দ্বীপে মিরন্দা যে অন্য কারোর নিকট থেকে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে তারও সুযোগ ছিল না। তাই মিরন্দা ফার্দিনান্দের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েই নিজের মনের ভাবকে অবলীলায় প্রকাশ করেছে। কুমারী নারীর মুখে প্রণয় প্রকাশ যে লজ্জার সেই সাধারণ জ্ঞান মিরন্দার ছিল না। শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি প্রণয়সক্তা হয়েও কখনও দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক সখীদ্বয়কেও তার প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করেননি। সখীরাই তাকে ক্লিষ্ট দেখে পীড়াপীড়ি করে তাঁর মুখে দুষ্মন্তের প্রতি প্রণয়ের কথা জানতে পারল।

কিন্তু শকুন্তলার ভাবে ও আচরণে প্রণয়ের ভাব ব্যক্ত হয়েছে। দুষ্মন্তকে ছেড়ে যাওয়ার সময় শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ফিরে দেখার জন্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। সে কারণে তাঁর বল্কল গাছে আটকে যায়, পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধে যায়। মিরন্দার আচরণে কিন্তু সে সব কিছুই প্রয়োজন পড়েনি। ফর্দিনান্দকে দেখেই মিরন্দা পিতার কাছে আপন প্রণয় ব্যক্ত করেছে— "Is the third man that this e'er I saw, the first that e'er I sigh' d for." By my modesty," প্রস্পেরো তাঁর কন্যার প্রতি ফার্দিনান্দের প্রণয়ের গভীরতা বোঝার জন্যে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। মিরন্দা এতে ব্যথিত হয়েছে এবং ফার্দিনান্দেকে তার প্রণয়ী বলে পিতার দয়ার উদ্রেক করতে চেয়েছেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয় আলাপ ও একরকমের লুকোচুরি খেলা। 'সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস কেন' ...'আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই'— শকুন্তলার প্রণয়ে এরকম নানা বাহানা রয়েছে, মিরন্দার ক্ষেত্রে তা কিন্তু নেই। মিরন্দা সামাজিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত কোনো লজ্জাশীলা নারী নয়, সে বনের পাখি, প্রথম সূর্যোদয়ে গান গেয়ে উঠতে তার লজ্জা নেই, সন্ধ্যার বাতাস পেয়েই তিনি অবলীলায় নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাই ফার্দিনন্দকে দেখেই তিনি অবলীলায় তাঁর মনের ভাব করেছেন।

"The jewel in my dower, I would not wish

Any companion in the world but you;

Nor can imagination from a shape,

Besides yourself, to like of."

মিরন্দা-ফার্দিনান্দের এই প্রণয়ালাপের সঙ্গে রোমিও জুলিয়েট প্রণয়ালাপের যে প্রবল সাদৃশ্য রয়েছে সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ নজর পড়েছে। মিরন্দা ও জুলিয়েটের এই সহজ প্রণয়ালাপের সঙ্গে শকুন্তলার প্রণয়ের যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র এর জন্য চরিত্রওলোর স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করেছেন। দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রণয় ও গান্ধর্ব বিবাহের পূর্বে শকুন্তলা অতি সাধারণ এক আশ্রমবালিকা ছিলেন। তাঁর তুলনায় দুষ্মন্ত প্রবল ব্যক্তিত্বশীল, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। কিন্তু মিরন্দা ও জুলিয়েটের সঙ্গে তুলনায় ফার্দিনান্দ ও রোমিও তাদের সমস্থানীয়, বয়সে যোগ্যতায়, কীর্তিতে, যশে তারা তাদের সমগোত্রীয়। সেকারণে শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রণয়লাপে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেননি, এখানে দুষ্মন্তের প্রবল ব্যক্তিত্বের চাপে শকুন্তলা চরিত্র ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু মিরন্দা ও জুলিয়েট অতি সহজেই তাদের প্রেমিকের কাছে তাঁদের প্রণয় ব্যক্ত করেছে। প্রতিতুলনার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে শকুন্তলার চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট করে তুলেছেন—

"ইহা কবির দোষ নহে— বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফার্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি— অপ্রাথিত যশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীতে মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে।"

(শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেখদিমোনা, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পা: ভবনীগোপাল সান্ন্যাল, পৃ. ৮৩)

শকুন্তলা ও মিরন্দার এই আচরণের আবার অন্য একটি ভিন্ন দিকেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি পড়েছে। শকুন্তলার লজ্জাশীলা চরিত্র ও মিরন্দার প্রণয়ীর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তি প্রেম সংলাপের প্রসঙ্গে অনেকেই মনে করতে পারেন এরজন্যে দেশভেদ দায়ী। ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য ও সংস্কার মেনে শকুন্তলা প্রণয় প্রকাশে লজ্জাশীলা হয়ে হয়ে উঠেছেন এবং মিরন্দা বিদেশিনী বলে প্রেমপ্রকাশে লজ্জাহীনা হয়ে উঠেছে। মনুষ্যহৃদয় সবদেশে সবকালে একই থাকে। চরিত্র সাপেক্ষে চরিত্রভেদে সংশ্লিষ্ট চরিত্র অনুসারে তাদের চরিত্রের স্ফূরণ ঘটে মাত্র। আপাতভাবে শকুন্তলা তুলনায় মিরন্দাকে অধিক লজ্জাহীনা বলে মনে হলেও ক্ষেত্র বিশেষে শকুন্তলাকেই মিরন্দার চেয়ে বেশি নির্লজ্জা বলে মনে হয়। শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের কথার প্রত্যুত্তর— 'অসন্তোষে উন কিং করেদি' বলেছেন তখন তাঁকে আমাদের লজ্জাহীনা বলতে কোনো সংকোচ থাকে না। আবার যে শকুন্তলাকে প্রথমে দুষ্মন্তের পাশে অতি লজ্জাশীলা এক সাধারণ রমণী বলে মনে হয়েছে, সেই শকুন্তলা পরবর্তী কালে দুষ্মন্তের সমগোত্রীয় ব্যক্তিত্বশালিনী হয়ে উঠেছে। রাজসভায় শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা হলে তিনি নীরব থাকেননি দুষ্মন্তের রাজসভায় দাঁড়িয়ে দুষ্মন্তেকে তিনি তিরস্কার করেছেন। এর পেছনে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন শকুন্তলা চরিত্রের ক্রমবিকাশ। দুষ্মন্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে যে লজ্জাশীলা, নতমুখী শকুন্তলাকে আমরা দেখেছিলাম, রাজসভায় পরিত্যক্তা শকুন্তলা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তখন পত্নী, রাজমহিষী, সন্তানের ভাবী জননী। তাই শকুন্তলা এখানে রমণী, ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র নন। তাই যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে মনের ভাবনা প্রকাশ করতে তাঁর সামান্যও অসুবিধা হয়নি। অনেক সমালোচকই মনে করেন শকুন্তলার কবি থেকে টেম্পেস্টের কবি অধিক শক্তিশালী এবং তাদের কাব্যপ্রতিভার কারণেই প্রথম পর্যায়ে মিরন্দা অধিক বিকশিতা হয়েছেন শকুন্তলা ম্লানীভূতা, বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি, বুদ্ধি এবং প্রতিতুলনার দ্বারা এই ভাবনা থেকে দূরে সরে এসে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন চরিত্র বিচারে শকুন্তলা মিরন্দা থেকে কোনো অংশেই কম নয়। এই সিদ্ধান্ত শকুন্তলা চরিত্রের মতো মিরন্দার ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। এ- প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নিজের উক্তি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে—

"শকুন্তলার কবি যে চেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এ স্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।"

(শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পা: ভবানী গোপাল সান্ন্যাল, পৃ. ৮৩)

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধের প্রথম অংশে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার জীবনের অর্ধাংশ ফুটিয়ে তুলেছেন। শকুন্তলার অপর অংশ ফোটানোর জন্য তাকে তিনি দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনার তুলনা করতে গিয়ে তিনি উভয়ের চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরছেন। উভয়চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে তিনি তাদের মধ্যে চারটি প্রধান মিল খুঁজে পেয়েছেন এবং এই সাদৃশ্যের জন্যে তিনি শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনার তুলনা করছেন।

প্রথমত, শকুন্তলা ও দেসদিমোনা উভয়েই গুরুজনদের অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রেমাস্পদের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, উভয়েই বীরপুরুষের কাছে আত্ম সমর্পন করেছেন। দুষ্মন্ত ও ওথেলো উভয়েই বীর্যে গরিমায় মহীরুহতুল্য এবং এই দুই নারীর প্রণয়লতা তাঁদের আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। দুষ্মন্ত বীর এবং সুপুরুষ। ওথেলো বীর কিন্তু কুরূপ। ওথেলোর বীরত্ব ও শৌর্যই দেসদিমোনাকে আকর্ষণ করেছিল। আসলে রূপ নয়, রূপের মোহ থেকে বীর্যের মোহ নারীর ওপর অধিক কার্যকরী হয় দেসদিমেনো চরিত্রে নারীত্বের এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র দেসদিমোনো চরিত্রে চিরন্তন নারীত্বের এই দিক তুলে ধরতে গিয়ে দেসদিমোনার সঙ্গে দ্রৌপদীর তুলনা করেছেন। দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীর মধ্যে বীর অর্জুনকেই অধিক ভালোবাসতেন এবং তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব তাঁর স্বর্গারোহণে বাধা সৃষ্টি করেছিল। নারীপ্রেমের এই বিশেষ তত্ত্ব জানতেন বলেই শেক্সপিয়র চরিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন।

তৃতীয়ত, শকুন্তলা ও দেসদিমোনা উভয়েই আশাভঙ্গ হয়েছিল, তাঁরা উভয়েরই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছিলেন। যে আদরের যোগ্য সেই অনাদৃত হয়, সংসারের এই নিয়মেই উভয়ের জীবনে এই বিশেষ ঘটনা ঘটেছে।

চতুর্থত, উভয়েই স্নেহশীলা এবং স্বামীর একান্ত অনুগতা হয়ে সতী নামের যোগ্যা।

এইসব কারণে শকুন্তলা এবং দেসদিমোনার তুলনা করা যেতে পারে। আবার উভয়ের সাদৃশ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের বীজ নিহিত বয়েছে। শকুন্তলা স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা, পতিচিন্তায় মগ্ন হয়ে দুর্বাসার অতিশাপও তিনি শুনতে পাননি। শকুন্তলা সতী এবং দেসদিমোনাও সতী। কিন্তু দেসদিমোনার সতীত্বের ব্যাপারে শকুন্তলার থেকে বেশি গরীয়সী বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। এবং সেই বিষয়ে তিনি যুক্তিপ্রবণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শকুন্তলা স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা এবং সতী হলেও রাজসভায় দুষ্মন্তের অপমানে দলিত সর্পের মত মাথা তুলে দুষ্মন্তকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চাতুর্য্যপটু বলে উপহাস করলে শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে পূর্বের বিনীত ভাব পরিত্যাগ করে দুষ্মন্তকেও চরম অপমান করেন। কিন্তু দেসদিমোনার স্বামীর প্রতি আচরণ শকুন্তলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শকুন্তলার স্বামীর প্রতি যে রাগ, অভিমান, ব্যঙ্গ ছিল দেসদিমেনোর মধ্যে সেগুলোর কিছুই নেই। তাঁর মধ্যে একমাত্র রয়েছে স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি। স্বামীর চরম দুর্ব্যবহারেও স্বামীকে সামান্যও দোষী বলে মনে করেননি। স্বামী তাঁকে সর্বসমক্ষে প্রহার করে দূর করে দিতে চাইলে দেসদিমোনা আপনাকে আর বিরক্ত করব না বলে চলে যেতে প্রস্তুত হলেন। আবার স্বামী ডাকতেই প্রভু বলে আবার নিকটে এল। ভ্রান্তির শিকার হয়ে দেসদিমোনার চরিত্রে সন্দেহ করে যখন ওথেলো তাঁকে কুলটা বলে চরম গালাগাল দিলেন তখন দেসদিমোনা উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু এককথাই বলেছেন যে তিনি নিরপরাধী এবং সেটা ঈশ্বর জানেন। পতিপ্রেমে বঞ্চিত হয়ে দেসদিমোনার কাছে পৃথিবী শূন্য হয়ে যায়। ইয়াগোর কাছেই স্বামীর প্রেম কীভাবে আবার ফিরে পাবেন যে সম্বন্ধে পরামর্শ চেয়েছেন—

"O good Iago what shall I do to win my lord again?"

এমনকি ওথেলো যখন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত তখনও দেসদিমোনার পতিভক্তিতে সামান্যও চিড় ধরেনি। রাগ, অভিমান, ক্ষোভ কোনো কিছুই তাঁর মনে জাগ্রত হয়নি। কেবল নিজের রক্ষার ভার ঈশ্বরের ওপর সমর্পণ করেছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরণভয়ে ভীতা দেসদিমোনা যখন স্বামীর কাছে একদিনের জন্যে, একরাত্রির জন্যে এমনকি একটিমাত্র মুহূর্তের জন্যে জীবন ভিক্ষা চাইলেন এবং ওথেলো সেই মুহূর্তটুকুও তাঁরে দিতে রাজী হননি তখন দেসদিমোনা স্বামীর প্রতি সামান্যও বিরূপ হননি। স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও নিষ্ঠায় মৃত্যুপথ যাত্রী দেসদিমোনা ইমলিয়ার কাছে নিজের মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী করলেন। তখনও স্বামীকে প্রণাম জানাতে তাঁর মনে সামান্যও দ্বিধা জাগেনি।

এই সব দিক থেকে শকুন্তলা ও দেসদিমোনা স্বতন্ত্র চরিত্র। এই স্বতন্ত্রতা গ্রন্থ-দুটির অন্তঃপ্রকৃতির বৈপরীত্যের কারণে ঘটেছে বলে বঙ্কিম মনে করেছেন। দুই বিপরীত বস্তুর মধ্যে তুলনা চলে না। তাঁর বিচারে শেক্সপিয়রের নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দন কাননতুল্য। সাগরে কাননে তুলনা করা যায় না। নন্দন কাননে সৌন্দর্যের চরম বিকাশ আমরা দেখি। সেখানে যা সুন্দর, সুদৃশ্য, সুগন্ধ, সুরর, যা মনোহর, সুখকর— এইসব কিছুর বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। অন্যদিকে সাগর তীমনাদী, চঞ্চল, সেক্সপিয়েরর সাগরবৎ এই নাটকে হৃদয়োথিত রাগ-, দ্বেষ ইত্যাদির বিপুল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত। এই নাটকের ইতিহাসে এটা দুর্লভ।

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র দুই নাটকের বিষয়বস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় নাটক ও ইউরোপীয় নাটকের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। উভয় নাটক দৃশ্যকাব্য হলেও ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটক বলতে এর অধিক আরো কিছু বোঝান বঙ্কিমচন্দ্রর কাছ থেকে এই প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ে জানতে পারি। ইউরোপীয় সমালোচকেরা মনে করেন অনেক নাটক দৃশ্যকাব্যের আকারে রচিত হলেও তা মূলত কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের এই মতের যৌক্তিকতাকে মেনে নিতে কোনো দ্বিধা করেননি। এই নাটকগুলো নাটক না হলেও উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি গ্যেটের ফাউস্ট বা বাইরণের ম্যানফ্রেডের উল্লেখ করেছেন। শেক্সপিয়েরর টেম্পেস্ট ও কালিদাসের শকুন্তলাও এই জাতীয় কাব্য। তাঁর মতে এগুলো নাটকাকারে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতানুযায়ী নাটকের লক্ষণ এই দুই কাব্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদের মতে নাটকের লক্ষণ এই দুই নাটকে নেই। ওথেলো নাটকে এই নাটকের লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইউরোপীয় সমালোচকদের যুক্তিগ্রাহ্যতা মেনে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন "ওথেলো নাটক— শকুন্তলা এই হিসাবে উপাখ্যান কাব্য।" এরই ফলশ্রুতিতে শকুন্তলা ও দেসদিমোনা চরিত্র সৃষ্টিতে বিস্তর পার্থক্য হয়েছে। দেসদিমোনার সংলাপ, আচরণে তাঁর দুঃখ কষ্টকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করেছে বলেই তা আমাদের হৃদয়কে সহজেই নাড়া দেয়। কিন্তু শকুন্তলার দুঃখ বেদনা দুষ্মন্তের মুখে শুনে আমাদের জানতে হয়। সে কারণেই শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার আমরা পাই না, কিন্তু দেসদিমোনার

তা অত্যন্ত স্পষ্ট। উভয় চরিত্রের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেসদিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।" একারণেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন দেসদিমোনা শকুন্তলার চেয়ে অধিক প্রোজ্জ্বল হয়ে অঙ্কিত হয়েছে, সেখানে শকুন্তলাকে অনেক ম্লান বলেই মনে হয়। কিন্তু আন্তরধর্মে দুইই এক। শকুন্তলাকে বুঝতে গেলে মিরন্দা ও দেসদিমোনা উভয় চরিত্রের প্রয়োজন রয়েছে। প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকে না— "শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেসদিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিনী।" (শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পা. ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, পৃ: ৮৮)

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্রের সাদৃশ্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্রের বৈসাদৃশ্যগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

শকুন্তলা ও মিরন্দা প্রেম প্রকাশের ভিন্নতার কারণগুলো আলোচনা করুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

বিবাহপূর্ববর্তী ও বিবাহপরবর্তীকালে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার আচরণের ভিন্নতার কারণ লিখুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

শকুন্তলা ও দেসদিমোনা চরিত্রের সাদৃশ্য বিষয়ে আলোচনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

শকুন্তলা ও দেসদিমোনা চরিত্রের বৈসাদৃশ্য আলোচনা করে এই বৈসাদৃশ্যের প্রধান কারণ উল্লেখ করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

'ওথেলো' কোন বিশিষ্ট গুণে নাটক হয়ে উঠেছে লিখুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

শকুন্তলা ও টেম্পেষ্টকে নাটক বলা যায় কি আলোচনা করুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ১০.৪ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটি 'প্রচার' পত্রিকায় ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি লেখকদের সারস্বত সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন। তিনি এখানে বারোটি সূত্র দিয়েছেন যার দ্বারা লেখকেরা সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। এর মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত বারোটি সূত্র নীচে আলোচনা করা হল—

১। প্রত্যেক লেখকের মনের কোণে থাকে যশলাভের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের যশের জন্যে লিখতে নিষেধ করেছেন। যশের জন্যে লিখতে গেলে লেখকের সমস্ত মনোযোগ থাকবে যশের দিকে। ফলে যশও হবে না, লেখার মানও ভালো হবে না। লেখা ভালো হলে যশ এমনি আসবে বলেই লেখক মনে করেন। এটিই হচ্ছে সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সূত্র।

২। দ্বিতীয় সূত্রটি অর্থকরী বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের অর্থ উপার্জনের জন্যে লিখতে নিষেধ করেছেন। ইউরোপে লেখকেরা লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। লেখার দ্বারা তাঁরা অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই লেখার মানও প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে লেখার ক্ষেত্রে এরকম পরিবেশ এখনও গড়ে উঠেনি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন আমাদের দেশে লেখকেরা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে লিখতে গেলে লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রধান হয়ে উঠবে। আমাদের দেশে পাঠকের রুচি ও শিক্ষা এখনও যথাযথভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই এই পাঠককুলের মনোরঞ্জন করতে গেলে লেখা বিকৃত হয়ে উঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন।

৩। তৃতীয় সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখার সঙ্গে মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের সম্পর্ককে যুক্ত করেছেন। মঙ্গলসাধনের কথাটিই উদ্দেশ্যমূলক। আবার লেখার মাধ্যমে সৌন্দর্যসৃষ্টিও করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন সৌন্দর্যসৃষ্টি যদি সার্থক হয় তা পরিণামে মঙ্গলসাধন করে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন নীতিজ্ঞান, শিক্ষাদান না চিত্তোৎকর্ষ সাধন কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। তবে সৌন্দর্যসৃষ্টি পরিণামে জগতের চিত্তশুদ্ধি করে থাকে। উদ্দেশ্য ও সফলতার দিক থেকে বিচার করলে অন্যান্যদের তুলনায় কবিদের শ্রেষ্ঠ বলা যায় এবং কবিরা যে জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই তিনি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলেছেন। সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে যাঁরা লেখেন তাঁদের বঙ্কিমচন্দ্র যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যাত্রওয়ালারা নীচ ব্যবসায়ী।

৪। চতুর্থ সূত্র সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন 'সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য'। তাঁর মতে অসত্য, ধর্ম বিরুদ্ধ, পরনিন্দা, পরপীড়ন বা স্বার্থসাধনের জন্যে যে সাহিত্য রচিত হয় তা কখনও হিতকর হতে পারে না। এধরনের সাহিত্যরচনা বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মহাপাপ।

৫। পঞ্চম সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক তাঁর রচনাকে কীভাবে নির্ভুল করে তুলবেন সে বিষয়ে যথার্থ মতামত তুলে ধরেছেন। কোনো লেখক যদি লেখার পরেই তা প্রকাশ করতে যান তাহলে তাঁর রচনার মধ্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। লেখক রচনাটিকে কিছুদিন রেখে দিয়ে তারপর দেখলে লেখক নিজেই তার মধ্যে অনেক ত্রুটি খুঁজে পাবেন। কাব্য, নাটক, উপন্যাস-জাতীয় রচনাকে তিনি দু-এক বৎসর ফেলে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরে লেখক এটাকে সংশোধন করে দিলে রচনাটি উৎকর্ষতা লাভ করবে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেনা। বঙ্কিমচন্দ্র আবার লেখকদের সাময়িক সাহিত্য রচনাকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মতে 'সাময়িক সাহিত্য' লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। ষষ্ঠ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকের নিজের জানার পরিধির মধ্যে লেখার বিষয়কে সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছেন। তিনি মনে করেন জ্ঞানের সীমার বাইরে গিয়ে কোনো কিছু রচনা করলে তা যথাযথ হয়ে ওঠে না। সাময়িক সাহিত্যে এ-নিয়ম রক্ষিত হয় না বলে সেখানে তুলনামূলকভাবে লেখার মান অনেক নিম্নস্তরের বলে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৭। সপ্তম সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সরাসরিই বলেছেন "বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না।" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পাদনা : ড° ভবানীগোপাল সান্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা : ৬৭)। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন চেষ্টাপূর্বক বিদ্যা প্রকাশ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে এবং তা লেখার পারিপাট্যে বাধা তৈরি করে। অনেক লেখকের রচনায় লক্ষ করা যায় নিজের অধিকারে না থাকা বহু ভাষার গ্রন্থ থেকে তাঁরা উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে নিজের না জানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে নেই। সেই উদ্ধৃতিগুলো লেখার মানদণ্ড উন্নত করে না বরং লেখকের অজ্ঞতার বাহক হয়ে ওঠে।

৮। অষ্টম সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতা সৃষ্টি একটি লেখাকে সমৃদ্ধ করে। লেখক ক্ষমতাসম্পন্ন হলে সেই অলঙ্কার বা রসিকতা তাঁর রচনায় আপনিই এসে যায়। এগুলো প্রয়োগের অপচেষ্টা বা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার লেখার মানকে বিনষ্ট করে দেয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র চেষ্টাকৃত অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বা রসিকতা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৯। নবম সূত্রে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের ব্যবহার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অলঙ্কার ও ব্যঙ্গ প্রয়োগ করা লেখকদের একটি নিয়মিত প্রথায় পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু অপ্রয়োজনে এগুলোর ব্যবহার

কাব্যের মানকে নিম্নমুখী করে। লেখক কীভাবে এই ভুল সংশোধন করবেন সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে পরামর্শ দিয়েছেন। লেখকেরা তাঁদের রচনার অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের সেই বিশেষ অংশগুলো তিনি বন্ধুদের পড়ে শুনাতে বলেছেন। তিনি মনে করেন যদি সেই অংশগুলো ভালো না হয় তাহলে লেখক নিজেই তা দু-চারবার পড়লে উপলব্ধি করতে পারবেন। তখন তিনি সেগুলো আর বন্ধুদেরকে লজ্জায় পড়াতে পারবেন না। তখন নিজেই সেগুলো কেটে বাদ দেবেন।

১০। দশম সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারাই যে কাব্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তা কিন্তু নয়। লেখক যখন তাঁর মনের ভাবকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন তখনই তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক হয়ে উঠতে পারেন। দশম সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়ে তাঁর অভিমত দিয়েছেন— "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পাদনা: ড° ভবানীগোপাল সান্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ: ৬৮)। তাঁর মতে পাঠককে বুঝানোই যদি লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে সহজ-সরলভাবেই তা পাঠককে বুঝাতে হবে।

১১। একাদশ সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখার ক্ষেত্রে অনুকরণকে নিন্দনীয় বলেছেন। অনেক লেখকেই তাঁদের প্রিয় লেখকদের অনুকরণ করতে চান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র জানেন অনুকরণের প্রধান ত্রুটি হল সেখানে দোষগুলো এসে সহজে ধরা দেয়, গুণ নয়। ফলে লেখকে তাঁর সেই বিশেষ প্রিয় লেখকের দোষগুলোই তাঁর রচনায় নিয়ে আসেন। সে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণের বিপক্ষে তাঁর মত দিয়েছেন।

১২। দ্বাদশ সূত্রে যে কথাকে প্রমাণ করা যায় না, তা লিখতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করেছেন। অনেক অযৌক্তিক, অবান্তর কথা নিজেদের রচনায় সংযোজন করে অনেক লেখক নিজের অজান্তেই সত্য প্রকাশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে লেখার সপক্ষে প্রমাণ হাতে রাখা খুবই জরুরি।

একটি জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে তার সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন এই নিয়মগুলো পালন করলে বাংলা সাহিত্যে প্রভূত উন্নতি হবে এবং তাতে বাংলাদেশের মঙ্গল। তাঁর উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য 'বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পাদনা: ড° ভবানীগোপাল সান্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ: ৬৮)।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র অর্থ উপার্জনের জন্যে লিখতে নিষেধ করেছেন কেন সে বিষয়ে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

২। সাহিত্য রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের সম্পর্ককে কীভাবে যুক্ত করেছেন সে বিষয়ে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৩। একটি রচনাকে যথাযথ তথা নির্ভুল করে তোলার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রবন্ধটি অবলম্বনে সে বিষয়ে মতামত দিন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৪। কোনো বিষয়ে লেখকের অজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অতিরিক্ত প্রকাশ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের প্রতি যে নিবেদন রেখেছেন প্রবন্ধটি অবলম্বনে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৫। রচনার মধ্যে অলঙ্কার, রসিকতা ও ব্যঙ্গের প্রয়োগ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

৬। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণকে অস্বীকার করতে কেন বলেছেন সে বিষয়ে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ১০.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ হল 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা'। সাহিত্যও যে কোনো দেশের কার্য-কারণসূত্রে সৃষ্টি হয় এবং তুলনামূলক আলোচনায় সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত কোনো চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এবং 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে আমরা লক্ষ করি। বঙ্গদেশে গীতকাব্যের প্রণেতা হচ্ছেন জয়দেব। জয়দেব থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই গীতিকাব্য নিজের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এই গীতিকাব্য সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব নিয়মের ফলে। শুধু গীতিকাব্যই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রাচীন সাহিত্যও একই নিয়মে সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। দেশভেদে দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হয়ে সাহিত্য রূপান্তরিত হয়। রামায়ণের সৃষ্টির মূলে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন একটি বিশেষ দেশের বিশেষ দুই জনগোষ্ঠীর বিবাদ। তারা হচ্ছে আর্য এবং অনার্য। আর্যবা ভারতে প্রবেশ করে সাম্রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে অনার্যদের কাছেই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনার্যদেরকে পরাজিত করে। এই বিষয় নিয়েই রামায়ণ রচিত। আর্যরা ভারতে রাজ্যস্থাপন করে রাজ্যভোগ-লোভে নিজেদের মধ্যে বিবাদে লুপ্ত হয় এবং যে দল অপেক্ষাকৃত বলশালী তারাই জয়লাভ করে। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের কাহিনি এই বিষয় নিয়েই রচিত। তারপর এই বীরজাতি নিজের দেশের সম্পদ, শ্রী, সভ্যতা বৃদ্ধি করার জন্যে ব্যবসাবাণিজ্যে মন দেয় এবং তাদের সুখ ও কৃতিত্বের ফলস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র রচনা করে। এর ঠিক পরবর্তীকালেই ধর্মমোহের কারণে পুরাণগ্রন্থগুলো রচিত হল।

ধর্মান্ধতার কারণে বোধবুদ্ধির বিলোপ ঘটিয়ে তারা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় এবং এর ফলস্বরূপ কালিদাসাদি কবিদের কাব্য-নাটকগুলো রচিত হয়। বাংলাদেশের গীতিকাব্য সৃষ্টির মূলেও এই ধরনের সামাজিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। আর্যরা বঙ্গদেশের এসে এক বিশেষ পরিবেশ গীতিকাব্যে রচনা শুরু করে। বঙ্গদেশের এই গীতিকাব্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দুই শ্রেণি লক্ষ করেছেন। প্রথম শ্রেণির প্রধান জয়দেব যিনি মানবচরিত্রকে প্রকৃতির পটে স্থাপন করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির প্রধান বিদ্যাপতি যিনি মানরচরিত্রে— হৃদয়বৃত্তিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জয়দেবের কবিতা প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে ইন্দ্রিয়ানুসারী হয়ে উঠেছে এবং সে কারণেই তা শৃঙ্গাররসপ্রধান এর বিদ্যাপতির কাব্য মানবচরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে হৃদয়ানুসারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু জয়দেবের কাব্য শৃঙ্গার-রস প্রধান হলেও এর গভীরে যে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে সে বিষয়ে কবি গুরুত্ব দেননি। ঠিক একইভাবে বিদ্যাপতির পদও অনেকস্থলেই ইন্দ্রিয়প্রধান হয়ে উঠেছে। এই দুই শ্রেণির গীতিকাব্য ছাড়াও এক তৃতীয় শ্রেণির গীতিকাব্য রয়েছে যা ইংরেজ গীতিকবিদের অনুগামী। এই শ্রেণির কবিদের উদাহরণস্বরূপ হলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রমুখ। তাঁদের কবিতা বহুবিষয় আশ্রয়ী হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এগুলোর মধ্যে প্রগাঢ়তাগুণের অভাব লক্ষ করেছেন, কিন্তু বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিদের কবিতায় সীমিত অভিজ্ঞতায় হলেও প্রগাঢ়তাগুণের পরিচয় দিয়েছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস পায় বলে যে প্রবাদ রয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। অন্তঃপ্রকৃতি অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তি এবং বহিঃপ্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্তি— এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির ছায়াসহ তা বর্ণনা করা এবং যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা করা এই বিশেষ রীতি মানতে পরিলেই সেই কবি সুকবি হয়ে উঠতে পারবেন। অন্যথায় ইন্দ্রিয়পরতা ও আধ্যাত্মিকতা দোষ সৃষ্টি হবে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের কাব্যের ইন্দ্রিয়পরতা এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে আধ্যাত্মিকতা দোষ লক্ষ করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত নেওয়া যায় না। জয়দেবের কাব্যে ইন্দ্রিয়পরতা দোষের মধ্যে মানবিক প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে এবং শৃঙ্গার-রসকে কেন্দ্র করেই তিনি আধ্যাত্মিকতার ভাবগর্ভ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতির কাব্যের যে গুণগুলো আবিষ্কার করেছেন সেগুলো চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের কাব্যে বিদ্যাপতির চেয়ে আরো গভীরতর ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করতে হয়, কেন না বিদ্যাপতির মতো কল্পনার বিশালতা, সৃষ্টিরহস্যভেদকারী পরিধি অন্যান্য কবিদের রচনায় খুব কম মাত্রায় লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ওয়ার্ডসত্তয়ার্থের আধ্যাত্মিকতা দোষ বলেছেন তার মধ্যে কিন্তু প্রকৃতি ও মানবজীবনের সুগভীর সম্বন্ধ বয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি মূলত মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং শকুন্তলা

চরিত্রকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এই চরিত্রের সঙ্গে শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের 'মিরন্দা' এবং 'ওথেলো' নাটকের দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটিকে তিনি দুভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমভাগে রয়েছে শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনামূলক আলোচনা ও দ্বিতীয় অংশে দেসদিমোনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনামূলক আলোচনা। শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনামূলক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দা সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই ঋষিকন্যা, প্রকৃতির সান্নিধ্যে লোকালয় থেকে দূরবর্তী আশ্রমে উভয়েই বড় হয়েছেন। উভয়ের সৌন্দর্যে লোকালয় বাসিনী প্রসাধন বিলাসী রমণীরা পরাজিত। রাজা দুষ্মন্ত ও যুবরাজ ফার্দিনান্দ উভয়ে শকুন্তলা ও মিরন্দার অতুল রূপসৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারেননি। শকুন্তলা ও মিরন্দা— উভয়েই সরল এবং পবিত্র। তবে তাঁদের এই সাদৃশ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। শকুন্তলা সরল হলেও লোকাচারে অভ্যস্তা, তাই দুষ্মন্তের প্রতি প্রণয়াসক্তা হলেও নিজের প্রেম প্রকাশে তিনি কুণ্ঠিতা, লজ্জাশীলা। কিন্তু মিরন্দার সরলতার মধ্যে লজ্জা অনুপস্থিত। তার প্রধান কারণ তিনি পিতা ভিন্ন কোনো পুরুষকে কোনোদিন দেখেননি এবং লোকাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই ফার্দিনান্দকে দেখে সে তাঁর রূপের প্রশংসা করতে সামান্যও সঙ্কোচ বোধ করেননি এবং ফার্দিনান্দের প্রতি নিজের প্রেমাসক্তির কথা অনায়সে প্রকাশ করেছেন। ফার্দিনান্দের প্রতি মিরন্দার প্রথম প্রেম প্রকাশের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং শকুন্তলার কুণ্ঠিত ও লজ্জাশীল মনোভাব তার পেছনে উপরিউক্ত কারণ ছাড়া আরো একটি প্রধান কারণ রয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। নাটকের প্রথম অংশে শকুন্তলার সঙ্গে তুলনায় দুষ্মন্ত চরিত্রের বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শকুন্তলা এক সামান্য আশ্রম বালিকা ও দুষ্মন্ত সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তাই এই প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে শকুন্তলা নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু মিরন্দার ক্ষেত্রে তা নয়। ফার্দিনান্দ এক সাধারণ রাজপুত্র, মিরন্দার প্রায় সমবয়স্ক। তাই উভয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমপ্রকাশে এখানে কোনো বাধা আসেনি। অবশ্য শকুন্তলা চরিত্রও পরবর্তকালে ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছে। যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি প্রেম প্রকাশে সঙ্কুচিতা ছিলেন তিনি পরবর্তীকালে দুষ্মন্তের রাজসভায় দুষ্মন্তের অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। কেন না তখন তিনি পত্নী, রাজমহিষী, ভাবী সন্তানের জননী। তাই তখন তিনি রমণী। দুই নারী চরিত্রের একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন আচরণে অনেকে মনে করতে পারেন দুই কবির মধ্যে বিস্তার ফারাক রয়েছে, শকুন্তলার কবি টেম্পেস্টের কবি থেকে হীনপ্রভ। আসলে তা নয় পরিবেশগত কারণে চরিত্রের ভিন্নতায়ই যে এই দুটি চরিত্র ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা ও মিরন্দা আলোচনায় তাই যৌক্তিকতাসহ ফুটিয়ে তুলেছেন।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দা চরিত্রের আলোচনায় আমরা শকুন্তলা চরিত্রের একটি অংশ আমরা বুঝতে পেরেছি। শকুন্তলার চরিত্রের অন্য অংশ স্পষ্ট করে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রণয়প্রকাশে শকুন্তলার চরিত্রের একটি দিক স্পষ্ট হয়েছে। শকুন্তলার চরিত্রের অন্যদিকে অবশ্যই রয়েছে তাঁর স্বামীর প্রতি তাঁর আচরণ। শকুন্তলা চরিত্রের এই বিশেষ দিক ফুটিয়ে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দেসদিমোনার

সঙ্গে শকুন্তলার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং উভয়ে চরিত্রের আচরনে যে ভিন্নতা রয়েছে তার প্রধান কারণ হিসেবে এই দুই গ্রন্থের শ্রেণিগত পার্থক্যকে দায়ী করেছেন। দুই ভিন্ন শ্রেণির রচনা বলেই উভয়চরিত্রে পার্থক্য এসেছে।

আলোচনার সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র দুই চরিত্রকে একই সঙ্গে তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া বলেছেন। উভয়ের তুলনা করতে গিয়ে দুটি চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমত, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রণয়ীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, দ্বিতীয়ত, উভয়ে বীর পুরুষের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন, তৃতীয়ত, উভয়েই স্বামীকর্তৃক বিসর্জিতা হয়েছিলেন, চতুর্থত, দুজনেই পরম স্নেহশালিনী এবং স্বামীগত প্রাণা, সতী। এই চতুর্থ অংশে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার সঙ্গে দেসদিমোনার সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈসাদৃশ্যকেও তুলে ধরেছেন। আশ্রমে স্বামীচিন্তায় একান্ত নিমগ্না শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ পর্যন্ত শুনতে পাননি। এখানে শকুন্তলার সতীত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশই থাকে না। কিন্তু তুলনায় দেসদিমোনার সতীত্ব আরো গভীর। শকুন্তলা পতিগত প্রাণা হলেও স্বামীর অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কিন্তু দেসদিমোনা শত অপমানেও স্বামীর প্রতি সামান্য দোষারোপও করেননি। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী দেসদিমোনা নিজের মৃত্যুর জন্যে স্বামীকে নয়, নিজেকেই দায়ী করেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেসদিমোনার সঙ্গে শকুন্তলার সাদৃশ্যের আলোচনা করেও তাঁদের বৈসাদৃশ্যও তুলে ধরেছেন। তাঁদের এই বৈসাদৃশ্যের মূলে রয়েছে এই দুটি গ্রন্থের ভিন্নতা। ইউরোপীয় সমালোচকদের মতবাদের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলাকে কাব্য এবং ওথেলোকে নাটক বলে মনে করেছেন। কাব্য অনুভূতিপ্রবণ এবং নাটক প্রকাশমান। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "শেক্সপীয়েরর এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য'। উভয়ের তুলনা হয় না বলেই দুই চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। "শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেসদিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত, শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।" (শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা : বিবিধ প্রবন্ধ সম্পা: ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ৮৭)র সেকারণে দেসদিমোনার উজ্জ্বল আলেখ্যের পাশে শকুন্তলা দাঁড়াতে পারে না। নাহলে উভয়েই ভিতরে শকুন্তলা অধিক মিরন্দা অর্ধেক দেসদিমোনা। বিবাহ পূর্ববর্তী শকুন্তলার মিরন্দার সঙ্গে সাদৃশ্য এবং বিবাহ পরবর্তী শকুন্তলার দেসদিমোনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে।

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য লেখকদের সফল, সার্থক রচনার জন্যে বারোটি সূত্র দিয়েছেন। তিনি লেখকদের যশলাভ ও অর্থ উপার্জনের জন্যে লিখতে নিষেধ করেছেন। যশলাভ ও অর্থ উপার্জনের জন্যে লিখতে গেলে লেখকের মনোযোগ থাকবে এই দুটো বস্তু লাভ করার জন্যে। ফলে লেখা যথাযথ মানে পৌঁছতে পারবে না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। লেখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সৌন্দর্যসৃষ্টি, যার দ্বারা মনুষ্যজাতির মঙ্গল বিধান হয়, এই বিশেষ সত্য মনে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন লেখদের সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যেই লেখা উচিত। স্বার্থ সাধনের জন্যে যাঁরা লেখেন তাঁদের রচিত সাহিত্য জগতের জন্য মঙ্গলকর নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন। আবার লেখার ক্ষেত্রে কয়েকদিন রেখে সেই লেখাকে সংশোধন

করার কথাও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। তিনি মনে করেন লেখার বিষয়কে নিজের অধীত জ্ঞানের সীমার মধ্যে রাখলে তা প্রকৃত সাহিত্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে গেলে লেখার মান নিম্নগামী হয়ে ওঠে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। অযথা অলঙ্কার প্রয়োগ, রসিকতা সৃষ্টি বা ব্যঙ্গের ব্যবহার না করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। আবার অনুকরণ বা অযৌক্তিক বিষয়ের উপস্থাপনও তাঁর মতে কোনো রচনাকে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র এই সব ক্ষেত্র থেকে লেখককে দূরে সরে থাকতে বলেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন একটি জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সাহিত্যের সৎ হয়ে ওঠা খুবই জরুরি এবং এই সৎ বা প্রকৃত সাহিত্য হয়ে ওঠা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে লেখকদেরই ওপর। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন লেখকেরা যদি এই বারোটি সূত্রে মেনে চলেন তাহলে তাঁদের রচনা যথার্থই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠবে ও তাতে জাতির মঙ্গলসাধন হবে।

## ১০.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা

**বিদ্যাপতি :**

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি ছিলেন এবং তিনি মৈথিলি ভাষায় কাব্যরচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ রচনা করেছিলেন। একারণেই তিনি মধ্যযুগে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। চর্তুদশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে তাঁর জন্ম এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর তিরোধান ঘটে। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ ও শিবসিংহের রাজসভাকবি ছিলেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ ছাড়াও তিনি 'ভূপরিক্রমা', 'কীর্তিলতা', 'পুরুষপরীক্ষা', 'কীর্তিপতাকা', 'লিখনাবলী', 'শৈবসর্বস্বহার', 'গঙ্গাবাক্যবলী', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

**গীতিকাব্য :**

'গীতিকাব্য' শব্দটি পাশ্চাত্য 'লিরিক' শব্দ থেকে এখেছে। প্রাচীনকালে লায়ার বা বীণাযন্ত্র সহযোগে যে কবিতা গান করা হত তাকে লিরিক বলা হওঁ। একসময় গানের অধীনতা থেকে এই কবিতা মুক্তি লাভ করে। তবে গান করা না হ'লেও এই শ্রেণির কবিতা তার গীতি ধর্মিতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বঙ্গদেশে জয়দেব এই ধরনের গীতিকবিতার জনক। জয়দেবের এই ধরনের কবিতার ধারা পরবর্তীকালে প্রবলভাবে অনুসৃত হয়। বাংলাদেশে আধুনিক গীতি কবিতার জনক হচ্ছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গীতিকবিতার মধ্যে যেখানে গোষ্ঠীগত প্রাধান্য ছিল, আধুনিক গীতি-কবিতায় সেখানে ব্যক্তিক, অনুভূতি প্রধান হয়ে উঠেছে।

**রামায়ণ :**

রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্য। আনুমানিক খ্রিস্ট-পূর্ব ৩য় শতকে এই মহাকাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে রচয়িতা হচ্ছেন আদিকবি বাল্মীকি। রামায়ণে ৭টি কাণ্ড

রয়েছে— আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা এবং উত্তর কাণ্ড। রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং যুদ্ধে রামের জয়লাভ হচ্ছে এই কাব্যের প্রধান বিষয়। এই গ্রন্থে ৪০ হাজারেরও বেশি শ্লোক রয়েছে। রাম হচ্ছেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। রাবণের পাপে ও অত্যাচারে ত্রিভুবন জর্জরিত হয়ে পড়ে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যে রামের আবির্ভাব ঘটে। অযোধ্যার রাজা দশরথ তাঁর পিতা এবং কৌশল্যা হচ্ছেন তাঁর মাতা। পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে যান এবং রাবণ তাঁর স্ত্রী সীতাকে হরণ করে নিয়ে যায়। রাবণকে হত্যা করে তিনি সীতাকে উদ্ধার করেন এবং পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাম-রাবণের বিবাদের মধ্যে আর্য-অনার্যের বিবাদকে লক্ষ করেছেন।

**মহাভারত :**

মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্য। বেদব্যাস এই মহাকাব্য রচনা করেন। মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডাবের যুদ্ধ। অনুমান করা হয় খ্রি: পূ: ৪ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ৪ শতক পর্যন্ত এর সংকলন কাল। প্রচলিত মহাভারতে ১৮ টি পর্ব রয়েছে। বেশির ভাগ অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। পর্বগুলো হল আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মুসল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহন।

**ভারতচন্দ্র :**

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরসূট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বাল্যকাল থেকে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর একসময় তিনি নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আশ্রয় পান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকবি হন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি— 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত— (ক) অন্নদামঙ্গল বা পৌরাণিক বা লৌকিক অংশ, (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর, (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ। 'অন্নদামঙ্গল' এর তিনখণ্ড ছাড়াও ভারতচন্দ্র সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচলী, ছোটো ছোটো গীতিকবিতা জাতীয় রচনা, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্যরচনা করেন।

**রসমঞ্জরী :**

ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মৈথিলিকবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' কাব্যের আদর্শে ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী' কাব্য রচনা করেন। অবশ্য কবি কোথাও ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী'র উল্লেখ করেননি। তবে ভানুদত্তের কাব্যে যেভাবে কামশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের আদর্শে নায়িকাভেদ, নায়িকাসহায়, নায়কপ্রকারভেদ, নায়কসহায় প্রভৃতি প্রকাশ ভেদ রয়েছে ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতেও তা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ভারতচন্দ্রর এই কাব্যে জয়দেবের রতিমঞ্জরী, বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণ', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনুমান করা হয় ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কাব্যটি রচিত হয়।

**শকুন্তলা :**

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রধান চরিত্র শকুন্তলা। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে তার জন্ম হয়। জন্মের পরেই তার মা-সদ্যোজাত কন্যাকে ফেলে চলে যান। তখন মহর্ষি কণ্ব তাকে লালন পালন করেন। দুষ্মন্ত তাদের আশ্রমে অতিথি হয়ে এলে শকুন্তলা তার প্রতি প্রণয়াসক্তা হন এবং উভয়ের গান্ধর্বমতে বিয়ে হয়। পরবর্তীতে দুর্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলে যান। প্রত্যাখাতা শকুন্তলা কশ্যপ মুনির আশ্রমে আশ্রয় পান। পরে আংটি ফিরে পেয়ে দুষ্মন্তের শকুন্তলার কথা মনে পড়ে যায়। একসময় কশ্যপমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ ঘটে এবং স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে আসেন।

## ১০.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

এই বিভাগের আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্নগুলি দ্রষ্টব্য।

## ১০.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

দ্বাদশ বিভাগের শেষে দ্রষ্টব্য।

* * *

## বিভাগ- ১১
## বিবিধ প্রবন্ধ
### বিবিধ প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ - ২

**বিষয় বিন্যাস**


১১.০ ভূমিকা (Introduction)

১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১১.২ বঙ্গদেশের কৃষক : বিশ্লেষণ ও বিচার

১১.২.১ প্রথম পরিচ্ছেদ — দেশের শ্রীবৃদ্ধি

১১.২.২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — জমীদার

১১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১০.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১১.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১১.০ ভূমিকা (Introduction)

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনা শুধুমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নয়, সমাজ এর মধ্যে গু রুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা মূলত ব্যক্তি ও সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তিজীবনের স্ফুরণ ঘটে তাই সমাজকে কেন্দ্রবিন্দুরূপে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তা, সাহিত্য সৃষ্টি, সমাজ ও অর্থনীতি, ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও ধর্ম এক দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্তি হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ভাবনার সঙ্গে শিক্ষা ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে। সমাজ সংস্কারকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, একজন সমাজ তত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি সমাজকে দেখেছেন। তাই তাঁর শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক ভাবনা প্রবন্ধগুলোর সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

সমাজে কৃষক ও জমিদার শ্রেণির মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তিনি তার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং কৃষকের প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরেছেন। বাহ্যিক দিক থেকে আমাদের সমাজের অনেক অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে এই উন্নতি শুধু সে একশ্রেণির মানুষের এবং অন্যশ্রেণির যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তায় সেই বাস্তব চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূল মন্ত্র প্রচার করেছেন। আবেগ উচ্ছ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিহার করে বাস্তব তথ্যনিষ্ঠভাবে কৃষকদের প্রতি বঙ্গদেশের জমিদারদের নির্যাতন, শোষণ, রাষ্ট্রীয় আইন বিশেষ করে লর্ড

কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বঙ্গদেশের কৃষকদের চরম দুর্গতি ও তারে জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতিশীল মনের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে তাঁর চিন্তাশীল মননধর্মিতাও। শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি বিষয়ক এই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের 'প্রথম পরিচ্ছেদ— দেশের প্রবৃদ্ধি' এবং 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— জমীদার' প্রবন্ধ আমরা আলোচনা করতে পারি।

## ১১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আমরা ইতিমধ্য 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধগ্রন্থের আলোচনায় পূর্ববর্তী বিভাগ অতিক্রম করে একাদশ বিভাগে এসে উপস্থিত হয়েছি। পূর্ববর্তী বিভাগগুলিতে আমরা এই প্রবন্ধগ্রন্থের বিভিন্ন আলোচনা করে সেগুলোর বিশ্লেষণাত্মক ভাবনা তুলে ধরেছি। এখন এই বিভাগে আমরা আলোচনা করব 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের দুটি পরিচ্ছেদ। সেগুলি হল :

১. বঙ্গদেশর কৃষক, প্রথম পরিচ্ছেদ— দেশের শ্রীবৃদ্ধি

২. বঙ্গদেশর কৃষক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— জমীদার

এই আলোচনার শেষে আমরা জানতে পারব—

১. বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হলেও দেশের প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি হচ্ছেনা কেন?

২. বঙ্গদেশের কৃষকদের ওপর ভূস্বামীদের অত্যাচারের স্বরূপ।

(বি: দ্র : 'জমীদার' এই বানানটি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন।)

## ১১.২ বঙ্গদেশের কৃষক : বিচার ও বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি মূলত বঙ্গদেশের কৃষকদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করেন। এই দীর্ঘ সময় বঙ্গদেশের কৃষকদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পূর্বে যেখানে কৃষকরা জমিদার শ্রেণিদ্বারা পীড়িত হত, এখন বহুক্ষেত্রে বিপরীত দৃশ্যই চোখে পড়ে। কিন্তু তাই বলে প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি। এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হওয়ার পাঁচটি প্রধান কারণ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

প্রথমত, প্রবন্ধটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে । ইতিহাসবেত্তারা প্রবন্ধটি থেকে পঁচিশ বছর পূর্বেকার বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর সমাজে প্রভূত পরিবর্তন আসে, বিশেষ করে কৃষকদের অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। তাই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয় রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তৃতীয়ত, সমাজের বহুক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নতি হলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক'

প্রবন্ধে বর্ণিত কৃষকদের দুরবস্থা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিদুরিত হয়নি, অনেক অংশে এখনও তা বিদ্যামান যে কারণে প্রবন্ধটির গুরুত্ব সেকারণে স্বীকার করেন তা পুনর্মুদ্রণের আবশ্যিকতা রয়েছে। চতুর্থত, প্রবন্ধটি প্রকাশের পর প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছিল। তাই এটি পুনরায় মুদ্রিত হওয়া দরকার। পঞ্চমত, 'বঙ্গদর্শন' -এর 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের কিছু অংশ পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। বর্তমানে 'সাম্য' প্রবন্ধ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রিত করতে চান।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির মধ্যে অর্থশাস্ত্রের কিছু কথা রয়েছে। অর্থশাস্ত্র ঘটিত তাঁর এই ভাবনা ভ্রান্তিশূন্য বলে তিনি মনে করেন না। তবে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনটি ভ্রান্ত এবং কোনটি ধ্রুবসত্য তা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। তাই কোনো সংশোধন না করেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেন।

বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'জমীদার' তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'প্রাকৃতিক নিয়ম' এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'আইন'। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে এই নির্দিষ্ট বিষয়গুনোর তিনি বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা করেছেন।

## ১১.২.১ প্রথম পরিচ্ছেদ — দেশের শ্রীবৃদ্ধি

প্রবন্ধটির প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দেশের শ্রীবৃদ্ধি। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দেশের আপাত শ্রীবৃদ্ধির মধ্য নিরীক্ষণ করেছেন দেশের সাধারণ কৃষকদের চরম দুরবস্থা। দেশের এই শ্রীবৃদ্ধি মূলত ঘটেছে কিছু মুষ্টিমেয় উঁচুতলার মানুষের। সাধারণ মানুরে অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বাহ্যিক কিছু উন্নতির বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, টেলি যোগাযোগের উন্নতিতে অত্যন্ত দ্রুত খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, তৃতীয়ত চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। চতুর্থত, সুরক্ষিত রড় বড় রাস্তা তথা তথাকথিত রাজপথ তৈরি হয়েছে, পঞ্চমত গ্যাসের আলোয় পূর্বের অন্ধকার দূর হয়েছে, ষষ্ঠত বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মানুষ নানা ধরনের জ্ঞান লাভ করে যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। আপাতভাবে এগুলোর মধ্য দিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ করা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এর মধ্যে দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি দেখতে পাননি। কেন না সমাজের অধিকাংশ মানুষ, যারা কৃষিজীবী তাদের কিন্তু কোনো উন্নতি হয়নি। সাধারণ কৃষকের দুই প্রহরের প্রখর রোদে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলে তারা কর্দমাক্ত জলপান করে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যার আধপেটা খেয়ে তারা কোনোরকমে জীবন নির্বাহ করে, রাতে ছেঁড়া মাদুরে না হয় ভূমিশয্যায় গোয়াল ঘরের পাশে মশার কামড় খেয়ে ঘুমুতে যায়। পরদিন যে নতুন বিপদ আসবে না তা কে বলতে পারে। যাওয়ার সময় হয়ত জমিদার বা মহাজন দেনার দায়ে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। হয়তো জমিদার চাষ করার সময় তার জমি কেড়ে নেবে।

প্রকৃতপক্ষে সরকার ও শিক্ষিত মহল এই সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের মঙ্গলের কথা কিছুই চিন্তা করেন না। দেশের প্রকৃত উন্নতির আসল কথাই হল দেশের আপামর জনসাধারণের মঙ্গল বিধান। দেশের অধিকাংশ লোকেই কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবী সমাজের মঙ্গল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কোথাও দেখতে পাননি। তাই দেশের এই আপাত শ্রীবৃদ্ধিতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নেই বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন।

অতপর বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে দেশের কীভাবে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে এবং কৃষকেরা যে সেই শ্রীবৃদ্ধির অংশীদার নন যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে সমাজের এই অবস্থার জন্যে কারা দায়ী সবশেষে বঙ্কিম যে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রধানত চাষ বৃদ্ধির কারণে হচ্ছে। চাষবৃদ্ধি হচ্ছে মূলত দুটি কারণে। প্রথম কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্য বৃদ্ধি। ইংরেজ আমলে সমাজে সুশাসন এসেছিল, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জীবন অনেক সুনিশ্চিত হয়েছিল। রাজা বা রাজকর্মচারীদের প্রজাদের সঞ্চিত অর্থ অপহরণের ঘটনা বিরল হয়ে পড়েছিল। নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ভোগ করার নিশ্চিত আশ্বাস মানুষ পেয়েছিল। তাই সংসারী হয়ে নিশ্চিত মনে সাধারণ মানুষ সংসার ধর্ম পালন করতে শুরু করেছিল। তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এবং এই প্রজাবৃদ্ধির কারণেই কৃষিকার্যের বিস্তার ঘটে। বাড়তি লোকের প্রতিপালনের কারণেই পূর্বের পতিত জমি আবাদ হতে শুরু হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূবের সময়কাল অপেক্ষা এখন অনেক বেশি ভূমি কর্ষিত হচ্ছে।

চাষবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাণিজ্যের মূলে রয়েছে বিনিময় প্রথা। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্য মূলত বিনিময় প্রথার ওপর নির্ভরশীল। ইংলণ্ডে থেকে যে দ্রব্য সামগ্রী আমরা বাণিজ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করি, বিনিময়ে আমাদের কৃষিজাত সামগ্রী পাঠাতে হয়, যেমন চাউল, বেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত সামগ্রীরও বৃদ্ধি পেতে হবে। তাই স্বাভাবিক ভাবে চাষ বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সামাজ্যভুক্ত হয়ে ত্রদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বৃটেনে পাঠানোর জন্যে কৃষিসামগ্রীরও প্রয়োজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এদেশের চাষও বাড়ছে।

চাষবৃদ্ধির ফলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বঙ্কিম এখানে লক্ষ করেছেন যে কৃষিজাত সামগ্রী বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি হচ্ছে এবং এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে এক শ্রেণির মানুষের ক্ষোভের সীমা নেই। তাদের মতে দেশের এখন অত্যন্ত দুঃসময়। ইংরেজের প্রজীপীড়ক মনোভাব ও অধর্মাক্রান্ত কলিযুগের কারণেই দেশের এই দুরবস্থা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অর্থনীতির দিক থেকে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূল্যায়ন করেছেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির অর্থ এই দ্রব্যসামগ্রী দুর্মূল্য হচ্ছে এবং টাকা সস্তা হচ্ছে। এককথায় এর ফলে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে। কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধির কারণ জমি বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্বিতীয় কারণ ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে।

কৃষক জমিদারেরা জমি চাষ করে কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদন করে। কিন্তু তার উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি জনিত টাকা কিন্তু কৃষকের ঘরে আসে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই অর্থ কোথায় যায় যে সম্বন্ধে বাস্তব তথ্য তুলে ধরেছেন।

প্রথমত, সেই অর্থ যায় রাজভাণ্ডারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর পর থেকে নানা কারণে কর বৃদ্ধি হচ্ছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র শক্‌সাহেবের মতামত তুলে ধরেছেন। শক্‌সাহেবের মতে তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নতুন পয়স্তি ভূমির উপর করসংস্থাপন, খাসমহলের করবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে করবৃদ্ধি হচ্ছে। কৃষিজাত ধন থেকেই সরকারের পূর্বের তুলনায় সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হচ্ছে। এছাড়া কাস্টমস হাউসের দ্বারাও রাজভাণ্ডারে অর্থ যাচ্ছে, যার অধিকাংশই কৃষিজাত ধন।

শুধু রাজভাণ্ডারেই নয় বণিক ও মহাজন সম্প্রদায়ও এই অর্থের অংশীদার হচ্ছে। কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাজনদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহাজনদের কাছ থেকেই প্রয়োজনে কৃষকেরা ধান গ্রহণ করেন। বণিকেরা ফসল বিক্রি করে তা থেকে লাভ করে।

সবচেয়ে বেশি টাকা ভূস্বামীদের হাতে যায়। কৃষকের নিজস্ব জমি নেই। জমিদারের জমিতেই তারা চাষ করে। জমিদারের মনোরঞ্জন করতে না পারলে সেই জমি চাষ করার অধিকার তারা হারায়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির খাজনাও বৃদ্ধি হয়েছে। একজন অধিক খাজনা দিতে অপরাগ হলে অন্যজন সহজেই তা দিয়ে জমিদারের অধিকার লাভ করে। এই বাড়তি অর্থ জমিদারই লাভ করেন।

এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে দেশের অধিকাংশ ভূমির কর বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থনীতির হিসেবে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি হলে সেভাবে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেইভাবে জমির চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় জমির খাজনা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই বর্ধিত অর্থ জমিদারের ভাঁড়াতেই সঞ্চিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রর চিন্তাধারা কখনত একদেশদর্শী ছিল না। তিনি বিপরীত যুক্তি তুলে ধরতেও ইতস্তত করেননি। প্রজাদের ওপর করবৃদ্ধিজনিত দুষ্কর্মের ক্ষেত্রে নানা প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে। এর প্রধান হচ্ছে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা। দ্বিতীয় হচ্ছে জমিদারের মধ্যেও তো মানবিক গুণ- দয়া, ধর্ম থাকে। তাঁরা অযথা প্রজাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারই বা করবেন কেন। বিরুদ্ধ এই মতবাদ বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডন করেছেন । আইন বৃটিশ শাসনে প্রহসন মাত্র। সেখানে সুবিচার পাওয়া অলীক কল্পনা মাত্র। আর জমিদারের দয়া-ধর্ম দুর্ব্যবহারের চরম সীমায় পৌঁছে আর্বিভূত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জমিদারা কৃষকদের নিকট থেকে করধার্যজনিত টাকা কোথাও তিন গুণ, কোথায় চারগুণ, কোথায় বা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষকের পরিশ্রমজনিত ও প্রকৃতি প্রদত্ত কৃষিধনের ভাগ সকলেই পেয়ে থাকে কিন্তু যে চাষ করে যে কী লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেন—

"ঈশ্বর প্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক পায়েন, মহাজন পায়েন— কৃষী কি পায়। ... যে সামান্যভাগ কৃষক সম্প্রদায়

পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।" (পৃ : ৩৭১)

তাই দেশের শ্রীবৃদ্ধির অর্থে রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু সহস্রজনের মধ্যে নশ' নিরানব্বই জনের অবস্থার সামান্যও হেরফের ঘটে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র দেশের এই তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধিকে দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি বলে মেনে নিতে অপারগ।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি পুর্ণমুদ্রিত হওয়ার প্রধান কারণগুণো উল্লেখ করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের 'প্রথম পরিচ্ছেদ — দেশের শ্রীবৃদ্ধি' অবলম্বনে বঙ্গদেশের বাহ্যিক উন্নতির বর্ণনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

দেশের বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধিতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল নেই বলে বঙ্কিমচন্দ্র কেন মনে করেন, লিখুন। (২০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

দেশের চাষবৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো বর্ণনা করুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

কৃষক চাষ করেও কেন দরিদ্র থেকে যাচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণ করুন। (১৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ১১.২.২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — জমীদার

আসুন, এবার আমরা বঙ্গদেশর কৃষক'- প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদর নাম দিয়েছেন 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— জমীদার'। এই পরিচ্ছেদকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারের অত্যাচারে কৃষকদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয় অংশে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাচারী জমিদারদের পাশে, স্বল্পসংখ্যক কল্যাণকামী জমিদারদের কথাও বলেছেন। তিনি 'জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী' বলে তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেছেন। জমিদার কৃষকের পক্ষে যে কীরকম ভয়ঙ্কর শত্রু তার পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিম পরিচিত জগত থেকে উদাহরণ তুলে এনেছেন। জীব জগতে যেভাবে দেখা যায় বাঘ প্রভৃতি হিংস্র পশু ছোটো ছোটো দুর্বল পশু খেয়ে নেয়, রুই মাছ যে রকম ছোটো ছোটো পুঁঠি মাছগুলোকে গ্রাস করে, বাঙালি অত্যাচারী জমিদাররাও সে রকম বঙ্গদেশের অসহায় দরিদ্র কৃষকদেরকে ভক্ষণ অর্থাৎ শোষণ করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দুঃখ করে বলছেনযে এই লোভী অত্যাচারী জমিদাররা সরাসরি কৃষকদেরকে উদরস্থ করছেন না সত্য কিন্তু তাদেরকে যেভাবে শোষণ করছেন তা হৃদয়শোণিত পান করা অপেক্ষাও নির্মম কাজ। কৃষকেরা কৃষি কাজ দ্বারা কোনোরকমে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে পারত। কিন্তু জমিদাররা তাদের যে সুযোগ দেন না। তাদের কাছ থেকে জমিদাররা রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করে জন্যে তাদেরকে অভুক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান।

বঙ্গদেশের জমিদার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। জমিদারদের প্রতিবিদ্বেষ বশত যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন তা কিন্তু নয়। কোনো জমিদার বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হননি। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক জমিদার বন্ধুও রয়েছেন। বাঙালি জাতির শীর্ষে রয়েছেন এই জমিদারেরা। সকলেই জমিদারের প্রীতিভাজন হয়ে উঠতে চান। কিন্তু অসহায়, দরিদ্র, শোষিত, নির্যাতিত কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের দৈন্যদশা সকলের সামনে তুলে ধরে তার জন্যে সামান্য প্রতিকারের চেষ্টা করতে এগিয়ে আসেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পারেন এর দ্বারা হয়তো

তিনি জমিদার শ্রেণি দ্বারা তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত হতে পারেন বা উপহাসের পাত্র বা মর্যাদাচ্যুত হতেও বিচিত্র নয়। বহু বন্ধুর অপ্রীতিভাজন হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার কর্তব্যচ্যুত হতে রাজী নন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকের কাছে মূর্খ, মিথ্যাবাদীবলে চিহ্নিত হতে পারেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রধান দায়িত্ব কিন্তু তাই। অকুণ্ঠিত, নির্ভীকভাবে সত্য প্রকাশ করাই সাময়িক পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিপীড়িত মানুষের জন্যে বঙ্গদর্শনের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন— "যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক"। (পৃ: ৩৭৩ )

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের প্রজাশোষণের বাস্তব কলাকৌশলগুলো নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। বাঙালি কৃষক চাষ করে যে ফসল উৎপাদন করে তা তার প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য । এই ফসল থেকেই তাকে চাষের খরচ, বীজের মূল্য কৃষাণের বেতন, গোরুর খাদ্যের সঙ্গে অন্যান্য নানা আনুষঙ্গিক খরচ যোগাতে হয়। সবকিছুর পরে যা থাকে তা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষার সময় অভাবগ্রস্ত কৃষককে মহাজনের কাজ থেকে যে ধান গ্রহণ করতে হয়েছিল এখন দেড়গুণ সুদ দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। শ্রাবণ মাসে ধান শোধ করতে কিছু ধান দিয়েছে, পৌষমাসে তার বাকিটা শোধ করতে হবে। সব কিছু দিয়ে যা অল্প বাকি থাকে তা থেকে জমিদারের খাজনা দিতে হয়। তারপর যে অবশিষ্টাংশ বাকি থাকে তার দ্বারা কৃষকের দিনপাত হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু সেটুকুও হয়তো কৃষকের ঘরে থাকে না। বঙ্কিম কাল্পনিক পরাণ মণ্ডলের বাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কন করে কৃষকের অসহায়তা ও শোষণের স্বরূপ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

পৌষমাসে ধান কেটে কৃষককে পৌষের কিস্তি খাজনা দিতে হয়। বাকিটা বিক্রিযোগ্য করে হাটে বিক্রি করে সারা বছরের খাজনা শোধ করতে জমিদারের কাছারীতে উপস্থিত হল। পরাণমণ্ডলের পৌষের কিস্তি ছিল পাঁচ টাকা। তার মধ্যে চার টাকা শোধ ক রে তার বাকি থেকেছে একটাকা। এখন চৈত্রের কিস্তি তিনটাকা সমেত মোট পাঁচ টাকা নিয়ে যে চৈত্রের ঋণ শোধ করতে এসেছে। কিন্তু গোমস্তা হিসেব করে বলে পৌষের কিস্তি তিনটাকা বাকি রয়েছে । পরাণ প্রতিবাদ করল। কিন্তু তার প্রতিবাদে কোনো কাজেই লাগল না। আবার অতিরিক্ত প্রতিবাদে তিনটাকা তেরো টাকাও হয়ে উঠতে পারে। তাই পরাণ মণ্ডলকে তিনটাকা ঋন স্বীকার করতেই হয়। গোমস্তা তারপর পরাণের ঋণের হিসাব করে। টাকায় চার আনা জমিদাবের সুদ, গোমস্তার হিসাবানা টাকায় দু-পয়সা, তারপরে পার্বণী। নয়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরী, পাইক সকলেই পার্বণীর ভাগীদার। এখানে নায়েবের দোষ নেই, কেন-না দারোয়ানের যে বেতন, নায়েবেরও সেই বেতন। তাই তাকে তো বাড়তি টাকা রোজগার করতে হবে। জমিদারের প্রাপ্য সম্পূর্ণ মিটে গেলে নায়েব সম্বন্ধে জমিদারের বলার তো আর কিছুই নেই।

আষাঢ় মাসে নববর্ষর পুণ্যাহ উপলক্ষে দু-টাকা খাজনা দেয়। আবার খাজনার অতিরিক্ত জমিদারকে কিছু নজর দিতে হয়। জমিদারের আবার অনেক শরিক আছেন,

তাঁদের সকলকেই নজর দিতে হয়। তারপর আবার নায়েব মশাইও নজর পাওয়ার তালিকায় রয়েছেন। গোমস্তা মশাইও নজর পাওয়া থেকে বাদ পড়েন না। তাই প্রজার সমস্ত অর্থ নজর দিতে দিতেই শেষ হয়ে গেল।

জমিদার ও জমিদার সংশ্লিষ্ট নজর দিতে দিতে পরাণ ঘরে এসে দেখল হাতে আর অবশিষ্ট কিছুই নেই। কিন্তু চাষেয় সময় আসন্ন। এই চাষের খরচ যোগতে গিয়ে পরাণ কিন্তু ভয় পায় না । কারণ প্রতি বছরই তো তার এরকম অবস্থা হয়ে থাকে । এরকম বিপদে মহাজনই তার ভরসা। তাকে ম হাজন আবার নতুন করে ঋণ দেন। 'দেড়ী'সুদে পরাণ ধান নিয়ে ঘরে এল। আগামী বছর আবার ঋণ পরিশোধ করে পরাণ নিঃস্ব হয়ে যাবে। যে মহাজনের কাছ থেকে পরাণ ঋণ গ্রহণ করে তিনিই হয়তো জমিদার। গ্রামের ধানের গোলাবাড়ি থেকে তিনি প্রজাকে ধান ঋণ দেন, তার কাছ থেকে দেড়ী সুদ আদায় করেন। তাই যত শীঘ্র তিনি প্রজার অর্থ অপহরণ করতে পারেন, ততই তার লাভ।

আবার সব বৎসর সমানভাবে ফসল উৎপাদিত হয় না। কোনো বছর ভালো ফসল হয়, কোনো কোনো বছর বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কীটপতঙ্গের দৌরাত্ম্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভালো ফসল উৎপাদিত হয় না। পরিবেশ অনুকূল দেখলে মহাজন ঋণ দেশ, প্রতিকূল দেখলে মহাজন কৃষকের শত অনুরেধেও তাকে ঋণ দেন না, কেন-না ফসল না ফললে কৃষক কখনও অন্নভাবে সপরিবারে মারা যায়, কখনও অখাদ্য কুখাদ্য বন্য ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, কখনও বা রিলিফ, কখনও ভিক্ষা ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়। আর কিছুই না হলে ভগবানই নির্ভর। কৃষকের এই দুর্দিনে কোনো জমিদারই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন না। পরিবেশ অনুকুল হলে পরাণ মহাজনের কাছ থেকে ঋণ পায়।

কিন্তু ইতিমধ্যেই ভাদ্রের কিস্তি মাস যায়। পেয়াদা কিস্তি আদায়ে আসে। এবং ঋণের মাত্রা মিথ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। পরাণ ক্ষোভে পেয়াদার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় জাড়িয়ে পড়ে। পেয়াদা জমিদারের কাছে অভিযোগ করে। পরিণামে পরাণের জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা দিতে না পারলে তাকে জমিদার আটক করে রাখেন। থানায় নালিশ করেও কোনো ফল হয় না । কারণ থানা জমিদারের বেতনভুক। থানার কনস্টেবল বৎসরে দুই তিনবার জমিদারের কাছ থেকে পার্বণী পান, যেদিন পরাণের পরিবারের অভিযোগ পেয়ে জমিদারবাড়িতে তল্লাশী করতে যান। সেদিন তার অর্থ প্রাপ্তির ফলে ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে আর সঠিক খবর পৌঁছয় না।

শুধু খাজনা বাকি থাকার জন্যে নয়, আরো নানা কারণে প্রজাকে ধরে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। হয়তো গোমস্তাকে হাত করে কোনো প্রজা পরাণের বিরুদ্ধে তার কাছে মিথ্যে অভিযোগ করল। সেই অভিযোগ গুলোর হয়তো সঠিক কোনো ভিত্তিই নেই। " পরাণ আমাকে লইয়া খায় না", "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে," "পরাণের বিধবা ভ্রাতৃ বধূ গর্ভবতী হইয়াছে" প্রজাদের এরকম নানা অযৌক্তিক অভিযোগে জমিদারের পেয়াদা নানা সময়ে পরাণকে ধরে আনে। আবার সময়বিশেষ বিশেষ বিশেষ

মূল্যের বিনিময়ে পরাণ মুক্তিও পায়। পরাণ আবার চাষ আবাদে মন দেয়। অগ্রহায়ণে তার উত্তম ফসল ফলল। সে সময়ে হয়তো জমিদার গৃহে অনুষ্ঠান হবে। হয়তো জমিদারের দৌহিত্রীর বিয়ে অথবা ভ্রাম্পুত্রের অনুপ্রাশন। আবার পরাণসহ সমস্ত প্রজাদের ওপর নজর দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল। প্রজাদের কাছ থেকে নজরের পাঁচ হাজার টাকা উঠলে দু-হাজার অনুপ্রাশনে লাগবে, বাকি তিন হাজার জমিদারের সিন্দুকে উঠবে।

জমিদারের নির্ধারিত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হলে স্বয়ং জমিদার মহলে পদার্পণ করেন। যার ঘরে যা আছে পাঁঠা, মাছ. আলু , কপি, বেগুন, দই, দুধ সব কিছু কাছারীতে জমা পড়তে লাগল। জমিদারকে 'আগমনী' 'নজর' বা 'সেলামি' না দিলে তো চলে না। তার ওপর নজর টাকার অঙ্কে দু-আনা দুধ বসল। যারা এতটা দিতে পারে না তারা কয়েদ হয় বা তাদের দেনা বাকির সামিল হয়।

পরাণমণ্ডল জমিদারের নজর দিতে পারল না। কিন্তু তার জমিতে উত্তম ফসল ফলেছে। কৃষকের ফসলে জমিদারের ভারী লোভ। তাই গোমস্তা আদালতের সাহায্যে ক্রোকের ব্যবস্থা করল। আদালতের পেয়াদার উপস্থিতিতে জমিদারের লোক পরাণের সমস্ত ধান কাছারীতে পাঠিয়ে দিল। পরাণ একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। অবশ্য শেষবারের মতো ন্যায় বিচারের আশায় পরাণ আদালতে নলিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তার তো টাকা পয়সা ধন সম্পদ কিছুই নেই। হাল-বলদ ঘটি বাটি বিক্রি করে যে আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করল। জমিদারও পালটা পরাণের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারের ভয়ে সাক্ষীরা সব জমিদারের পক্ষেই বলল। ফলে আদালতের বিচারে পরাণের পরাজয় হল। উপরন্ত তার ওপর পাল্টা শাস্তির বোঝা চাল প্রথমত পরাণকে মোকদ্দমার খরচা দিতে হবে।

জমিদারের ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলার খরচ চালিয়ে, পরাণের ঘরে, আর কানাকাড়ি বলতে কিছুই নেই। জমি বেচে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করল। জমি না থাকলে জেলে গেল বা দেশ থেকে পলায়ন করল।

কল্পিত চরিত্র এই পরাণ মণ্ডলের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে কৃষকের প্রতি জমিদারের শোষণ বর্ণনা করেছেন। জমিদার যে কৃষকদের কীভাবে কত ধরেণের অত্যাচার কয়েন তার চিত্রই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জমিদাররা কৃষকদের অত্যাচার করা ছাড়াও অর্থ আদায়ে যে কত ধরনের পন্থা অবলম্বন করে থাকেন বঙ্কিমচন্দ্র যে বিষয়েও এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নিয়মে জমিদারবা অর্থ আদায় করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে এখানে একটি সত্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বন্যাক্রান্ত একটি গ্রামেয় মানুষের সমস্ত ধান বিনষ্ট হল, গোরুর অনাহারে মৃত্যু হতে লাগল। এসময়ে জমিদারের অবশ্য কর্তব্য থাকে প্রজাদের সাহায্য করা। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাক জমিদারের গোমস্তারা এই সময় পাইক পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে খাজনারও অতিরিক্ত 'বাজে' আদায়ে দলবল সহ উপস্থিত হল। প্রথমেই তিনি নজরের একটি তালিকা তৈরি ফেলেন। এই দুঃখের দিনে প্রজারা অতি কষ্টে জমিদারের নজর মিটিয়ে দেয়। আবার তিন-চার দিন পরে জমিদারের কন্যার

বিবাহ উপলক্ষে জমিদারের লোকেরা আবার এসে নজর আদায়ে উপস্থিত হয়। প্রজারা নিরুপায় হয়ে ঋণের জন্যে নীলকুঠিতে গেল, মহাজনের কাছে গেল, কিন্তু শূন্যহাতে তাদের ফিরে আসতে হল। তারপর আদালতে গিয়ে নলিশ করল। বিচারে আসামীদের সাজা দিলেন বটে কিন্তু আইন অনুসারে আসামীদের খালাস দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত এই বিবরণ কিন্তু কাল্পনিক নয়। এই সমস্ত ঘটনা তিনি 'ইণ্ডিয়ান অবজর্বর' থেকে গ্রহণ করেছেন। গ্রামাঞ্চলে এই রকমের দৌরাত্ম প্রায় চলতেই থাকে। যে বিভিন্ন খাতে প্রজাদের কর দিতে হয় তার মধ্যে পুন্যাহ, জমিদারের পাঁচ শরিকের নজর, গোমস্তার নজর , পিয়াদার তলবানা, নৌকাভাড়া, সদর আমলার পূজার পার্বণী, পুরোহিতের ভিক্ষা ইত্যাদি রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই তালিকার শেষ বি,য় 'ডাক টেক্স'বর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে মফঃস্বলে এই খরচ যেহেতু জমিদারকেই বহন করতে হয়, তাই তিনি এই খরচ সংকুলান করার জন্যে প্রজাদের ওপর ট্যাক্স বসাল। রোড্সেস্ টাকায় এক পয়সার পরিবর্তে চার আনা ধার্য করা হল। একজন প্রজা তা দিতে আপত্তি করায় জমিদার তার ওপর অত্যাচার শুরু করেন। প্রজা আদালতে নালিশ করলে আইন অনুসারে আসামী খালাস পেল না। এই জমিদার শ্রীঘরে বাস করার জন্যে আর্দিষ্ট হলেন।

সবচেয়ে কৌতুককর ব্যাপার হল হাসপাতাল সম্বন্ধীয়। চব্বিশ পরগনার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সাবডিভিসনে একটি হাসপাতাল স্থাপন করার উদ্দেশ্যে জমিদারদের নিয়ে একটি সভা করেন। সব জমিদারই কিছু মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু জমিদার এই চাকা নিজের কোষাগার থেকে খরচ চান না। সেটা তিনি প্রজাদের কাছ থেকেই আদায় করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি প্রজাদের ওপরে টাকায় এক আনা আদায় করার আদেশ হয়। হাসপাতাল তৈরি হল না কিন্তু কর আদায় করা ঠিকই চলতে লাগল।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শোষক জমিদারের চিত্রই অঙ্কন করেননি। বহু জমিদারের সদ্‌গুণ নিয়েও আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের শুরুতেই এই ধরণের জমিদারদের কথা উল্লেখ করতে ভুলেননি। প্রথমত, অত্যাচারী জমিদারদের পাশে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন কলকাতায় বহু সুশিক্ষিত ভূস্বামী রয়েছেন যাঁরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ভূস্বামীদের অজ্ঞাতে বা মতের বিরুদ্ধে তাঁর নায়ের বা গোমস্তারা প্রজাদের শোষণ করেন। শুধু শহরেই নয় মফঃস্বলেও এরকম জামিদার আছেন যারা প্রজাদের শোষণের পক্ষপাতীই নন। বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন বড় বড় জামিদাররা নন ছোট ছোট জমিদারই শোষণের পক্ষপাতী। বড় জমিদারের জামিরের রোজগার কম হওয়ার কারণে তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করে জমিদারী ঠাট বাট বজায় রাখতে চান। এঁদের আবার সতনীচার, দরপত্তনীদার, ইজারাদার রয়েছে, তাদের দৌরাত্ম আরো বেশি। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের যে সফল অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের অজ্ঞাতে ঘটে থাকে । নায়ের গোমস্তারাই লোভের বশবর্তী হয়ে এ-ধরনের অপকীর্তি করে থাকেন। প্রজার ওপর যে এ-ধরনের অত্যাচার হয় জমিদারদের অনেকেই তা জানেন না।

তৃতীয়ত, অনেক জমিদারীর প্রজারাও ভালো নয়। পীড়ন না করলে তারা খাজনা দিতে চায় না। আবার সকল প্রজার ওপর অত্যাচার করলে আবার জামিদারদের হিতে বিপরীত হতে পারে। তার সাধারণত প্রজার ওপর আগে অত্যাচার না হাল প্রজারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সদগুণেরও অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করেছেন। কিছু কিছু জমিদার যে রকম অত্যাচারী, প্রজা পীড়ক, তেমনি অনেক জামিদারই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নানা সৎকাজও করে থাকেন। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় স্থাপন, অতিথিশালা নির্মাণ যার দ্বারা গ্রাম্য লোক প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়ে থাকে, জমিদারগণ সেই মহৎ কাজগুলো নিজেদের উদ্যোগেই করে থাকেন। জমিদারদের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন্' এর ফলেই এদ্দেশীয়রা ইংরেজদের সামনে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সাহস রাখেন।

তাই জমিদারদের শুধু নিন্দা করা উচিত নয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। তবে জমিদাররা যে প্রজাদের শোষণ ও অত্যাচার করে থাকে তা নিবারণ কবার চেষ্টা জামিদারদেরই করা উচিত বলে বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত ব্যক্ত করেন। জামিদারগোষ্ঠীর একাংশ মাত্র দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তবে সেটা সমস্ত জমিদার গোষ্ঠীরই কলঙ্ক। তাই সেই কলঙ্ক দূর করার দায়ভারও তাদেরই এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশে এসে এতক্ষণে তাঁর এই প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, "এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। — সেই কথা বালিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা।" বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গদেশের কৃষক, সম্পা: ভবানী গোপাল সান্ন্যাল মর্ডাণ বুক এজেন্সী দ্বিতীয়, সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ: ৩৮৪) জমিদাররা কীভাবে সেই কলঙ্ক অপনোদন করতে পারবেন তারও কিছু সূত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। স্বজাতির প্রতি বিরাগ, স্বজাতির মধ্যে অপমান করলে যে অপমানবোধ জাগে তা সকল দণ্ড অপেক্ষা গুরুতর বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। মানুষের চৌর্যবৃত্তি প্রতিবেশীদের কাছে ঘৃণিত হওয়ার ভয়ে যে রকম ভাবে অবদমিত থাকে, নিজেদের সমাজের অপরাপর জমিদারদের কাছে ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে অনেক অত্যাচারী জমিদার প্রজাদের প্রতি অত্যাচার থেকে বিরত থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র জামিদারদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশন্কে এ বিষয়ে সচেনত থাকতে অনুরোধ জানান। এই সংগঠন যদি দুর্বৃত্ত জামিদারদের শাসন করার জন্যে এগিয়ে আসে, তাহলে অবশ্যই সমাজ থেকে জমিদার কর্তৃক প্রজাশোষণের রীতিটি দূর হয়ে যাকে। এতে সমাজের মঙ্গল সাধন হবে এবং যাঁরা এই কাজে এগিয়ে আসবেন তাঁদের মাহাত্ম্য পৃথিবী ইতিহাসে অনন্তকাল ধরে কীর্তিত হবে। প্রজাশোষণ যদি দূর না হয় তাহলে দেশের মঙ্গলের কোনো আশাই থাকেব না। যিনি এই কাজ করতে প্রথমে এগিয়ে আসবেন তিনি অবশ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পূজিত হবেন। কাজটি যে দুরূহ সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন'- এর কার্যাধ্যক্ষরা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী এবং কার্যক্ষম। তাঁরা ইচ্ছা করলে সমাজের এই কলঙ্ক দূর করার নানা উপায় অবশ্যই বের করতে পারবেন। তাঁরা যদি এই বিষয়ে কোনো আগ্রহ না দেখান তাহলে সেটা তাঁদেরই অখ্যাতি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে কৃষককের দুর্গতির যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রের চাকরি সূত্রে তিনি বঙ্গদেশের বহু জায়গায় ঘুরেছেন এবং একই সঙ্গে জমিদারও কৃষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর তথ্যসন্নিবেশিত আবেগ বাস্তবগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে পরাণ মণ্ডল নামক একজন কাল্পনিক কৃষকের জমিদারদের অত্যাচারে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনা থেকে। অবশ্য জমিদারী কুশাসন যে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর (১৭৯৩) কারণে ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে যে বিষয়ে কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন 'চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়' আজিও প্রায় সমান সত্য।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

কৃষক কেন মহাজনদের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে যায় 'বঙ্গদেশর কৃষক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — জমীদার" অবলম্বনে লিখুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

চৈত্রের ঋণ শোধ করতে এসে জমিদারের কাছে কৃষকদের কীভাবে নাজেহাল হতে হয়ে 'বঙ্গদেশর কৃষক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ — জমীদার" অনুসরণে সে বিষয়ে নিজের ভাষায় লিখুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

কৃষক মিথ্যে ঋণকে অস্বীকার করলে কী অবস্থার সন্মুখীন হয়, আপনার পাঠ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে বর্ণনা করুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

ফসল উৎপাদিত না হলে কৃষক যে দুরবস্থার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে লিখুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

জমিদারের নজর সম্পূর্ণ রূপে আদায় না হলে জমিদাররা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা বর্ণনা করুন। (৫০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

কৃষকদের নিকট থেকে অর্থ আদায়ে জমিদারগণ যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে করেন তার মধ্যে একটি উপায়ের বর্ণনা করুন। (১০০ টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

.....

## ১১.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

আমরা এখন পূর্ববর্তী অংশে আলোচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রবন্ধ গ্রন্থের সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক'- 'প্রথম পরিচ্ছেদ— দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— জমীদার' এর সারসংক্ষেপ আলোচনা করব।

'বঙ্গদেশের কৃষক' এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম অংশ 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি'। এই অংশে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন কৃষকদের চরম দুরবস্থা। বঙ্গদেশের যে বাহ্যিক শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দেহ নেই। প্রধান প্রধান যে যে বিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে তার একটি তালিকাও দিয়েছেন। সেই তালিকায় ব্যবসা বাণিজ্য, টেলি যোগাযোগ , চিকিৎসা শাস্ত্র, রাজপথ, গ্যাসের আলো- এইসব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গদেশ পূর্বের থেকে অনেকগুণ এগিয়ে গেছে। কিন্তু

দেশের এই শ্রীবৃদ্ধির ফলভোগ করছে বঙ্গদেশের মুষ্টিমেয় একশ্রেণির লোক। কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষের কৃষিজীবীরা কিন্তু দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে সামান্যও লাভবান হয়নি। বরং জমিদার ও মহাজন দ্বারা তারা পূর্বের মতোই শোষিত হচ্ছে। দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে চাষবৃদ্ধি। জনসংখ্যা এবং ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধির কারণেই চাষবৃদ্ধি হচ্ছে। এই চাষবৃদ্ধির কারণে বঙ্গদেশে কৃষিজাত বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সে অর্থ কৃষকের যরে আসেছে না। তা যাচ্ছে রাজভাণ্ডারে, বণিক ও মহাজন সম্প্রদায়ের কাছে এবং ভূস্বামীদের হাতে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নানা কারণে করবৃদ্ধি হচ্ছে। এই করের অধিকাংশই কৃষিজাত সামগ্রী থেকে আসে। কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করে কর দিয়েই নিঃস্ব হয়ে যায়। আবার চাষের সময় জনসংখ্যা চাপে বর্ষিত কৃষকেরা মহাজনরে কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং কৃষিজাত সামগ্রীর সাহয্যেই তারা ঋণ শোধ করে। ভূস্বামীদের কাছ থেকেও অধিক খাজনা দিয়ে জমিচাষের অধিকার লাভ করে বলে কৃষিজাত সামগ্রীবৃদ্ধিতে তাদের কোনো লাভই হয় না।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে 'জমীদার'। এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত বঙ্গদেশের কৃষকদের প্রতি জমিদারদের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন। অৰশ্য এর পাশে স্বল্পসংখ্যক হলেও কৃষকদের কল্যাণকামী জমিদারদের কথাও বলেছেন। বঙ্গদেশের কৃষক দরিদ্র। জমিদারদের কাছ থেকে খাজনা দিয়ে যে জমি সে চাষ করার জন্যে পায়, তা চাষ করতে গিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে তাকে ঋণগ্রহণ করতে হয়। সেই ঋণ শ্রাবণ মাসে ও পৌষ মাসে যে ধান পায় তা থেকে সে কিছু শোধ করে। সারা বছরের ফসল ঘরে তুলে কৃষক চৈত্রমাসে মহাজনের দেনা শোধ করতে যায়। সেখানে আচর্যজনকভাবে নায়েব সেই ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। সেখানে কৃষকের কিছুই করার থাকে না। চাষের সময় ধানগ্রহণ করা ও তার ঋণ শোধ করা ছাড়াও কৃষককে আরো নানা ধরনের খাজনা দিতে হয়। আষাঢ় মাসের পুন্যাহ উপলক্ষে খাজনা, আবার খাজনার অতিরিক্ত নজর দিয়ে নিঃস্ব চাষা দেড়ী সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আসে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস পেলে মহাজন আর কৃষককে ঋণ দেন না। তখন নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়।

আর কিছুই না পেলে কৃষককে ভগবানের ওপরই নির্ভর করতে হয়। যদি বা কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ পায় তাহলে ভাদ্রের কিস্তিতে তার ঋণের মাত্রা বেড়ে যায়। ঋণ শোধ করতে না পারলে জমিদার তাকে আটক করে রাখেন। শুধু খাজনা বাকি থাকার জন্যেই নয় অন্য প্রজাদের মিথ্যে অভিযোগেও জমিদার কৃষকের ওপর অত্যাচার করে থাকেন। আবার জমিদারের বাড়িতে উৎসর উপলক্ষে জমিদার কৃষকদের ওপর নজর ধার্য করেন। কোনো কৃষক যদি নিতান্ত অভাবে সেই নজর দিতে না পারে তাহলে তার সমস্ত ধান মিথ্যে অভিযোগে আদালত থেকে ক্রেকের ব্যবস্থা করে কাছারীতে নিয়ে যাওয়া যায়। যদি বা কৃষক আদালতে আবার নালিশ করে তখন মামলা চালাতে গিয়ে ঘটি বাটি বিক্রি করে তাকে নিঃস্ব হতে হয়। আবার অনেক সময় জমিদাররা প্রাকৃতিক

দুর্যোগেও খাজনা ছাড়া কৃষক প্রজাদের কাছ থেকে 'বাজে' আদায় করেন। নিরুপায় কৃষকেরা আদালতে নালিশ করলেও দোষীরা মুক্তি পেয়ে যায়। জমিদারকে প্রজাদের কর দেওয়ার তালিকায় রয়েছে— পুন্যাহ, জমিদারদের পাঁচশারিকের নজর, গোমস্তার নজর, পেয়াদার তলবানা, নৌকাভাড়া, সদর আমলার পূজার পার্বণী, পূরোহিতের ভিক্ষা, ডাকটেক্স, হাসপাতাল কর ইত্যাদি। চরম অভাবেও জমিদারের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত এইসব কর কৃষক প্রজাকে দিতেই হয়। তবে শুধু অত্যাচারী শোষক জমিদারের চিত্রই নয়, প্রজা-হিতাকাঙ্ক্ষী জমিদারদের চিত্রও বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন। জমিদারের অজান্তেও প্রজাপীড়ন হয়ে থাকে। ছোটো জমিদাররা আবার অনেক সময় জমিদারের মতো ঠাট-বাট বজায় রাখতে গিয়ে প্রজাদের শোষণ করে থাকেন। অনেক প্রজারা আবার ইচ্ছে করেই খাজনা ফাঁকি দিতে চায়। সেখানে অনেক সময় জমিদার অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। বহু জমিদারই প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয় গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অতিথিশালা নির্মাণ করে থাকেন। এই জমিদাররাই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন' স্থাপন করেছেন যার জন্যে ভারতীয়রা ব্রিটিশের যখন নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সাহস রাখেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন এই প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল জমিদাররাই অত্যাচারী জমিদারদের চরিত্র সংশোধন করতে পারবেন। স্বজাতির কাছে অপমানিত বিরাগভাজন হতে কেউ চান না। তাই এই অত্যাচারী জমিদাররা যদি স্বজাতির কাছ থেকে অপমানিত হন তাহলে তারা অবশ্য নিজের চরিত্র সংশোধন করতে সচেষ্ট হবেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন' এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস রাখেন। এই সংস্থার জমিদাররা যদি এ-বিষয়ে কোনো আগ্রহ না দেখান তাহলে ঘেটা তাঁদের অখ্যাতি বলে গণ্য হবে।

## ১১.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

এই বিভাগের আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্নগুলি দ্রষ্টব্য।

## ১১.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

দ্বাদশ বিভাগের শেষে দ্রস্টব্য।

* * *

## বিভাগ- ১২
## বিবিধ প্রবন্ধ
### বিবিধ প্রবন্ধ : নির্বাচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ - ৩

**বিষয় বিন্যাস**


১২.০ ভূমিকা (Introduction)

১২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১২.২ বঙ্গদেশের কৃষক : তৃতীয় পরিচ্ছেদ — প্রাকৃতিক নিয়ম

১২.৩ বঙ্গদেশের কৃষক : চতুর্থ পরিচ্ছেদ — আইন

১২.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১২.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১২.০ ভূমিকা (Introduction)

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র রস-সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজ, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক বহু মূল্যবান প্রবন্ধও রচনা করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছদের আলোচনা এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। আসুন এই বিভাগে আমরা উক্ত প্রবন্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম ও আইন সম্পর্কে বঙ্কিমের মতামতগুলি আলোচনা করব।

## ১২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগ থেকে আমরা জানতে পারব —

- তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বঙ্গদেশের আইন-আদালত সম্পর্কে।

## ১২.২ বঙ্গদেশের কৃষক : তৃতীয় পরিচ্ছেদ — প্রাকৃতিক নিয়ম

'বঙ্গাদেশের কৃষক' প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বঙ্গদেশের কৃষকদের দূরবস্থার ছবি লক্ষ করেছি। সেই দুরবস্থার জন্য রাজা বা জমিদার সম্পূর্ণভাবে দায়ী, এই দুটি পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মের ভূমিকা কতটা সেদিকে আলোকপাত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তব সচেতনতা ও সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির পরিচয় আমরা সহজ্যে লাভ করতে পারি। আসুন, এবার আমরা বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশার মূলে যে প্রাকৃতিক নিয়ম নিহিত রয়েছে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাগুলো আলোচনা করি।

এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে সাধারণ মানুষের অবস্থানের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ইতিহাস লক্ষ করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই নিম্ন শ্রেণির মানুষের অনুন্নত অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। যেদিন থেকে ভারতবর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত সেদিন থেকে নিম্ন শ্রেণির মানুষের দুর্দশারও সূচনা বাস্তব সত্য এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে সহজেই ধরা পড়েছে। রোম নগরী যেভাবে একদিনে নির্মিত হয়নি, তেমনি ভারতবর্ষের কৃষকদের দুর্দশাও দু-একশ বছরে হয়নি। হিন্দু রাজাদের আমলে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করা হত না। তবে এটাও তিনি এই পরিচ্ছেদে বলেছেল সে সময়ে প্রজাদের অবস্থা খুব একটা ভালোও ছিল না। এখানে সেভাবে রাজার প্রতিনিধি জমিদারেরা প্রজা পীড়ন করে তখনও তেমনি আর এক শ্রেণির লোক প্রজা পীড়ন করত। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মূলত কী জন্য বঙ্গদেশের এই প্রজারা অনুন্নত তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বঙ্গদেশের প্রজাদের যে অবস্থা, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রজাদেরও সেই একই অবস্থা। আবার এই দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাই দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র অন্য শ্রমজীবীদের প্রসঙ্গ না আনলেও এর মধ্যেই যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা নিহিত রয়েছে তা বুঝতে আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে সভ্যতার বিকাশে জ্ঞান-বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি এখানে বক্‌লের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। বক্‌লেই প্রমাণ করেছেন সভ্যতার মূলে রয়েছে জ্ঞানবৃদ্ধি। জ্ঞানবৃদ্ধি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়, বক্‌লের এই মতকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ না করলেও সভ্যতার বিকাশে জ্ঞানবৃদ্ধির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেন জ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয়। তবে জ্ঞান অর্জন শ্রমসাধ্য বিদ্যালোচনার দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। তবে জ্ঞান আহরণের জন্য অবকাশের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। অনাহারে কেউই জ্ঞানচর্চা করতে পারে না। আর যদি তারা খাদ্যান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তা হলে জ্ঞানচর্চা অসম্ভব। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই আমরা দেখি একদল শারীরিক শ্রম করে, অন্যরা বিদ্যাচর্চা করে। শ্রম জীবিরা যে খাদ্য উৎপন্ন করে তার উদ্বৃত্ত অংশে উদরপূর্তি করে একাংশ বিদ্যাচর্চা করে। সভ্যতার মূলেই রয়েছে এই সামাজিক ধনসঞ্চয়। এই সামাজিক ধনসঞ্চয়ই পৃথিবীর সব সভ্যতার মূলে নিহিত।

বঙ্কিমচন্দ্র অতপর সামাজিক ধন সঞ্চয়ের কারণগুলো বর্ণনা করেছেন। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশ ধনসঞ্চয়ের মূলে নিহিত রয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। আমরা জানি ভূমি উর্বরা হলে অধিক ফলস ফলে। এখানে

বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ধন সঞ্চয়ের মূলে ভূমির উর্বরা শক্তিকেই প্রধান বলে মনে করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি নিয়ে এসেছেন সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা। ঠাণ্ডা দেশের মানুষ পরিবেশগত কারণেই অধিক আহার গ্রহণ করে। উষ্ণ দেশের মানুষের অধিক খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তাই শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ শারীরিক প্রয়োজনেই পশু মাংস আহার করে থাকে, যার দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উষ্ণ দেশের মানুষের শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই বলে তারা বনজ দ্রব্যাদি আহার করে থাকে। বনজ আহার সংগ্রহ করা পশু মাংস সংগ্রহ করা থেকে সহজ সাধ্য। উষ্ণদেশে খাদ্য সুলভ বলে ধন সঞ্চয় সহজে হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ বলেই ভূমি উর্বরা। আর ভূমি উর্বরা বলেই ধনসঞ্চয় অতি সহজেই হয়েছে। সে কারণে প্রাচীন ভারতবর্ষে সহজেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। সম্পদ বৃদ্ধির কারণে একটি বিশেষ সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম থেকে সরে এসে জ্ঞান লাভে অগ্রসর হতে পেরেছে। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যেই ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। এই বিশেষ সম্প্রদায়ই হচ্ছে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

কিন্তু এই সভ্যতা স্থায়ী হতে পারেনি। স্থায়ী না হওয়ার মূলে রয়েছে শ্রমবিভাজনের পক্ষপাত দুষ্ট রীতিটি। শ্রমজীবি মানুষ শ্রম করে ফসল উৎপাদন করে ও বুদ্ধিজীবী এই শ্রমজীবি মানুষের উৎপাদিত ফাসলের উদ্বৃত্ত দিয়ে নিজেদের ভরণ-পোষন করে। এই শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষেরই সমাজে প্রাধান্য। দেশের উদ্বৃত্ত ধনের শ্রমজীবী মানুষের ভাগকে বঙ্কিমচন্দ্র মজুরির বেতন ও দ্বিতীয় ভাগকে মুনাফা বলেছেন। শ্রমজীবিরা বেতন ভিন্ন মুনাফার কিছুই পায় পায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিতে এই সত্য সহজেই ধরা পড়েছে। আবার তিনি এটাও লক্ষ করেছেন যে, এই সভ্যতার নিয়মে শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও বেতন বৃদ্ধি হয় না। বরং এই নির্দিষ্ট বেতনই বর্ধিত শ্রমজীবীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, ফলে এই শ্রমজীবী মানুষের জীবন-ধারণ সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। তবে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের ধনবৃদ্ধিও হয়, তাহলে শ্রমজীবী মানুষের কোনো সমস্যা থাকে না, যা বঙ্কিমচন্দ্র ইংলণ্ড আমেরিকার ক্ষেত্রে লক্ষ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণও তাঁর এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এক পুরুষ ও নারী থেকে বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এভাবে তাদের এক সন্তান থেকেও বহু সন্তানের জন্ম হয়। তাই শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট তাদের স্বভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে, এটি একটি অতি বাস্তব সত্য। তবে এই বর্ধিত জনসংখ্যার ভরণ পোষণের উপায়ও রয়েছে তেমনি কিছু সংখ্যক দেশে ধনাধিক্যও রয়েছে যদি জনসংখ্যাধিক্য দেশের মানুষ ধনাধিক্য দেশে যায় তা হলে ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে মানুষের ভরণ পোষণের কোনো সমস্যা থাকবে না। ইংলেণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই প্রথা অবলম্বনের ফলে তাদের শ্রমজীবী মানুষের সমস্যা সহজেই সমাধান হয়েছে। আবার প্রয়োজন বোধে বিবাহ প্রথার গতিরোধ করলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ হওয়া সম্ভব। যে দেশে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন সেখানে সংসার প্রতিপালনেও অসমর্থ ব্যক্তিরা বিবাহ প্রবৃত্তিকে সহজেই দমন করে নিলে এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়।

ভারতবর্ষের শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষেরা এই দুই পদ্ধতির কোনোটিই গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এবং উৎসাহের অভাব ও আলস্যের জন্যে এই দেশ থেকে কেউই অন্য দেশে যেতে চায় না। আবার প্রাকৃতিক কারণে অপকৃষ্ট কোনো জীবিকা নির্বাহের পথও তারা অবলম্বন করতে পারে না। এমতাবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ ভারতবর্ষে অবারিত থেকে যায়। এ কারণে সভ্যতা অভ্যুদয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ মানুষের দুর্দশাও শুরু হয়ে যায়। ফলে সমাজের উচুঁ তলার মানুষদের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের ধনসম্পদ ও আধিকারের পার্থক্যও দেখা দিতে শুরু করে। সমাজের ক্ষমতাশালীদের প্রভুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমজীবী মানুষের ওপর অত্যাচারও বাড়তে থাকে। এই শ্রমজীবী মানুষের অবস্থার অবনতিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের তিন ধরনের পরিনতি লক্ষ করেছেন, যা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। প্রথমত, পারিশ্রমিকের স্বল্পতা হেতু শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দরিদ্রতা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে গেলে আরো বেশি শ্রম নিয়োগ করা জরুরি, ফলে শ্রমজীবী মানুষের অবকাশ আরো কমে যায়। ফলে বিদ্যাচর্চার অভাবে তাদের মধ্যে মূর্খতা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রভুত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে অত্যাচারও বৃদ্ধি পায়, পরিণামে শ্রমজীবীদের দাসত্ব তীব্র রূপ ধারণ করে। এই সব একবার শুরু হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের, প্রাকৃতিক কারণে তা স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপর তাঁর প্রবন্ধে সভ্যতা বিকাশের প্রধান ও প্রথম কারণ তুলে ধরেছেন। সভ্যতা বিকাশের মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞান লিপ্সা ও ধনলিপ্সা। যদিও জ্ঞানলিপ্সাই মনুষ্য জাতির অধিকতর মঙ্গল সাধন করেছে। এর সমর্থনে তিনি 'History of National in Europe' গ্রন্থে উল্লিখিত লেকি সাহেবের মতামতকে তুলে ধরেছেন। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষেরই ধনলিপ্সা রয়েছে। সামান্য অংশের মানুষের জ্ঞান লিপ্সা থাকে। একটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর মতো সম্পদ থাকলেও সমাজিক ধনলিপ্সা কিন্তু কমে না। মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা করেও সেই চেষ্টার ফলে সে সাফল্যও লাভ করে। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন জ্ঞানের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আবার অন্যদিকে যখন মানুষের সুখের অভীপ্সা লুপ্ত হয়ে যায় তখন সে আর পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। আবার যে দেশে সহজে খাদ্য উৎপন্ন হয় সে দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পারার প্রবৃত্তি মানুষের মনে জাগে না। তাই যে 'সন্তোষ' কবিদের চোখে প্রবল প্রশংসার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই 'সন্তোষ'ই সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে থাকে।

এই 'সন্তোষ' ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে পূর্ণমাত্রার বিদ্যামান। উষ্ণ জলবায়ুর জন্যে ভারতবর্ষের মানুষ পরিশ্রম করতে চায় না। আর এক সময় পরিশ্রমের প্রতি এই অনিচ্ছাই তাদের কাছে অভ্যাসগত হয়ে ওঠে। এই অভ্যাসই আলস্যে পরিণত হয়। এই ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে একবার দুর্দশার উপস্থিত হলে তা আর মোচন হওয়ার উপায় নেই। উদ্যমাভাবে তার আর উন্নতি সম্ভব হয় না।

ভারতবর্ষের মানুষের এই 'সন্তোষ'ভাব স্থায়ী হওয়ার কারণও বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে সহজেই ধরা পড়েছে। এর প্রধান কারণ হল ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্ম— হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবাসীকে ঐহ্যিক সুখ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। ইউরোপীয় ধর্ম যাজকেরা ঐহ্যিক সুখের প্রতি বীতস্পৃহ হওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে ছিলেন। ফলত সেখানেও রোমান সভ্যতা বিলোপের পর প্রায় হাজার বছর মানুষের ঐহ্যিক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। কিন্তু ইতালিতে যখন নতুন সাহিত্যে ও দার্শনিক মতের অভ্যুত্থান হল তখন ঐহ্যিক আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং এরফলে সভ্যতার উন্নতি হতে থাকে। ইউরোপে যে প্রবৃত্তি স্থায়ী হতে পারেনি ভারতবর্ষে তা-ই স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক কারণে যে অভ্যাস তৈরি হয়েছিল ধর্মশাস্ত্রর নির্দেশে তা পাকাপাকিভাবে স্থায়ীরূপ ধারণ করল। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের এই দুরবস্থার সুধু তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সমাজের অন্য শ্রেণির মানুষের গৌরব হ্রাস পায়। এক কথায় সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষেরই সার্বিক অবনতি ঘটে।

প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ভারতবর্ষের শ্রেণিভেদের কথা নিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই বর্ণভেদের মধ্যে শূদ্ররাই শ্রমজীবী। বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। যে দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় সে দেশ ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য অর্জন করে। বাণিজ্যের উন্নতি না ঘটলে ব্যবসায়ীদের উন্নতিও সম্ভব নয়। মানুষের অভাব বৃদ্ধি বাণিজ্যের মূলে নিহিত। কিন্তু যে দেশের মানুষ অভাব শূন্য নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যেই সন্তুষ্ট সে দেশে বাণিজ্যও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, ফলে বণিকদের উন্নতি সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে উর্বরা ভূমি থাকা সত্ত্বেও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রগতির অন্তরায়ের অন্যান্য কারণের সঙ্গে প্রধান দুটি কারণই হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা ও সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন।

এর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষত্রিয়দের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই ক্ষত্রিয়রা রাজ্যকার্য্য সম্পন্ন করে থাকেন। সাধারণ প্রজার অবস্থার ওপরে রাজপুরুষের অবস্থার উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। যে দেশের প্রজারা নিস্তেজ, অনুৎসাহী, অবিরোধী সেখানে রাজপুরুষদের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। প্রজাদের এই স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে তাদের দুঃখ অন্নবস্ত্রের অভাব, আহার সামগ্রী উপার্জনের ব্যগ্রতা ও সর্বোপরি সন্তুষ্টিভাব। ফলে রাজপুরুষেরা রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজার অভাবে স্বেচ্ছাচারী ও হীনবল হয়ে পড়েছেন। প্রাচীনকালে যে মহাবলশালী রাজারা ছিলেন তার মূলে প্রজাদের হীনতেজের জন্য রাজারাও হীন তেজ হয়ে পড়েছেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দুর্বল শ্রেণির প্রজাদের জন্য ক্ষত্রিয়দের যেভাবে অবণতি ঘটেছে ঠিক একই কারণে ব্রাহ্মণদেরও অবনতি ঘটেছে। সমাজে তিন শ্রেণির মানুষের দুরবস্থা দেখা দিলে প্রথমে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই সময় তারা উপধর্মের যাজক হয়ে ওঠে। অনিষ্টকারক দেবতার উপস্থিতিতে বিশ্বাসই হল উপধর্ম। সমাজের অনুন্নত তিন শ্রেণির মানুষেরা তাদের অনুন্নতির কারণে উপধর্মের বশীভূত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণেরা তাদের অযৌক্তিক শাস্ত্রবিধি প্রয়োগ করে তাদের ব্যবস্থা দিতে থাকে। এই ব্যবস্থার যুক্তিহীন নিয়ম নীতিতে সাধারণ মানুষের জীবন বাঁধা পড়ে। পরকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে ব্রাহ্মণেরা নিজেরাও ভ্রান্তির

শিকার হয়। মানুষের অবনতির মূলেই রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রতিরোধ। হিন্দু সমাজের অবনতির যত কারণ রয়েছে তার মধ্যে এটাকে প্রধান কারণ বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। এই কারণ আধুনিক যুগেও বর্তমান। যে ব্রাহ্মণেরা এক সময় রামায়ণ-মহাভারত পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি মহৎ কাব্য দর্শনাদি রচনা করেছেন তাঁরা অবস্থার অধগতিতে পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত দুর্বল 'বাসবদত্তা', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। এক সময় তাঁদের এই প্রতিভাও লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই প্রবন্ধাংশের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে উদ্ভুত শ্রমজীবী মানুষের পরিবর্তন সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। এই প্রাকৃতিক কারণ শ্রমজীবী মানুষের অবনতির প্রধান কারণ হলেও এই অবস্থা স্থায়ী অবস্থা নয়। যদি স্থায়ী অবস্থা হত তা হলে ইউরোপের অবস্থার পরিবর্তন হতো না। ইতালিতে জ্ঞানচর্চার উন্নতিতে সমস্ত ইউরোপের উন্নতি সাধন হয়েছে, জল-বায়ুর পরিবর্তনে বা ভূমির উর্বরতা বা অন্য কোনো বাহ্য প্রাকৃতিক কারণে যা সম্ভবপর নয়।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১। সভ্যতার প্রগতিতে প্রধান উপাদান কী সে বিষয়ে 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — প্রাকৃতিক নিয়ম' অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

২। একটি দেশের সামাজিক ধন সঞ্চয়ের প্রধান উপায়গুলো 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — প্রাকৃতিক নিয়ম' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

৩। 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — প্রাকৃতিক নিয়ম' অবলম্বনে প্রাচীন ভারত বর্ষের সভ্যতার বিকাশ ও বিলুপ্তির কারণ লিখুন।

.....

.....

৪। মানুষের ধন লিপ্সা কী ভাবে জ্ঞান লিপ্সার পরিপূরক হয়ে ওঠে সে বিষয়ে বঙ্কিম চন্দ্রের অভিমত 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদে— প্রাকৃতিক নিয়ম' অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

৫। ভারতবর্ষের মানুষের 'সন্তোষ' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কী বুঝিয়েছেন তা 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ— প্রাকৃতিক নিয়ম' অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

৬। ভারতবর্ষের মানুষের 'সন্তোষ' স্থায়ী হওয়ার মূলে যে কারণগুলো রয়েছে সে সম্বন্ধে 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদে— প্রাকৃতিক নিয়ম' অবলম্বনে বঙ্কিমের অভিমত ব্যক্ত করুন।

.....

.....

৭। ভারতবর্ষের বৈশ্যদের উন্নতি না হওয়ার যে কারণগুলো বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ— প্রাকৃতিক নিয়ম' অবলম্বনে সে সম্বন্ধে লিখুন।

.....

.....

৮। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের হীনতেজ হয়ে পড়ার কারণ 'বঙ্গদেশের কৃষক' তৃতীয় পরিচ্ছেদ— প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

৯। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের অবনতির বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত 'বঙ্গদেশের কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ— প্রাকৃতিক বা নিয়ম' প্রবন্ধাংশ অবলম্বনে লিখুন।

.....

.....

## ১২.৩ বঙ্গদেশের কৃষক : চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আমারা দেখেছি কৃষকদের দুরবস্থার জন্যে দায়ী জমিদার ও প্রাকৃতিক নিয়ম। আসুন এই অংশে আমরা কৃষকদের দুরবস্থার জন্যে আইন কতটা দায়ী সে বিষয়ে আলোচনা করি। আমরা জানি জমিদারের অন্যায় আচরণ রাজার আইন দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। সবল যদি দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, তখন রাজা দুর্বলকে রক্ষা করবেন এটাই রাজার রাজ্য শাসনের মূলে রয়েছে। যদি কোনো দেশে সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, তবে সেটা সেই রাজারই প্রজাপালনের অক্ষমতা বলে ধরা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালে ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণের ওপর সবলের অত্যাচার ইংরেজ প্রশাসনের দোষেই যে ঘটে চলেছে, এই বাস্তব সত্যের কথা এখানে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই প্রবন্ধাংশে প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজকুল ও মধ্যযুগের মুসলমান শাসকবর্গের প্রজা-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে জমিদার ছিলেন না। রাজার নিয়ম ছিল প্রজারা তাদের আয়ের ষষ্ঠাংশ রাজাকে দান করতে হবে। প্রজারা রাজাকে তাঁর প্রাপ্য দিলে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাত। সেকালের সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রমাণ পেমেছেন। আমরা রাজাদের প্রজাপীড়নের কোনো ছবি পাই না। সাহিত্য ও স্মৃতিগ্রন্থে রাজার প্রজাবৎসল রূপ বরং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজা পিতার মতো প্রজা পালন

করেন তা সংস্কৃত গ্রন্থে বহু জায়গায় লক্ষ করা যায়। অন্যান্য রাজারা যেখানে প্রজাপীড়ন করতেন, সেখানে হিন্দু রাজারা প্রজাদের নিজ সন্তানের মতো পালন করতেন। পাশ্চাত্যের রাজারা মূলত প্রজাপীড়ক ছিলেন। ইংলণ্ডে রাজাদের সঙ্গে প্রজাদের সংঘর্ষের মূলেই ছিল প্রজাপীড়ন। ফ্রান্সে প্রজাপীড়নের জন্যেই ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রীয় রাজারাও প্রজাপীড়ক ছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু হিন্দু রাজারা, যাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে ষষ্ঠাংশ কর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে প্রজাপীড়ন কীভাবে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ অভিমত তুলে ধরেছেন। প্রজাপীড়ন শুরু করে জমিদারেরা। এই জমিদারদের উদ্ভব মুসলমান যুগে। মুসলমান নবাবেরা রাজ্যশাসনের সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ততটা দক্ষ ছিলেন না। তাই প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা তাঁদের কাছে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তাই প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করার জন্যে তাঁরা পরগণায় পরগণায় কর সংগ্রহক নিযুক্তি করেন। এই কর সংগ্রাহকেরা নিজেদের লাভের জন্যে নির্দিষ্ট কর থেকে বর্ধিত হারে কর সংগ্রহ করতে লাগলেন। যত বেশি কর তাঁরা সংগ্রহ করতে পারবেন ততই তাঁদের লাভ। তাই প্রজাদের সর্বস্বান্ত তরে তাঁরা কর সংগ্রহ করতে লাগলেন। এটা হচ্ছে প্রজাদের প্রথম স্তরের দুর্দশা।

এই ব্যবস্থা ইংরেজদের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে তীব্র রূপ ধারণ করল। এই ভুলের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এই করসংগ্রহকারী জমিদারকে যদি স্থায়ীভাবে জমিতে অধিকার দেওয়া হয়, তবে তাঁরা প্রজাপীড়ক না হয়ে প্রজাপালক হয়ে উঠবেন। কিন্তু এর ফল বিপরীত হয়ে ওঠে। রাজস্বের কর সংগ্রাহক কণ্ট্রাক্টরেরা ভূস্বামী হয়ে উঠলেন। ফলে তাঁরা যে প্রজাপীড়ক ছিলেন, সেই প্রজাপীড়কই থেকে গেলেন। কিন্তু প্রজাদের দুর্দশা প্রবল হয়ে উঠল। যে কর সংগ্রাহকেরা সরকারী তহশীলদার ছিলেন, কর্ণওয়ালিশ প্রকৃত ভূস্বামী অর্থাৎ প্রজাদের কাছ থেকে তাদের ভূমি কেড়ে তহশীলদারদেরই ছিলেন। ইংরেজ আমলে তখন থেকে প্রজাদের দুর্দশা তীব্রতম হয়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় ‘‘ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র— কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজ দিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী, কেন না, এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী। (বঙ্কিমচন্দ্রে চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন, বিধিক প্রবন্ধ, সম্পাদনা; ড° ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ.-৩৯৮-৯৯) এটা প্রজাদের দ্বিতীয় স্তরের দুর্দশা।

কর্ণওয়ালিশ প্রজাদের উৎপীড়কের হাতে ফেলে দিলেন কিন্তু সেই উৎপীড়নের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচানোর কোনো বিধি-নিয়ম কারেননি। ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারায় এটা রয়েছে। প্রয়োজনবোধে গভর্ণর জেনারেল আবশ্যক নিয়ম-নীতি বিধিবদ্ধ করবেন এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই করা হল না।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস শুধু এ-বিষয়ে আক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়ে যান। ১৯৩২ সালে কাম্বেল কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে গিয়ে বিপরীত কাজই করলেন, ফলেন প্রজারা আরো দুর্বলহয়ে পড়লেন, বলবান আরো বলবান হয়ে উঠল। পূর্বের নিয়মগুলোকে পরিবর্তন করতে গিয়ে তিনি আরো প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির সুযোগ করে ছিলেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ৫ আইন, ১০ আইনের প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন যাতে কিছুটা হলেও প্রজাদের স্বত্ব ছিল, যার কাম্বেল নতুন আইনে দূরীভূত করে প্রজাদের আরো দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেন। ১৮১২ সালের ৫ আইনে প্রজাদের কিছু স্বত্ব ছিল যা কাম্বেল লোপ করলেন। নতুন নিয়মে জমিদারেরা প্রজাদের যে কোনো হারে পাট্টা দিতে পারবেন। এর অর্থ হল জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে যে কোনো হারে খাজনা আদায় করতে পারবেন। প্রজাদের জমি দেওয়া ও না দেওয়া এখন সর্বতোভাবেই জমিদারের ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ল। কৃষক সম্পূর্ণভাবে মজুর হয়ে পড়ল। এটা প্রজাদের তৃতীয় স্তরের দুর্দশা।

এই ৫ আইন পূর্বকালের বিখ্যাত 'পঞ্চম'। এই 'পঞ্চম'-এর দ্বারা প্রজাদের সর্বস্ব লুঠ করা হত। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদাররা প্রথম যখন ভূস্বামী হলেন তখন কোরক আইন প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই কোরক আইন দ্বারাই প্রজাদের ধন লুঠ করা হত। সূচনাকাল থেকেই জমিদাররা প্রজাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে আসছেন, ইংরেজ সরকার তা এই ধরনের আইন প্রণয়নের দ্বারা এই সম্পদ লুণ্ঠনকে আইনসঙ্গত করেন।

এরপর ১৮১২ সালে ইংরেজ সরকার ১৮ আইন প্রবর্তন করেন। এটা ৫ আইনের স্পষ্টীকৃত রূপ। এই আইনের দ্বারা প্রজাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকল না।

তবে প্রজাদের উপকারার্থেও ইংরেজ সরকার কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে অতি অল্প মাত্রায় কৃষকেরা লাভবান হয়েছিলেন।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারকে এই সব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেননি। তাঁর মতে ইংরেজরা ইচ্ছে করে প্রজাদের অনিষ্ট করেননি। বিদেশি হওয়ার জন্যে তাঁরা দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে না পেরে প্রতি পদক্ষেপে ভ্রমে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক যে আইন তাঁরা প্রণয়ন করেছেন সেগুলো অনিষ্টকারী। তবে ইংরেজরা প্রজাদের পীড়ন দেখে তাদের অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আইন করেছেন, আদালতও স্থাপন করেছেন। অন্যায় অত্যাচারর প্রতিকার করার জন্যে প্রজারা ইচ্ছে করলে আইনের শরণাপন্ন হতে পারে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় অন্যায়কারী জমিদার জয়লাভ করেন, দরিদ্র কৃষকদের হার মানতে হয়। আদালতে গিয়ে প্রজারা কেন সুবিচার পায় না, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিমত এই পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। মোকদ্দমা ব্যয়সাধ্য তা আমরা সকলেই জানি। কৃষকেরা দরিদ্র থাকায় তারা মোকদ্দমার খরচ চালাতে পারে না। জমিদারদের অর্থের অভাবা না থাকায় তাঁরা অর্থের জোরে

সহজেই আদালতে জিতে যায়। জমিদার ইচ্ছে করলে নির্দোষ প্রজাকে সহজেই আদালতে হাজির করতে পারেন। তাই সেই আদালতে যে সম্পদশালীরই জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। আদালত বরং এখানে ন্যায় পাওয়ার ক্ষেত্র নয়, দরিদ্র কৃষককে পীড়ন করার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আদালতে কৃষকের ন্যায় না পাওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হল কৃষকের বাসস্থান থেকে সেই আদালতের দূরবর্তী অবস্থান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থাপিত এই যুক্তি অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। কৃষকেরা দরিদ্র। তারা ইচ্ছে করলেই পরিবার ও সর্বোপরি তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় ধান জমি ফেলে দূরে যেতে পারে না। তাদের অনুপস্থিতিতে গোমস্তারা তাদের ধান কেটে নেওয়া বা অপর কৃষক গোমস্তার সাহায্যে তার জমি দখল করার সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কৃষকদের স্বভাববৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করেছেন। বঙ্গদেশের কৃষক স্বভাবতই আলস্য পরায়ণ। দূরে গিয়ে ন্যায় পাওয়ার চেয়ে ঘরে বসে নীরবে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করা তাদের কাছে শ্রেয়। আবার বিচারক কাছে থাকলে অত্যাচারিত সুবিচার পান, দূরে থাকলে বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিচারক দূরে থাকলে কৃষক জমিদারের গোমাস্তার কাছেই নালিশ করেন। সেই গোমস্তা নিজেই অত্যাচারী। চাই পীড়িত কৃষকেরা তার কাছে সুবিচার পাবে না, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

তৃতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র বিচার প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ সময়কালকে কৃষকের আদালতে সুবিচার না পাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। গোমস্তা কৃষকের ধন চুরি করে নিয়ে গেলে যদি কৃষক আদালতের দ্বারস্থ হয়, সেক্ষেত্রে দেখা যা বিচারকের রায় বেরোতে সুদীর্ঘ সময় লেগে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যদি এখানে কৃষকের কুড়িটাকা ক্ষতি হয়ে থাকে তা হলে মামলার খরচ বাদ দিয়ে তার মাত্র পাঁচ টাকা আদায় হয়ে থাকে। এরূপ প্রতিকারের আশায় কৃষক আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করতে যায় না।

বিচার প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ার বাস্তবসম্মত কারণও এখানে বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন। আদালতে বিচারকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। এছাড়া বিচার পদ্ধতি ও মামলার সংখ্যাধিক্যের কারণে বিচারে বিলম্ব ঘটে। আবার বিচারকদের নৈতিকতাগুণ ও দাত্বিজ্ঞানের অভাবে দীন দুঃখী প্রজারা সুবিচার পায় না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন। আইনের অযৌক্তিকতা ও জটিলতাকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের আদালতে ন্যায় না পাওয়ার চতুর্থ কারণ হিসেবে মনে করেছেন। কোনো কৃষক গোমস্তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করতে আদালতে গেলে 'জুরর'-দের (নির্ণায়ক সভ্য অর্থাৎ যিনি রায় দেবেন) দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার ফলে কৃষকেরা আদালতে সুবিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। 'জুরর'-রা আদালতে নতুন। তাই বিচারের সময় সাক্ষীর উপস্থিতিতে যখন বিচারের প্রক্রিয়া চলতে থাকে তখন দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে 'জুরর' অন্যমনস্ক থাকেন, কিছুই বোঝার চেষ্টা করেন না। ফলে নির্দোষী দোষী হয় এবং দোষী নির্দোষী হয়। যেহেতু 'জুরর' বিলেত থেকে এসেছেন, তাই সেই বিচারের রায়ের প্রতি নির্দোষ লাঞ্ছিত কৃষক ছাড়া আর সকলেই খুব খুশি হয়।

পঞ্চমত, দরিদ্র চাষীদের সুবিচার না পাওয়ার কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র বিচারকের অযোগ্যতাকে দায়ী করেছেন। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সব বিচারকেরা ইংরেজ। তাঁদের কর্মদক্ষতা, শিক্ষা থাকলেও বিচারক হওয়ার যোগ্যতা নেই। বিচারক হওয়ার প্রথম যোগ্যতাই হল বিচারকদের বাদী-বিবাদীদের সামাজিক অবস্থান, মানসিকতা ও ভাষা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা। কিন্তু ইংরেজ বিচারকরা বিদেশি হওয়ার জন্য সেইসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে কারণে তাঁরা সুবিচার করতে অসমর্থ।

এদ্দেশীয় অধস্তন বিচারকদের প্রসঙ্গও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নিয়ে এসেছেন। এখানে তিনি বাঙালি বিচারকদের অযোগ্যতাকে প্রবলভাবে আঘাত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছেন এই অধস্তন বিচারকরা মূর্খ, স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, অশিক্ষিত ও সেই সঙ্গে অসৎ। আবার যদি কোনো অধস্তন বিচারক সুবিচার করে থাকেন, সেটা ঊর্ধ্বতন বিচারকদের দ্বারা নাকচ হয়ে যায়। অন্যদিকে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করারও সুযোগ রয়েছে। সেই আপিলের ভয়েও বিচারক সুবিচার করেন না। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় হাইকোর্টকে অনিষ্টকর বলেও মনে করেছেন। হাইকোর্টের বিচারকেরা অনেক সময় অধস্তন বিচারকদর বিচার পদ্ধতির সম্পর্কে যে নির্দেশ দেন তা ভ্রমাত্মক ও হাস্যাস্পদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের এই 'চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' পরিচ্ছেদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরূপ সমালোচনার বিরুদ্ধে 'সমাজদর্পণ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রসঙ্গক্রমে সেই প্রবন্ধটির আলোচনা করে কৃষকদের বিরুদ্ধপক্ষদের স্বরূপ এখানে তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছেন। সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে যুক্ত দশসালা বন্দোবস্তেরও নিন্দা করেননি। এই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত প্রস্তাবের সমালোচনা করে দশসালা বন্দোবস্তের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন— "দশসালা বন্দোবস্তের কোনো ব্যাঘাত না করে জমিদার ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্তব্য।" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পাদনা: ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ: ৪০৭)। উক্ত প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক মনে করেন যে বর্তমানে বঙ্গদেশে জমিদারদের সম্পদের কারণেই এই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রাবন্ধিকের এই মতামতের মধ্যে বিস্তর ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে দেশের যে জমিদারশ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, শুধুমাত্র তাদের জন্যেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে তা বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। এই জমিদারশ্রেণি সৃষ্টির পূর্বে আমাদের দেশ যে নির্ধন ছিল তার কোনো প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও খুঁজে পাননি। আবার বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালে যে সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে তার উল্লেখও এখানে করেছেন। অনেকে মনে করেন বিদেশিরা এদেশের টাকা নিজের

দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এর উত্তরে বলেছেন যে নগদ টাকা দেশ থেকে গেলেই অর্থহানি হয় না, তার বিনিময়ে সে যদি অন্যপ্রকার সম্পদ লাভ করতে পারে তবে নগদ টাকা গেলেও ক্ষতি নেই। একজন লোক যদি একশ টাকার ঘান কিনে গোলায় রাখে তবে সে টাকা হারিয়ে দরিদ্র হয় না, বরং নগদ টাকার পরিবর্তে অনুরূপ সম্পদ লাভ করে। দ্বিতীয়ত, বিদেশি বণিকেরা এদেশ থেকে নগদ অর্থ জাহাজে তুলে নিয়ে যান না। সঞ্চিত অর্থ দলিতে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলেতে যায়। তৃতীয়ত, যদি নগদ টাকা গেলেই ধন হানি হয় তবে বিদেশি বাণিজ্যে আমাদের ধনবৃদ্ধি হত না। কেন না সমপরিমাণ রূপা আমাদের দেশে আসে ও সে রূপায় নগদ টাকা হচ্ছে। সুতরাং আমরা আমাদের দেশকে গরীব করে তুলছি না। আমদানী বা রপ্তানীতে বিদেশি বণিকেরা আমাদের টাকা নিয়ে যাচ্ছে না বা সেজন্যে আমাদের টাকাও কমছে না। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন বিদেশিদের বাণিজ্যের কারণে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে। আমাদের দেশে যে বিপুল রেল লাইন তৈরি হচ্ছে তা বিদেশাগত আমাদের দেশে অর্থের বিনিময়ে। রাজকর্মচারীদের জন্য যে অর্থ বিলেতে যাচ্ছে তার পরিমাণ অল্প। কিন্তু বাণিজ্য ও কৃষির জন্য যে ধনবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে ক্ষতিপূরণ হয়েও অনেক উদ্বৃত্ত থেকে যায়। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়ছে বৈ কমছে না।

'বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ' নিবন্ধের লেখক মনে করেন যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর দ্বারা জমিদারদের সম্পদ বৃদ্ধির উপায় না বের করা হত তাহলে দেশ আরও দরিদ্র হয়ে পড়ত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই মতের মধ্যে যে ভুল রয়েছে তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মনে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা সম্পদশালী হয়েছে। যদি বিপরীতে প্রজারা সম্পদশালী হতো তা হলে সে ধন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাত থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছাড়িয়ে পড়ত। পণ্ডিতেরা মনে করেন ধন একজায়গায় জড়ো হয়ে থাকলে তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দেশের মঙ্গলকারক। আমাদের দেশে জমিদারদের হাতে টাকা থেকে যাওয়ার কারণেই সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়— "পাঁচ সাতজন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয়কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে?" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পাদনা: ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ: ৪১৪)। সে কারণেই কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রজাওয়ারী বন্দোবস্ত হলে দুচারজন জমিদারের পরিবর্তে দেশের ছয়কোটি সাধারণ মানুষকে আমরা সুখী দেখতে পারতাম। আসলে একটি দেশের উন্নতি জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নির্ভর করে। বর্তমানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে পাঁচ-ছয়জন জমিদার মৃদুস্বরে কথা বলেন, "তৎ পরিবর্তে তখন এই ছয়কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জন গম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।" (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন, বিবিধ প্রবন্ধ, সম্পাদনা: ভবানীগোপাল সান্ন্যাল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ: ৪১৪)।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের রাজাদের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' অনুসরণে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

২। বঙ্গদেশে কীভাবে প্রজাপীড়ন শুরু হয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' অনুসরণে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' অবলম্বনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভুত প্রজাদের দুর্দশার চিত্র 'বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' অনুসরণে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৫। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' অনুসরণে কৃষক আদালতে গিয়ে সুবিচার পায় না কেন সে বিষয়ে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

৬। বঙ্কিমচন্দ্র 'সমাজ দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ' প্রবন্ধের অভিমত কীভাবে খণ্ডন করেছেন, তা 'বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ— আইন' অনুসরণে লিখুন। (৫০টি শব্দের মধ্যে)

.....

.....

## ১২.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'বঙ্গদেশর কৃষক' এই প্রবন্ধটির তৃতীয় পরিচ্ছেদ হচ্ছে 'বঙ্গদেশর কৃষক, তৃতীয় পরিচ্ছেদ — প্রাকৃতিক নিয়ম'। এই পরিচ্ছেদ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষকদের দুরবস্থার জন্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ কতটা দায়ী, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই শ্রমজীবী মানুষেরা রয়েছে। সভ্যতার মূলে রয়েছে জ্ঞান বৃদ্ধি। শ্রমজীবী মানুষের

পরিশ্রমে উৎপন্ন খাদ্যে উদরপূর্তি করে একাংশ মানুষ অবকাশ লাভ করে জ্ঞানচর্চা করে ও তারফলেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সভ্যতার বিকাশে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক ধনসঞ্চয়। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ধন সঞ্চয় নির্ভর করে। ভারতবর্ষের মাটি উর্বরা বলেই অধিক ফসল ফলে, ফলে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়। আবার এই দেশ উষ্ণ বলেই খাদ্য সামগ্রী সুলভ হয় ও তার ফলে ধনসঞ্চয় সহজ হয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন প্রধানত এই দুটো কারণে ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এই সভ্যতায় অতি দ্রুত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কিন্তু ধনবৃদ্ধি হয় না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই এক নারী ও পুরুষ থেকে বহু সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি দরিদ্রতা ডেকে এনেছে। জনসংখ্যা রোধ করার প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে — জনসংখ্যাধিক্য দেশের লোকের ধনাধিক্য গমন ও বিবাহ প্রথা রোধ করা। ভারতবর্ষের মানুষ এর কোনটিই গ্রহণ করেনি। ফলে সমাজের উচুঁতলার মানুষের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নিচু তলার মানুষের অতি দ্রুত পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করে। এরফলে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, বিদ্যাচর্চার অভাবে মূর্খতা দেখা দেয় ও শ্রমজীবীদের মধ্যে দাসত্ব তীব্ররূপ ধারণ করে।

সভ্যতা বিকাশের মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞান লিপ্সা ও ধনলিপ্সা। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখনই তার জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। আবার অন্যদিকে মানুষের সুখের আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সে আর পরিশ্রম করতে রাজি হয় না। একধরনের সন্তুষ্টি তার মনে জাগে। এই 'সন্তোষ'ই সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে বাধা প্রধান করে থাকে। ভারতবর্ষের মানুষের মনে এই 'সন্তোষ'ভাব স্থায়ী হওয়ার প্রধান কারণ হল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। এই দুই ধর্মই ভারতবর্ষের মানুষকে ঐহিক সুখ সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। এই প্রবৃত্তিই এক সময় ভারতবর্ষর মানুষের মধ্যে স্থায়ীরূপ লাভ করেছে।

ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে চারটি বর্ণ রয়েছে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এর মধ্যে শূদ্ররা শ্রমজীবী। বৈশ্যরা ব্যবসা বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দেশের মানুষের অভাব-শূন্যতার কারণে বণিকেরা ব্যবসায় উন্নতি করতে পারেনি। ক্ষত্রিয়, বাজারা নিস্তেজ, অন্যুৎসাহী, অবিরোধী প্রজাদের জন্যে স্বেচ্ছাচারী ও হীনবল হয়ে পড়েছেন। এই তিন বর্ণের অধঃপতনের জন্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের অবনতি ঘটেছে। তিনি বর্ণের অবনতিতে প্রথমে ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে অনুন্নত তিন বর্ণেকে উপধর্মের সাহায্যে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাও বিভ্রান্তির শিকার হন। ফলে তাঁদের ও অধঃপতন ঘটে। তবে প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের আশাবাদী মনের প্রকাশ ঘটেছে। ইউরোপ যদি তাদের অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে উঠতে পারে, তবে ভারতবর্ষে দরিদ্রশ্রেণি মানুষেরও একদিন উন্নতি ঘটবে এই পরিচ্ছেদর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস পোষণ করেছেন।

'বঙ্গদেশর কৃষক', 'চতুর্থ পরিচ্ছেদ — আইন' এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র দরিদ্র কৃষকের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিকারের ক্ষেত্রে আইনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি দুর্বল কৃষকেরা জমিদারের দ্বারা পীড়িত হয় তা হলে আইন অবশ্যই দুর্বলের

বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণের প্রতিকার করবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালে সেই আইন কতটা দুর্বলকে রক্ষা করতে পারে সে বিষয়ে এই পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজারা প্রজাপীড়ক ছিলেন না। আমাদের দেশে প্রজাপীড়ন শুরু হয়েছে মুসলমান যুগে। মুসলমান নবাবেরা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের জন্যে কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। এই কর সংগ্রাহকেরা নিজের লাভের জন্যে বর্ধিত হারে কর সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রজাপীড়ন শুরু ক রেন। এই ব্যবস্থা তীব্র রূপ ধারণ করে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সরকার আবশ্যক নিয়ম- নীতির প্রবর্তন কিন্তু করেননি। পরবর্তীকালে কৃষকের উন্নতির চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা বরং বিপরীত কাজই করেন। ইংরাজ প্রবর্তিত ৫ আইন, ১০ আইন, ১৮ আইনে কৃষকদের দুরবস্থা আরও বৃদ্ধি পায়। তবে ইংরেজরা সচেতনভাবে প্রজাদের অত্যাচার করার জন্য এই নিয়মগুলো প্রবর্তন করেননি। দরিদ্র কৃষকদের উপকার করতে গিয়ে না বুঝে তাদের অপকারই করেছেন। ইংরেজরা জমিদারদের প্রজাপীড়ন দেখে সেই পীড়িত প্রজাদের অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য স্থাপন করেছেন, সেখানে প্রজারা আইনের সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে সেই আদালত ও দরিদ্র প্রজাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচটা কারণ তুলে ধরেছেন। প্রথমত, প্রজারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল ও জমিদারেরা সবল। সে কারণে অর্থের জোরে জমিদারেরা মামলায় জিতে যান। দ্বিতীয়ত, কৃষকেরা আদালত থেকে বহু দূরবর্তী গ্রামে বাস করে। নিজের পরিবার, ক্ষেত জমি ফেলে তারা এত দূরে যেতে পারে না। গেলে তাদের ক্ষেত জমি বেদখল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকে। তাছাড়া আলস্যও তাদের আদালতে যাওয়া থেকে বিরত করে। তৃতীয়ত, বিচার প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘ সময়কালের জন্যে তারা মামলার জন্যে যে অর্থ ব্যয় করে, মামলায় জিতে ক্ষতি পূরণ পেয়ে তাদের খুব একটা লাভ হয় না, ফলে তারা আদালতে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। চতুর্থত, 'জুরর'-দের দায়িত্বজ্ঞান হীনতায় আদালতে নির্দোষী দোষী ও  দোষী নির্দোষী প্রমাণিত হয়। ফলে আদালতে ন্যায়বিচারের আশায় যাওয়ার ইচ্ছা দরিদ্র কৃষকদের আর থাকে না। পঞ্চমত, আদালতে হাজির হওয়া বাদী-বিবাদীদের সামাজিক অবস্থান, মানসিকতা ও ভাষা সম্বন্ধে যে প্রাথমিক জ্ঞান বিচারকদের থাকা দরকার, আদালতের ইংরেজ বিচারকদের সেই যোগ্যতা প্রাণ থাকে না বললেই চলে। তাই সুবিচার করতে তারা ব্যর্থ হয়। সে কারণে আদালতে কৃষকেরা ন্যায়বিচারের জন্যে যেতে চায় না।

কৃষকের সমস্ত দুরবস্থার মূলে রয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কিন্তু 'সমাজ দর্পন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ' প্রবন্ধটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক। এই প্রবন্ধের লেখক মনে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত জমিদারদের জন্যেই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যুক্তিসহ তাঁর মতামত তুলে ধরে বলেছেন এই জমিদারদের জন্যেই দেশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। ধন একজায়গায় জড়ো হয়ে থাকলে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, সর্বত্র ছাড়িয়ে পড়লেই দেশের মঙ্গল। জমিদাররা সেই ধন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে রেখেছেন বলেই সাধারণের মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই — এই সত্যকেই বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের এই পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছেন।

## ১২.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

এই বিভাগের আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্নগুলি দ্রষ্টব্য।

## ১২.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। সমালোচনার দুই পর্ব : বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ— জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বিবিধ প্রবন্ধ — সম্পাদনা : ভবানীগোপাল সান্ন্যাল।

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন।

৫। বঙ্কিমবিদ্যা — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

* * *

# বিভাগ - ১৩

# কৃষ্ণকান্তের উইল

# কৃষ্ণকান্তের উইল : বঙ্কিম প্রতিভার সর্বোত্তম সৃষ্টি

**বিষয়বিন্যাস**


১৩.০ ভূমিকা (Introduction)

১৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১৩.২ সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি

১৩.৩ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

১৩.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১৩.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১৩.০ ভূমিকা (Introduction)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে কথিত। রোমান্সের অপরাজেয় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন বঙ্কিম-প্রতিভার জাদু-স্পর্শে সেইসব রচনাও অসাধারণ সৃষ্টিতে পরিণত হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কেবল বঙ্কিম-উপন্যাসেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত। প্লট নির্মাণের কৌশলে, কাহিনি বিশ্লেষণের গভীরতায়, চরিত্রের মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় বিশ্লেষণে এবং শিল্পগত তাৎপর্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটিই যে বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বোত্তম সৃষ্টি এ অতি নিঃসন্দেহ।

## ১৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

আপনাদের পাঠ্যভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে এই বিভাগে আমরা আলোচনা করব । সৃষ্টিকে বুঝতে হলে স্রষ্টাকে জানা প্রয়োজন। এজন্য আমরা প্রথমে উপন্যাসটির স্রষ্টা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও তাঁর সাহিত্য কৃতি এবং তাঁর মানস-গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর আমরা মূল উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশ করব এবং উপন্যাসটিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে উপন্যাসটিকে বুঝতে আপনাদের সাহায্য করব। এই অধ্যায়টি এমন ভাবে সজ্জিত হয়েছে, যা আপনাদের সাহায্য করবে—

- বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে।
- বঙ্কিম-সাহিত্যে তথা বাংলাসাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটির স্থান নির্ণয় করতে।
- আপনাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতে, যাতে আপনারা নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে এবং ব্যক্ত করতে পারেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখের প্রয়োজন, মূল গ্রন্থটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে আপনারা পাঠ করবেন।

## ১৩.২ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুন নৈহাটির কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা দুর্গাদেবী। পিতা ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্রের বড় দুই ভাই শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্র কৃতবিদ্য সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। এরপর পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৫৪ ও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রই ভারতবর্ষের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। পরবর্তীকালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আইনও পাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। পরে কর্মসূত্রে মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতিস্থানে বদলি হন। বঙ্কিমচন্দ্র 'রায়বাহাদুর' এবং 'সি. আই. ই.' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সম্ভবত ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ও গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। পরের বছরেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হয়। ইংরাজি উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪) দিয়ে তাঁর উপন্যাস রচনার হাতেখড়ি হলেও প্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। তারপর একে একে তিনি লেখেন 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাস। প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'কমলাকাণ্ড', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' গ্রন্থগুলির হাসি ও ব্যঙ্গ যতটা আকর্ষণীয়, ঠিক ততটাই আকর্ষণীয় 'বিজ্ঞানরহস্য'-এর মতো প্রবন্ধ। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা বঙ্কিমচন্দ্রের আরেক অনন্য কীর্তি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল মাত্র ছাপান্ন বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

## ১৩.৩ কৃষ্ণকান্তের উইল : শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

১৮৭৩—১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চারটি পারিবারিক তথা সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন। যথাক্রমে 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের

উইল'। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' খাঁটি, পূর্ণাঙ্গ, বস্তুনিষ্ঠ ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণ নির্ভর পারিবারিক সামাজিক উপন্যাস। 'ইন্দিরা' ও 'রজনী' পূর্ণ আকৃতির উপন্যাস নয়। 'ইন্দিরা' বা 'রজনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করেননি। সেখানে উত্তাপ যখন ঘণীভূত হয়ে উঠার প্রয়াস করেছে, তখনই আদর্শবাদের সংঘাতে তা তরল হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। লবঙ্গলতা বা অমরনাথের বেদনা তাদের জীবনের ভিত্তিমূলকে কখনো বিচলিত করেনি, কেননা এক সুগভীর প্রত্যয় তথা আদর্শকে আশ্রয় করে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদকে আনেকটা দূরে রেখে মানবজীবনের রহস্যময় অন্তঃহরে একো করে মানবজীবনের জটিল আবর্তের রূপকে শিল্পীমনের নির্লিপ্ততা ও সহানুভূতি নিয়ে উপলব্ধি করেছেন। যে জীবনজিজ্ঞাসার থেকে 'বিষবৃক্ষ' সৃষ্টি, তারই আরও ব্যাপ্ত ও শিল্পিত অনুরণন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'।

অনেক সমালোচক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস' বলেছেন, যার মধ্যে বঙ্কিমপ্রতিভার সর্বোত্তম পরিচয় রয়েছে। জীবনের চিত্রকে শুধু উপস্থাপনা নয়, কল্পনার পক্ষবিস্তার নয়, গভীর বিশ্লেষণী শক্তির মধ্যে এর অসাধারণ কলাকৌশলের পরিচয়ও রয়েছে। বঙ্কিমের সকল উপন্যাসেই তাঁর নিজের কালের 'মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা' আছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও জটিল এক জীবন-সমস্যা কাহিনি-রূপে বিবৃত হয়েছে। বিবাহিত পুরুষের অন্য নারীতে আসক্তি এই উপন্যাসের কেন্দ্রগত বিষয়। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের সুখের সংসারে একদিন ধূমকেতুর মতো এসে উদয় হয় বাল-বিধবা রোহিণী। প্রবল ভোগাকাঙ্ক্ষী রোহিণী গোবিন্দলালকে আকৃষ্ট করে। গোবিন্দলালও পতঙ্গের মতো বারবার ধেয়ে যায় রোহিণীর রূপবহ্নির দিকে। রিপু-দমনে অসমর্থ গোবিন্দলাল অন্যায় জেনেও রোহিণীর কুহকী মায়াকে অস্বীকার করতে পারে না। রোহিণী জীবনের সবটুকু রস ভোগ করতে চায়। ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পুণ্যবোধে সে তেমনভাবে বিচলিত হয় না। রোহিণীর প্রেমে উন্মত্তপ্রায় গোবিন্দলাল পত্নী ভ্রমরের প্রেম ও ত্যাগের কোনো মূল্যই দেয় না। আরার রোহিণী গোবিন্দলালকে আকৃষ্ট করলেও তার প্রেমকে মর্যাদা দিল না। অপমানিত গোবিন্দলাল তখন পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে হত্যা করে ফেরার হল। মামলা-মোকদ্দমার পর মুক্তি পেলেও সে ওই অঞ্চলের কাউকে মুখ দেখাল না। শুধু ভ্রমরের মৃত্যুকালে এসে উপস্থিত হল ভ্রমর তার পায়ের ধুলো নিয়ে দেহত্যাগ করলেও দূষ্কৃতকারী ও নারীঘাতক স্বামীকে পরজন্মে আর স্বামীরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করল না। এই আঘাতে গোবিন্দলালের চৈতন্যোদয় হয়; সন্ন্যাস নিয়ে 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর' অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করে জীবনের দুঃস্বপ্নকে ভোলার চেষ্টা করল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ডে আছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পনেরোটি পরিচ্ছেদ। উপসংহারে একটি পরিশিষ্ট যুক্ত করে উপন্যাস-বর্ণিত কাহিনিকে লেখক পরিণতির মধ্যে সমাপ্ত করেছেন। উপন্যাসের দুটি খণ্ড যেন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে রূপবতী রোহিণীর

প্রতি গোবিন্দলালের চিত্তে সহানুভূতির পথ ধরে রূপাসক্তিজনিত দুর্নিবার আসঙ্গলিপ্সার প্রকাশ এবং এর ফলে ভ্রমরকে ত্যাগ ও রোহিণীকে নিয়ে কলঙ্কিত ভোগারতি। গোবিন্দলাল ও ভ্রমর দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে দেখে মনে করত 'এতরূপ' এবং গোবিন্দলাল তরুণীবধূকে দেখে ভাবত 'এতগুণ'। জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল করা, বিভিন্ন সময়ে সে উইলের পরিবর্তন করা এবং এই উইলের পরিপ্রেক্ষিতেই গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ভাইঝি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী বালবিধবা রোহিণীর আগমন হয়। রোহিণীর আগমনে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড গোবিন্দলাল-রোহিণীর কামনাতপ্ত জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ও দ্রুত অবসাদ নিয়ে রচিত। যে প্রেম আত্মিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, যা শুধু আদিম প্রবৃত্তি ও লালসা থেকে জাত, সেই মনহীন দেহের বোঝা জীবনকে দুর্বহ করে তোলে। গোবিন্দলালেরও তাই হয়েছিল। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য গোবিন্দলালের সংগীত ও সাহিত্যচর্চা, কাম্যপুরুষ গোবিন্দলালকে জয় করেও তার মনকে জয় করতে না পারার জন্য রোহিণীর ব্যর্থতার হাহাকার ও কামনার দাহ, নিঃসঙ্গ ভ্রমরের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা, মাধবীনাথের কৌশলে গোবিন্দলাল-রোহিণীর পঙ্কিল-জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি, অভিযুক্ত গোবিন্দলালের বিচারে মুক্তি লাভ ও ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় তার উপস্থিতি এবং চিরতরে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ— এইসকল দ্রুত পরিণামমুখীন ঘটনাবলি নিয়ে উপন্যাসের উত্তরার্ধ রচিত হয়েছে। 'মেঘদূতে' যেমন অলকাপুরীতে এসে কাহিনি শেষ হয়েছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও গোবিন্দলাল ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন করবার পরে আখ্যায়িকা সমাপ্তি লাভ করেছে। 'বিষবৃক্ষে' প্রলোভন অংশ অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্ত-পর্বের কাহিনি দীর্ঘতর। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কিন্তু প্রলোভন-অংশই সুবিস্তৃত, প্রায়শ্চিত্ত-পর্ব অনেক সংক্ষিপ্ত কিন্তু অমোঘ এবং ট্র্যাজেডির সুরে মহিমান্বিত। 'বিষবৃক্ষের' মতো মূল কাহিনি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করারও সুযোগ হয়নি অথবা বঙ্কিমচন্দ্র সুযোগ দেননি। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কাহিনি গ্রিক নাটকের মতো একমুখীন ধারায় দ্রুতগতিতে এসে পৌঁছেছে। জীবন-শিল্পীর কাছে মানবজীবনের একটি করুণ অধ্যায় নিয়তির কুচক্রে অপ্রতিরোধ্য গতিতে পরিণামে এসে সমাপ্তি লাভ করেছে। 'মনুষ্য জীবন বড়ই পরাধীন' এই নিষ্ঠুর সত্যটি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রতিটি পাত্র-পাত্রী নিজেদের জীবনে নিদারুণ সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছে। কেউ কেউতো জীবনের বিনিময়ে এ-সত্যে পৌঁছতে পেরেছে। মানুষের পরাধীনতা অনেকটাই তো নিয়তি তথা ভাগ্যের কাছে। মানুষের জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এমন ঘটনাবলি অনুষ্ঠিত হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্থির থাকতে দেয় না, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হয়তো উক্ত ঘটনাবলি একটু এদিক-ওদিক হলে সমূহ ক্ষতি হত না। যে ঘটনাবলির উপরে মানুষ কতৃত্ব স্থাপন করতে পারে না, তা-ই নিয়তির ছদ্মবেশে এসে দেখা দেয় এবং সর্বস্ব দাবি করে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ঘটনাবলি এমন দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছে যে তার অনির্যাস প্রতিক্রিয়া প্রধান চরিত্রগুলিকে একমুহূর্ত স্থির থাকতে দেয়নি। মানব জীবনের এটাই পরম রহস্য।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রধান দুটি চরিত্র গোবিন্দলাল ও ভ্রমরে দাম্পত্য জীবন বাইরের ঘটনার দ্বারা বহুপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের কেন্দ্রস্থলে সেই নিয়ন্তা শক্তি হলেন জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্তের বারবার উইল পরিবর্তন কেবল সম্পত্তির বিভাগ-বণ্টনের অংশই বদলায়নি, সেই সঙ্গে অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির মতো উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর ভাগ্য পরিবর্তনও করেছে। প্রথম খণ্ডে ট্র্যাজেডির বীজ রোপণ করে থাকেন যদি কৃষ্ণকান্ত রায় বা কৃষ্ণকান্তের উইল, দ্বিতীয় খণ্ডে সেই ট্র্যাজেডি ঘনীভূত করে তুলেছেন ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি অর্থাৎ গোবিন্দলাল-রোহিণী-ভ্রমরের গতিবিধি, ভাগ্যবিপর্যয় এবং পরিণাম সংগঠনে গৌণ চরিত্র তথা বাহ্য ঘটনার অনিবার্য প্রভাব দুই খণ্ডেই লক্ষ করা যাচ্ছে। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কন্যা ভ্রমরের দাম্পত্যজীবনে পুনর্বার সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন মাধবীনাথ। সেই উদ্দেশ্যেই নিশাকরকে ব্যবহার করছিলেন মাধবীনাথ। কিন্তু ফল হল ভয়ঙ্কর। প্রবল উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করে বসল। ভ্রমরের সঙ্গেও তার চিরকালীন বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল পরিবর্তন যত সৎ উদ্দেশ্যই করা হোক না কেন, তা যেমন গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচিরই তুলে দিয়েছিল, মাধবীনাথের আপাত-নিরীহ প্রচেষ্টাটিও তেমনি গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর জীবনে ট্র্যাজেডির কৃষ্ণপক্ষ বিস্তারেই সহায়ক হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয়খণ্ডের পরিপূরক সৌসাম্যের ফলেই ট্র্যাজেডি ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে। ভ্রমরের অভিমান, গোবিন্দলালের অপরিমেয় রূপলালসা, রোহিণীর উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষা— প্রধান পাত্র-পাত্রীদের এইসমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই ট্র্যাজেডির পরিণামকে ত্বরান্বিত করেছে। ট্র্যাজেডির নিয়ামক হিসাবে এই উপন্যাসে বাইরের ঘটনা-পরিবেশ তথা বিভিন্ন ছোটোখাটো চরিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। বারুণী পুষ্করিণীর কথাই ধরা যাক। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে এই পুকুরটি নায়ক-নায়িকা-প্রতিনায়িকার জীবনে এবং উপন্যাসের কাহিনিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। ক্ষীরি চাকরানির কুৎসা রটনা শুধুমাত্র বাইরের ঘটনা হয়ে থাকেনি। ক্ষীরির কুৎসা রটনা একদিকে ভ্রমরকে বিচলিত করেছে, অপরদিকে রোহিণীকে করেছে উত্তেজিত এবং সক্রিয়। এরই ফলে একসময় গোবিন্দলালের মনে ভ্রমরের প্রতি বিরাগ এবং রোহিণীর প্রতি অনুরাগ জন্মে। আরেকটি গৌণ চরিত্র ফিচেল খাঁ-র কার্যকলাপও গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরকে বিরূপ হতে প্ররোচিত করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ট্র্যাজেডি-সংগঠনে প্রধান পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপই শুধু দায়ি নয়, বাহ্য ঘটনা ও নিয়তির প্রভাবও অনেক পরিমাণে দায়ি। উপন্যাসে বাহ্যজগতের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার ছবি প্রখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির ironic treatment of nature-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাহ্যশক্তি ও নিয়তির প্রভাব থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর জীবনে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়েছে তাদেরই চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্য। সপ্তদর্শবর্ষীয়া ভ্রমরের মধ্যে ভালোবাসা ছিল, কিন্তু উদারতা ও ক্ষমা ছিল

না। বরং ছিল শিশুসুলভ অবুঝ অভিমান। ভ্রমরের এই অভিমান গোবিন্দলালের জীবনে রোহিণীর প্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছে। শুধু তাই নয়, ভ্রমরের রাগে ভ্রমরের সর্বনাশের কথা বঙ্কিম নিজেই বলেছেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী দুজনেই ভোগলোলুপ, শরীর সর্বস্ব। উগ্র জৈবিক বাসনার আগুনে তারা পুড়ে মরেছে। কামনার দিক থেকে যতই অদমিত হোক, উপন্যাসের প্রথমদিকে যে রোহিণীকে আমরা দেখি সেই রোহিণী গোবিন্দলালকে সত্যিকারের ভালোবেসেছিল। কিন্তু গোবিন্দলাল আগাগোড়া লালসামত্ত এবং প্রবৃত্তির দাস। রিপু-সংযমে কোনো চেষ্টাও তার নেই। ভ্রমর ও রোহিণীর প্রতি তার আচরণ প্রায়শই নিষ্ঠুর। সমালোচক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত গোবিন্দলাল সম্বন্ধে বলেছেন— "গোবিন্দলালের অধঃপতন প্রতি পদে নির্ভর করিয়াছে বাহিরের ঘটনার উপর।" কিন্তু সত্যিই কি তাই? প্রথম খণ্ডের আঠাশ পরিচ্ছেদে ক্রন্দনরতা ভ্রমরের সামনে গোবিন্দলালের কঠোর, নিষ্প্রেম, প্রবৃত্তি-তাড়িত আত্মসর্বস্বতার দৃশ্য মনে রাখলে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। হৃদয়হীন, স্বার্থপর, শরীর সর্বস্ব লালসার এ এক নগ্ন দৃশ্য —

" 'গোবিন্দলাল বলিল, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।'

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।"

ভ্রমর ও রোহিণী সম্পর্কে গোবিন্দলাল একবার ভেবেছে —

"ঐ কালো! রোহিণী কত সুন্দর! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।"

কিন্তু গুণ বা রূপ— কোনোটাতে শান্তি পায়নি গোবিন্দলাল। ঘরে বাইরে— কোথাও সে স্থায়ী হয়নি, স্থিত হতে পারেনি। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একস্থানে বলেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' "প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে পুরুষের পরাজয়কে অতি গভীর অনুভূতি-সহযোগে নিরীক্ষণ করিয়াছেন।" যথার্থ তাই পুরুষের পরাজয়ের নিদারুণ ছবি এই উপন্যাসে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নায়ক গোবিন্দলাল ভ্রমরের দ্বারাও আহত, রোহিণীর দ্বারাও বিপর্যস্ত।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র রোহিণী। শুধু বঙ্কিমসাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য সৃষ্টি রোহিণী। বাংলা সাহিত্যে রোহিণীর মতো চরিত্র নিতান্তই দুর্লভ। রোহিণীকে কেন্দ্র করেই গোবিন্দলাল-ভ্রমরের শান্ত সুখী দাম্পত্যে অশান্তির ঝড় বয়েছে, এবং শেষপর্যন্ত সেই সর্বগ্রাসী ঝড়ে গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী— তিনজনের জীবনই ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। যে রোহিণীর রূপমোহে অন্ধ হয়ে অপাপবিদ্ধা ভ্রমরকে লাঞ্ছনা করেছে গোবিন্দলাল, যে লাঞ্ছনা শেষ পর্যন্ত ভ্রমরকে অকালমৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে— সেই রোহিণীকেই শেষে গুলি করে হত্যা করেছে গোবিন্দলাল। রোহিণীর মৃত্যু এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিণাম বাংলা সাহিত্য জগতে এক অন্তহীন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

রোহিণীর মৃত্যু নিয়ে বিদগ্ধ সমালোচকেরা অদ্যাবধি স্পষ্টতই দুটি শিবিরে বিভক্ত। একদল মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ এবং মানবচিত্তের মুক্তি কামনাকে পুরাতন নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নিশাকরকে অনাবশ্যকভাবে এনে গোবিন্দলালকে দিয়ে রোহিণীকে হত্যা করিয়েছেন; অর্থাৎ রোহিণীর মৃত্যু শিল্পসম্মত হয়নি। স্বয়ং শরৎচন্দ্র রোহিণী চরিত্র সম্পর্কে এমন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। 'স্বদেশ ও সাহিত্যে' তিনি লিখেছেন —

"... হিন্দু-ধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। ... মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যুতে।"

অর্থাৎ নৈতিকতার দাবিতে রোহিণীর 'অকারণ অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যু'তে শিল্পগত ত্রুটি হয়েছে— শরৎচন্দ্র এবং আরও কয়েকজন সমালোচক সেকথাই বলতে চেয়েছেন। আবার, অপর একদল সাহিত্য-সমালোচক এ অভিযোগ মানতে চান না। তাঁদের বক্তব্য রোহিণীর মৃত্যু শিল্প সম্মতই হয়েছে। সামাজিক প্রচলিত নীতিরক্ষার দাবিতে রোহিণী হত্যা হয়নি, শিল্পের দাবিতে যা ঘটতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তা-ই প্রদর্শন করেছেন।

কয়েকজন বিদগ্ধ সমালোচক আবার বলেছেন যে রোহিণীর মৃত্যু তথা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিণামে শিল্পের স্খলন হয়েছে বটে কিন্তু তাতে রক্ষণশীল, নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদের কোনো প্রদর্শন নেই। এই বহু বিতর্কিত, বহু আলোচিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

এবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের গোত্র-বিষয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ আমরা জানব 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কী ধরনের উপন্যাস। আলোচনার শুরুতেই আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে পারিবারিক তথা সামাজিক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছি। একজন প্রখ্যাত সমালোচক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে বাংলা সাহিত্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন।

সূক্ষ্ম বিচারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে সামাজিক উপন্যাস বলা যায় না। অসামাজিক ও অবৈধ প্রেমকাহিনিকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উশৃঙ্খলতার জন্য কোনো সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেলে তা সাময়িক সমস্যা হয়, সামাজিক সমস্যা হয় না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পরিবার কেন্দ্রিক কাহিনি। কাহিনির প্রধান পুরুষ চরিত্র গোবিন্দলালের চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য সমাজ-জীবনে হঠাৎ চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হলেও এই উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস বলা যায় না, এবং রোহিণীর জীবনের যে পরিণতিই হোক না কেন, তার তেমন কোনো সামাজিক মূল্যও নেই; তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সমস্যা। আমরা বলব, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারিবারিক ট্র্যাজেডি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' জটিল

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে নরনারীর দৈহিক কামনা বাসনা, লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অনাবৃত প্রকাশ ঘটেছে। মানবমনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে মনের বিচিত্র জটিল ছবি তুলে এনেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কোনো বিশেষ সমাজের পরিচয় তিনি এখানে দেননি, কাহিনি বিস্তারের প্রয়োজনে সমসাময়িক কালকে বেছে নিয়েছেন মাত্র। সামাজিক কোনো সমস্যা এই কাহিনি থেকে উদ্ভূত হয়নি কিংবা কোনো সামাজিক সমস্যাও এই উপন্যাসের কাহিনিকে প্রভাবিত করেনি। মানুষের অন্তরস্থিত বৃত্তি-সমূহের অসম আন্দোলনে এই জাতীয় ট্র্যাজেডি সর্বকালে, সর্বদেশেই ঘটতে পারে; ঘটেও আসছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে এসব কারণেই সামাজিক উপন্যাস বলা সংগত নয় বলে আমরা মনে করি।

যাহোক, একথাতো অনস্বীকার্য যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কেবল বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বোত্তম সৃষ্টি নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এ এক অসামান্য সৃষ্টি। মনে রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস 'চোখের বলি'র অনেক বছর আগে লেখা এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নর-নারীর 'আঁতের কথা'কে রূপ দিয়েছিলেন। শিল্পরীতির বিচারেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অতুলনীয়। আখ্যান গঠন, ভাষা, বর্ণনারীতি— সর্বত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ঔপন্যাসিক-প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শিল্পরীতির অধ্যায়ে উপন্যাসটির নির্মাণশৈলি-বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

## ১৩.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

যে গভীর জীবনজিজ্ঞাসা থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের সৃষ্টি তা 'বিষবৃক্ষ' বাদে বঙ্কিমের আগের কোনো উপন্যাসে দেখা যায়নি। পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের নগ্ন বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন বঙ্কিম। অসংযমী যৌনলালসা মানুষকে কীভাবে ট্রাজেডির সর্বশূন্যতাই পৌঁছে দেয় তার নিখুঁদ বাস্তব বর্ণনা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও সুলভ নয়। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারিবারিক ট্র্যাজেডি উপন্যাসটি আখ্যান গঠন, ভাষা, বর্ণনারীতি— সবদিক দিয়েই অতুলনীয়।

## ১৩.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ১৩.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ - ১৪

# কৃষ্ণকান্তের উইল

## বঙ্কিম-মানসের দ্বৈততা, জটিলতা এবং কৃষ্ণকান্তের উইল

**বিষয়বিন্যাস**

১৪.০ ভূমিকা (Introduction)

১৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১৪.২ বঙ্কিম-মানসের দ্বৈততার বিচার

১৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১৪.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা

১৪.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১৪.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

### ১৪.০ ভূমিকা (Introduction)

বঙ্কিমের চিন্তালোকে, ভাবাদর্শের জগতে একটা দ্বন্দ্ব পূর্বাপর ছিল। তাঁর মনকে একদিকে টেনেছে পাশ্চাত্য দর্শন, যুক্তি ও বিজ্ঞান, অপর দিকে টেনেছে ঐতিহ্য-আনুগত্য, হিন্দু সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত জীবনমূল। এই টানা পোড়েনেরই ফল বঙ্কিম-মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব। আধুনিকতা-রক্ষণশীলতার প্রশ্নে তিনি তাই বরাবর দ্বিধাগ্রস্থ। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিতে এর ছাপ রয়েছে। বঙ্কিমের দ্বৈততা সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে রোহিণী চরিত্রের পরিকল্পনায়। রোহিণীর পরিণাম সমাজরক্ষক নীতিবেত্তা বঙ্কিমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছে, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে শিল্পের।

### ১৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্লোকের দ্বৈততা ও জটিলতার বিষয়ে আলোচনা করে দেখাব, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সেই দ্বৈততার কীরূপ প্রভাব পড়েছে। যেহেতু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচরণ ক্ষেত্র এবং বঙ্কিমের চিন্তার সাফল্য ও ব্যর্থতা, অগ্রগতি ও পাশ্চাৎগতি, দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর একার নয়, সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরই ছবি সেটা, সেজন্য আমরা প্রথমে সংক্ষেপে বঙ্কিমের সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটের পরিচয় নেব। তারপর আমরা, আমাদের আলোচ্য উপন্যাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমমানসের দ্বৈততা তথা জটিলতার বিষয়টিকে আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলব।

## ১৪.২ বঙ্কিম-মানসে দ্বৈততা, জটিলতা এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম' মোট চৌদ্দটি উপন্যাস তাঁর সৃষ্টিসম্পদের প্রধান নিদর্শন। যে কারয়িত্রী প্রতিভা বঙ্কিমকে প্রথম সাহিত্যে আত্মপ্রকাশে প্রেরণা দিয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর ভাবয়িত্রী প্রতিভা এবং প্রতিভার এই উভয় ধারার সংমিশ্রণে তাঁর উপন্যাস নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই মিশ্রণের ফলে তাঁর মনে জেগেছে নব নব জিজ্ঞাসা— যা জীবন জিজ্ঞাসারই প্রকারভেদ। "এ জীবন লইয়া কি করিব, কি করিতে হয়"— এটিই বঙ্কিমের মূল জীবনসমস্যা। কিন্তু এর মূলে রয়েছে তাঁর সোৎসুক জীবনচেতনা— কি রহস্যময় এই জীবন— বঙ্কিমচেতনা প্রথম এই রসানুভূতিতে উন্মোচিত হয়; যা চলেছে প্রায় শেষ পর্যন্ত এবং অবশেষে বঙ্কিম-সাহিত্যে নতুন তাৎপর্য যোগ করেছে। এই জিজ্ঞাসাই তাঁকে দিয়েছে বাংলার প্রথম ভাব ও শিল্পসচেতন ঔপন্যাসিকের মর্যাদা। কারণ এই গভীর জীবনজিজ্ঞাসা তাঁর উপন্যাসে নানাভাবে শিল্পগুণসমন্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবু বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিত মহল এমনকি সাধারণ পাঠকসমাজেও বিতর্কের শেষ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ— তিনি রক্ষণশীল, নীতিবাগীশ এবং সেই কারণেই অনাধুনিক। নীতির প্রশ্নে নির্বিচারে আর্টকে বলি দেন তিনি। আধুনিক পাঠকসমাজকে দূরে ঠেলে দেবার জন্য এই নালিশ বড় কমজোরি নয়। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে রক্ষণশীলতা, আধুনিকতা, পাপ-পুণ্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অর্ন্তজগত দ্বিধান্বিত ছিল, যার স্বাক্ষর বহন করে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি অমর সৃষ্টিই। ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের প্রতিফলন ঘটে তাঁর শিল্পকর্মে। শিল্পীর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসার নিজস্ব নিয়মে সে মানসোৎকর্ষের বিকাশ ঘটলেও সমকালীন চিন্তাসূত্র গুলিকে অনুধাবন না করলে সে মানসসোৎকর্ষের সঠিক ঠিকানা মেলে না। আসুন, এই অধ্যায়ে অমরা উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তালোকের অন্তর্দ্বন্দ্বও জটিলতার স্বরূপটিকে দেশ-কালের পটভূমিকায় বিশদভাবে জানার ও বোঝার চেষ্টা করি এবং দেখি আমাদের আলোচ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে বঙ্কিমের দ্বন্দ্ব-জর্জর মানসের ছাপ কোথায় কীভাবে পড়েছে।

১৮৬৫ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক জীবন অর্থাৎ ১৮০০ সাল থেকে ১৮৯০ সাল তাঁর কালগত পটভূমি বলা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তার সংস্পর্শে এসে অনেকের মতোই বঙ্কিমচন্দ্র ওই শিক্ষা ও চিন্তার অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। আবার সেই সঙ্গেই ভারতীয়, প্রকৃতার্থে হিন্দু চিন্তা ও দর্শনের তিনি অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমের চিন্তার সাফল্য ও ব্যর্থতা, অগ্রগতি ও পাশ্চাৎগতি, দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কেবল তাঁর একার নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিক জটিলতার প্রমাণ। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচরণক্ষেত্র। ঊনবিংশ শতক ধনিক সভ্যতার মধ্যাহ্নকাল। সে সভ্যতায় বিজ্ঞানের জ্ঞান ও শিল্পের

দানে চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' (Mechanical Materialism) এবং মার্কস-এঙ্গেলসের বিপ্লবী বস্তুবাদ (Dialectical Materialisam)। দুইয়ের মাঝখানে বেন্থাম-মিল-কোঁৎ-স্পেন্সার-এর উন্নত-উদার (radical) সমাজ-আদর্শ, মানবিক প্রীতি প্রভৃতি নিয়ে বুর্জোয়া যুক্তিবাদের (rationalist) ধারায় সমাজ সমস্যার উত্তর খুঁজেছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র এইসকল মনস্বীদের চিন্তাধারায় অবগাহন করেছেন। প্রধানত মিলের ন্যায়শাস্ত্রই ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে বঙ্কিমের প্রবেশদ্বার। যে সামাজিক উপযোগিবাদের বঙ্কিম ছিলেন অভিনিবেশী ছাত্র, জন স্টুয়ার্ট মিল ঊংবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তাঁর প্রধান প্রবক্তা। ১৮৩০ থেকে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিলের কর্মকাল। এই সময় বেন্থাম ও লক্-এর দ্বারাও ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু জাতীয় জীবনের তৎকালবর্তী অসম্পূর্ণতা এবং বকচ্ছপ মূর্তি জিজ্ঞাসু বঙ্কিমের সন্মুখে বাংলা নতুনকালের যে জটিল ছবিটি তুলে ধরেছিল তার সমাধান বঙ্কিমচন্দ্র মিলের যুক্তিবাদ বা বেন্থামের হিতবাদে খুঁজে পেলেন না। বেন্থামের হিতবাদে যে সুখ (pleasure) - এর কথা আছে তা পরিমাণগত— এই সুখ বঙ্কিমের ইপ্সিত সুখ নয়। বঙ্কিমের মন ঝুঁকল অনুশীলনধর্মের প্রতি। অনুশীলনধর্ম প্রচারকালে বঙ্কিম বলেছেন, "হিতবাদকে আমি যেখানে স্থান দিলাম তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।" হিতবাদ ধর্মতত্ত্বের ছোটো একটা অংশমাত্র। বঙ্কিমের ধর্মের লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জন তথা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, মিল কথিত লিবার্টিরসূত্র যেখানে অপ্রাসঙ্গিক। বঙ্কিমের চিন্তালোকে ভাবাদর্শের জগতে একটা দ্বন্দ্ব পূর্বাপর ছিল, যা এই সময়ে সুদৃঢ়ভাবে বঙ্কিম-মননে স্থান নেয়। উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটিকে বিশদভাবে বোঝার চেষ্টা করব আমরা। আধুনিক সভ্যতার শক্তি ও সম্পদের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করতেন এ সভ্যতা তাঁর দেশের আপনার নয়। বঙ্কিমের জাত্যভিমান তাই এ সভ্যতায় সম্পূর্ণ স্বস্তিবোধ করতে পারে না। একদিকে পাশ্চাত্য দর্শন, যুক্তি ও বিজ্ঞান মনকে টানে, অপরদিকে টানে জাত্যভিমান, ঐতিহ্য-আনুগত্য, হিন্দু সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত জীবনমূল। এরই ফলে মানসিক জটিলতা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব। বঙ্কিম প্রথম জীবনে সুখবাদ (hedonism) থেকে হিতবাদ, তা থেকে যুক্তিবাদ ও ধ্রুববাদে উপনীত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য হিতবাদের দ্বারা বঙ্কিম অল্পই প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিস্তর পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন কোৎ- এর প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজমের দ্বারা। এই বঙ্কিমচন্দ্রই আবার শেষের দিকে হয়ে উঠেছেন ভক্তিবাদী, নীতিবাদী এবং রক্ষণশীল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিম, কোঁৎ-ভক্ত বঙ্কিম প্রখর যুক্তিবাদী। আধুনিক সভ্যতার মানবতাবাদ, বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদ ও জীবনবাদী চিন্তার প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ও সমর্থন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টির সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে বিতর্কের (১৮৮২) পর থেকে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই তিনি রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্র। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকার বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণির কলকাতা আগমন ও হিন্দু-রিভাইভ্যাল উত্তেজনার সময়ের বঙ্কিমচন্দ্র, 'দেবী-চৌধুরানী',

'সীতারামে'র বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা' এবং দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের বঙ্কিমচন্দ্র যিনি যত না যুক্তিবাদী, তার ঢের বেশি ভক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর প্রগতিশীল হয়ে উঠেছেন, যদিও এই প্রগতিশীলতার বীজ প্রথম থেকেই তাঁর মনে অঙ্কুরিত ছিল, বিপরীতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন, এবং এই রক্ষণশীলতার বীজ প্রথম থেকেই তাঁর মনে অঙ্কুরিত ছিল। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তারই ছায়াপাত ঘটেছে। বঙ্কিম আজন্ম হিন্দু সংস্কারে বর্ধিত, গৃহদেবতায় তাঁর আস্থা সুবিদিত। তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, সমাজের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। এজন্যই মিল-কোঁৎ প্রমুখ দার্শনিকদের বক্তব্য কিছুটা মানলেও, শেষপর্যন্ত কিন্তু তাঁদের সহযাত্রী নন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ভারতীয় ঐতিহ্য আসলে হিন্দু ঐতিহ্য, জাতীয়তাবাদ মানে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। তিনি মানবপ্রীতিতে আস্থাশীল, সেই সঙ্গে আপন জন্মগত সংস্কারে ও জাত্যভিমানে বিশ্বাসী। কোঁৎ-কে তিনি অনেকদূর অবধি মেনেছেন— জগৎ সত্য, সংসার মিথ্যা নয়, মানবহিত শ্রেষ্ঠ সাধ্য— কিন্তু মানেন না, প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান, অধ্যাত্মচিন্তা নিরর্থক এবং নিরীশ্বরবাদ। বঙ্কিম মানেন কৃষ্ণকে। তাই অবশ্যস্বীকার্য যে বঙ্কিম ছিলেন দ্বিধার শিকার।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তালোক তথা মননের আলোচনায় আমরা লক্ষ করি আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিন্তার অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি, দ্বিধা ও দ্বিধামুক্তি, সংস্কারানুগত্য ও সংস্কাররাহিত্য। বঙ্কিমের সৃষ্টিতে তাঁর দ্বিধাজর্জর মননের ছাপ পরিস্ফুট। এই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমদিকে যতটা যুক্তিবাদী, শেষের দিকে ততটাই গোঁড়া, রক্ষণশীল, সংস্কারাছন্ন। রক্ষণশীল সংস্কার এবং নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রে খুব সূক্ষ্মভাবে মিলে গিয়েছে এবং এই মিলিত প্রভাব কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও অনতিপ্রচ্ছন্নভাবে তাঁর অনেক উপন্যাসে, বিশেষ কাঁরে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ক্রিয়া করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল-নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে অনেক সময় শিল্পের সীমা লঙঘন করে যায় তা স্বীকার করতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ এবং মানবচিত্তের মুক্তিকামনাকে পুরাতন নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। স্বয়ং শরৎচন্দ্র এই অভিযোগ তুলেছিলেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে উপন্যাসে নৈতিকতা থাকাটা অপরাধ কিনা। অপরাধ নয়, অপরাধ নৈতিকতা স্বাধিকারপ্রমত্ত হলে। কারণ উপন্যাসে অধিকার আছে জীবনের, অধিকার আছে সত্যের, তেমনি অধিকার আছে শিল্পেরও। আলাদা করে নীতি বা ধর্ম বা অপর কিছুর অধিকার নেই। উপন্যাস জীবনসম্মত না হয়ে, শিল্পগত উদ্দেশ্য চালিত না হয়ে শুধু নীতিগত উদ্দেশ্যে চালিত হলে তখন অবশ্যই আর্টের কাছে অপরাধ ঘটে। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম-সৃষ্টিতে এমন অপরাধের নমুনা বিরল নয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস নীতিগত উদ্দেশ্যে চালিত নয়— একথা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন —

"বিষবৃক্ষ নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটাই সামাজিক মতলব তাঁর (বঙ্কিমচন্দ্রের) মাথায় এসেছিল। কুন্দননন্দিনী

সূর্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভাল নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ নিবেদন। বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।"

('সাহিত্যরূপ', 'সাহিত্যের পথে')

বঙ্কিমচন্দ্র 'রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা' রূপেই 'বিষবৃক্ষ' লিখেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই, কারণ আর যাই হোন না কেন বঙ্কিমচন্দ্র তো শিল্পী। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, 'বিষবৃক্ষ'তো বটেই বঙ্কিমের আরও কয়েকটি উপন্যাসেও রবীন্দ্র কথিত 'সামাজিক মতলব'টির সুদৃঢ় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার উপরে কখনো কখনো যে তাঁর সংস্কার ও তাঁর নীতিবাদী-রক্ষণশীল আদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ-সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধপুস্তক' যথাক্রমে ১৮৭৬ ও ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যে ভাবমণ্ডলে থেকে তিনি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত নানা গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, সেই একই মানসিক পরিমণ্ডলে থেকে তিনি দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসসমূহ রচনা করেন। তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' ব্যাখ্যাত তত্ত্ব তথা ধর্ম-জিজ্ঞাসা উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসায় পরিস্ফুট হয়েছে। "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়"— 'ধর্মতত্ত্বে' এই প্রশ্নটি মানব জীবনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন এবং শিষ্যকে বলেছেন যে সকল মানসিক বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি। "মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম"। বৃত্তিসমূহ নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হোক তার উচ্ছেদমাত্র অধর্ম। নিখিল বিশ্বের সর্বাংশই মনুষ্যের বৃত্তিসমূহের অনুকূল। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের জন্য ভক্তি ও প্রীতি, উভয়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। ভক্তির পরিণাম বলেন ঈশ্বর। আর প্রীতি-পরিচয়, স্বদেশ ও বিশ্বকে আশ্রয় করে উৎসারিত হয়ে থাকে। ঈশ্বর জগৎ থেকে পৃথক হলেও জগৎ তাঁর মধ্যেই বর্তমান "তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভালবাসিলাম"। মনুষ্যে প্রীতিভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নেই, তাই ভক্তি ও প্রীতি অভিন্ন। বঙ্কিম মানসকে এভাবে বুঝে নিলে আমাদের একথাটি বুঝতেও অসুবিধা হয় না যে 'রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা' বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমন যেমন বরাবর ব্যক্তিজীবনের জটিল রূপ ও রহস্যের মধ্যে অবগাহন করতে চেয়েছে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীল মন উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ কিছু তত্ত্বের অবতারণা করে মানবনজীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াসও করেছে। বঙ্কিম-মানসে এবং সেই কারণে বঙ্কিম-রচনাতেও দ্বৈততার পরিচয়টি সুস্পষ্ট ছায়াপাত করেছে। তাঁর শিল্পক্রিয়া সেজন্যই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী, সাধারণ অর্থে উদ্দেশ্যমূলক বলতে যা বোঝায় তা শুধু নয়, নীতিমূলকও। মঙ্গলসাধন বা সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যই লেখা উচিত। সত্য ও ধর্মই হল সাহিত্যের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসকে এমনভাবে সংগঠিত করেছেন, উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাস্রোতের পরম্পরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলিকে এমন পটভূমিতে স্থাপন

করা হয়েছে যে, সেখানে একটি নৈতিক সত্য প্রতিভাত হয়। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন প্রাক্ 'বিষবৃক্ষ' পর্বের রচনায় এই নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রকে পাওয়া যায়, 'বিষবৃক্ষ' থেকে বঙ্কিম উপন্যাসের পটভূমি বদলে সমসাময়িক দেশ-কালের পরিচিত জীবন-যাত্রার মধ্যে নেমে এসেছেন এবং সেই পরিচিতের মধ্যে তিনি জীবনের রূপ-রসের উদ্বোধন করলেন। জীবনজিজ্ঞাসার নিয়মে পরিকল্পিত এই পথে আছে জীবনধর্মের রক্তাক্ত সংগ্রামের রূপ, রসচেতনা ও নীতিচেতনার দ্বন্দ্ব, মিলন ও সমন্বয়ের ক্রমাগত চেষ্টা। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই পর্বের রচনায় উৎকট নীতিপ্রবণতা নেই, বরং জীবনবোধের গভীরতা এখানে অনেক বেশি এবং জীবনসত্যেরও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে এখানে। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে বঙ্কিমের সংস্কারগত পাপবোধ ও যুক্তিবাদী নীতিবোধ এই পথে আগের তুলনায় সংযত, তাই বলে সংস্কারমুক্ত আধুনিক তিনি নন, কোনোকালে ছিলেনও না। রক্ষণশীল সংস্কার এবং নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রে খুব সূক্ষ্মভাবে মিলে গিয়েছে এবং এই মিলিত প্রভাব কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও অনতিপ্রচ্ছন্নভাবে, তাঁর 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দুটি উপন্যাসের মধ্যেই ক্রিয়া করেছে। এই রক্ষণশীল নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পের সীমানা লঙঘন করে দুটি উপন্যাসেই ঘটনা ও পরিণতিকে নিজের অভিপ্রেত পথে টেনে নিয়েছে।

আমাদের আলোচ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বঙ্কিমের দ্বৈততা, তাঁর নীতি-সংস্কার, পাপ-পুণ্যবোধ সংক্রান্ত জটিল বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। তবে 'বিষবৃক্ষ' থেকেই বঙ্কিমের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা বলে এবং উপন্যাস দুটির বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য আছে বলে একই পরিপ্রেক্ষিতে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেরও সংক্ষেপ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' যা ঘটেছে তা কি জীবনের অলঙঘনীয় লজিকেই ঘটেছে? কুন্দননন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, হীরা, রোহিণী এদের চরিত্রের কারণেই কি এই চরম পরিণাম অবধারিত? রোহিণী যেহেতু রোহিণী, সুতরাং সে এমনই আচরণ করবে, আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও নিশাকরের ফাঁদে পা দেবে এবং শেষে গোবিন্দলালের গুলিতে প্রাণ হারাবে? উপন্যাস-দুটিতে তাই হয়েছে।

রোমান্স রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। লেখক যেখানে জীবনের লজিক লঙঘন করে ইচ্ছাপূরণ-কল্পনায় রচনাকে মনগড়া পরিণতি দেন, তখন তাকে আমরা রোমান্স বলি। কিন্তু লেখক যেখানে বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গির প্ররোচনায়, নিজের বিশেষ সংস্কার বা নীতিবোধের টানে জীবনের লজিক, চরিত্রের লজিক লঙঘন করেন, সেটা রোমান্স নয় বটে, কিন্তু এও তো একধরনের ইচ্ছাপূরণ। নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টি রোমান্স রচয়িতার থাকে না। ফলে জীবনের নিরাবরণ প্রকাশও ঘটে না। বঙ্কিম যখন 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস লেখেন, তখনও তাঁর দৃষ্টি নির্মোহ নয়, কারণ এই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি বরাবর তাঁর মধ্যে কাজ করেছে।

জীবন কিন্তু লেখকের এমন বশংবদ নয়। 'বিষবৃক্ষে' যেমন দেবেন্দ্র-হীরার কাহিনিটি চটকদার, কিন্তু লেখকের অভিপ্রেত পরিণতির পক্ষে এতটাই সুবিধাজনক হয়েছে যে উপকাহিনিটি অনেকাংশে কৃত্রিম হয়েছে এবং এজন্যই শিল্পগত ত্রুটি হয়েছে। নারীবেশী পুরুষের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ যেমন দেবেন্দ্রর বৈষ্ণবীবেশে দত্তবাড়ির অন্দরে অকুতোভয় প্রবেশের মতো ঘটনা জীবনানুগ বা বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু কুন্দকে লেখকের ঈপ্সিত পরিণামে পৌঁছে দিতে হলে এই সব ঘটনা বঙ্কিমকে ঘটাতেই হবে। সামাজিক রক্ষণশীলতা অনেক সময় ঔপন্যাসিককে এরকম ইচ্ছাপূরণের পথে ঠেলে দেয়। আবার সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি ঠিক তেমনি ঔপন্যাসিক সেই রক্ষণশীল ইচ্ছাপুরণের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতেও চেষ্টা করে। এই দোটানা বঙ্কিমের মধ্যে বরাবর ছিল। বঙ্কিমের প্রেমতত্ত্বের মধ্যেও এই দোটানা আমরা লক্ষ করি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রেম একটা স্বাধীন শক্তি, আবার বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তায় নারীর স্বাধীন প্রেম সব সময় বিপজ্জনক, সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। নারীর স্বাধীন প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়া — এই দোটানা একদিকে শিল্পী ও অন্যদিকে সমাজপতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ সমস্যা। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের দাম্পত্য প্রেমে পবিত্রতার আদর্শ ও বিশ্বাসনিষ্ঠ আনুগত্য, গোবিন্দলালের মনে রোহিণীর প্রতি সমবেদনা থেকে সৃষ্ট তীব্র আসক্তি এবং রোহিণীর সুপ্ত কামনা জাগ্রত হয়ে পুরুষচিত্তে জয়পতাকা উড়াবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ঘটনাবলির বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু অপরদিকে যে রূপলালসা ও অচরিতার্থ প্রবৃত্তির অসংযত প্রয়াস গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে উদ্দামভাবে দেখাদিল ও সমাজ-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে পারিবারিক জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিল এবং পরিশেষে তা ভোগ-প্রমত্ত জীবনে আঘাত করে চরম দুর্যোগ সৃষ্টি করল, তার কোনো সার্থকতা বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন দেখতে পায়নি। "রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়াসৃষ্টিমাত্র" —নারীর এই রূপ দাম্পত্য প্রেমের বন্ধনের মধ্যে প্রতিভাত হয়। কিন্তু যে প্রেম ভোগে-কামে অসংযত, অনাবৃত এবং রূপতৃষ্ণায় উন্মত্ত তা "মন্দার-ঘর্ষণপীড়িতবাসুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল।" দাম্পত্য-প্রীতি একমাত্র 'ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা'। বঙ্কিমের ধারণায় দাম্পত্যপ্রীতি জগৎরক্ষার্থ ও ধর্মাচরণের জন্য অনুশীলন করলে তা নিষ্কাম ধর্মে পরিণত হয়। আর যা পাশবে বৃত্তি তার দমনই অনুশীলন। ধর্মপালনের জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ গঠনের জন্য পারিবারিক জীবনে সংহতি একান্ত প্রয়োজন। পারিবারিক প্রীতিরূপ সোপানে আরোহণ করে জাগতিক প্রীতিতে উপনীত হতে হয়। সমাজ জীবনের বাইরে মনুষ্যজীবনের কোনো বিকাশ নেই, এর মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই : "সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধ্বংস"। যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় সেখানে মানবিক বৃত্তি-সমূহের উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে। সমাজ চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র যে খানিকটা রক্ষণশীল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। নরনারীর স্বাধীন প্রেমকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া বঙ্কিমের পক্ষে তাই সম্ভব ছিল না। সমাজ-চিন্তক বঙ্কিম, নীতিবেত্তা বঙ্কিম দাম্পত্য প্রেমের বাইরে নরনারীর প্রেমজ সম্পর্ককে মেনে

নিতে পারেননি, কারণ এ ধরনের সম্পর্ক সমাজের পক্ষে অশুভ এবং সেজন্যই পাপ বলে তিনি মনে করেছেন। নৈতিকতা ও পাপ-পুণ্য বিষয়ে তিনি ছিলেন বেশ স্পর্শকাতর। জীবনের যাবতীয় লজিক এবং আর্টের দাবিকে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্র বারবার লঙঘণ করেছেন।

বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গটি ধরা যাক। বিধবা বিবাহ বাঞ্ছনীয় কিনা 'বিষবৃক্ষ' থেকে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' বিধবা বিবাহ আন্দোলন, ইয়ংবেঙ্গলের যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা, ব্রাহ্ম-আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপারগুলি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা থেকে এবং বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে অন্যত্র তিনি যে দু-একটি মন্তব্য করেছেন তা থেকে এসব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রচ্ছন্ন থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কুসংস্কারের তীব্র নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু সামাজিক মতামতের ক্ষেত্রে তিনি পক্ষপাতহীন যুক্তিবাদী নন। বিধবাবিবাহকে বঙ্কিম মন থেকে সমর্থন করতে পারেননি। বিধবা সম্পর্কে, বিশেষ করে বিধবার প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দ্বৈততা আছে। যে বঙ্কিমচন্দ্র রেনেসাঁসের আদর্শে ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, প্রেম যাঁর কাছে ঐশী শক্তি স্বরূপ, তিনিই আবার সামাজকল্যাণের বিবেচনায়, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার টানে ক্রমে হয়ে উঠেছেন রক্ষণশীল। দুই বিপরীতটানের ফল হয়েছে এই যে, স্বাধীন প্রেম ভাল কিন্তু প্রেমের স্বাধীন আচরণ ভাল নয়। বিধবাদের ক্ষেত্রে কথাটা অধিক প্রযোজ্য। বিধবাদের সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি হয়তো ছিল, কিন্তু প্রশ্রয় ছিল না মোটেও। প্রেমের স্বাধীন আচরণ, তাও আবার বিধবার, সমাজের জন্য মঙ্গলময় নয়। কুন্দননন্দিনী, রোহিণীর ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে সমাজকল্যাণের জন্যই। দাম্পত্য প্রেমেই শুধু আছে কল্যাণ। দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে নর-নারীর প্রেম অবৈধ ও অশুভ। সমাজে তা বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দুটি উপন্যাসেই বঙ্কিম-মানসের এই দিকটি ফুটে উঠেছে। 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দননন্দিনী ছিল অপাপবিদ্ধা, তবু তাকে নিয়েই উপন্যাসে সৃষ্টি হয়েছে জটিল আবর্ত। অবৈধ প্রেম তথা দুর্নিবার রূপলালসা থেকে সৃষ্ট সেই আবর্তে মুখ্য চরিত্রগুলো আবর্তিত হতে হতে শেষে ভয়ঙ্কর পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও এক বিধবার উদ্দাম ভোগাকাঙ্ক্ষাই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করেছে। সে হচ্ছে রোহিণী। এই রোহিণী চরিত্র সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈততার পরিচয় উপন্যাসের প্রথমদিকে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দ্বৈততা ঘুচেছে শেষের দিকে এসে। কারণ সেখানে সমাজ সংরক্ষকই এসে হাল ধরেছে। বঙ্কিমমনের দ্বৈততার সূক্ষ্ম পরিচয় আমরা পাব, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর সঙ্গে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত রোহিণীকে মিলিয়ে দেখলে। পত্রিকার রোহিণীই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল পরিকল্পনার রোহিণী। এই রোহিণীকে বঙ্কিম কালিমালিপ্ত করে এঁকেছেন। লোভী, কামনাময়ী রোহিণী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিম একজায়গায় লিখেছেন, "যখন পাড়ায় বিধবা বিবাহের হুজুক উঠেছিল, তখন সে (রোহিণী) বলিয়াছিল, 'পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি'।" বিধবাবিবাহ

এবং রোহিণী সম্বর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাচেতনা স্পষ্টভাবেই এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

আসলে বঙ্কিম-অন্তর্লোকের দ্বৈততা রোহিণী চরিত্র সৃষ্টিতে প্রবল প্রভাবে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র একজন নয়, দুজন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বইটির লেখক একজন নন, দুজন। ফলে, বইয়ের রোহিণীও একজন নন, দুজন। প্রথমদিকে এক রোহিণী, শেষের দিকে অন্য, মাঝে দুয়ের মেশামেশি। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী, সেখানে তিনি মুক্তমনা, সেখানে তিনি আধুনিক। আবার যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজসংরক্ষক, রক্ষণশীল এবং নীতিবাদী, সেখানে তিনি অনাধুনিক। সেখানে তিনি পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বইয়ে এই দুটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই আমরা সাক্ষাৎ পাই। 'বঙ্গদর্শনে' কিন্তু তেমনটি পাই না। পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র আগাগোড়া রক্ষণশীল, সেজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সৃষ্টি রোহিণীর মধ্যে কোনো দ্বৈততা নেই। রোহিণী সেখানে পরিস্কার ভাবে দুশ্চরিত্র, পাপী। এজন্যই 'পত্রিকা'র রোহিণীর মধ্যে বড় রকমের কোনো অসংগতি নেই, যে অসংগতি আছে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসটির মধ্যে। কারণ এই সময় বঙ্কিম-মানস প্রগতিশীলতা-রক্ষণশীলতা, পাপ-পুণ্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে এবং আরও কিছু গূঢ় প্রশ্ন তথা জীবনজিজ্ঞাসায় দ্বন্দ্ব-জর্জর ছিল।

কিন্তু যে সকল বিদগ্ধ পণ্ডিত-সমালোচক একথা প্রমাণ করতে চান যে বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ ছিলেন না, অর্থাৎ নীতির প্রশ্নে আর্টকে বিসর্জন দেননি কখনো, আমরা তাঁদের সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারি না। আজীবন লালিত রক্ষণশীল সংস্কার এবং নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্র। প্রেমের স্বাধীন আচরণকে প্রশ্রয় দিতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে দাম্পত্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ। দাম্পত্য-সম্পর্কের বাইরে, বিবাহিত নারী বা পুরুষের অন্য প্রেমে আসক্তি সমাজের জন্য হিতকর নয়। এজন্যই তা অবৈধ বা পাপ। রোহিণী, কুন্দননন্দিনীদের যেজন্য তাদের জীবন দিয়ে প্রেমের মাসুল গুণতে হয়। শুধু তাই নয়, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালকেও অগ্নিশুদ্ধ হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যে অনুশোচনা থেকে এই প্রায়শ্চিত্ত, বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসের সমস্যার মূলে রয়েছে নায়ক বা নায়িকার সেই অনুশোচনাবোধ। এই অনুশোচনার হেতু অবশ্যই পাপ চেতনায়। এই পাপ চেতনা সঞ্জাত অনুশোচনা ব্যাতিরেকে বঙ্কিম মানুষের যন্ত্রণাকে অন্য কোনোভাবে বুঝতে চেষ্টা করেননি। বঙ্কিম নিজকালের জীবনের সমস্যাকে অনুভব করেছিলেন এইভাবে যে, আমাদের প্রাচীন সমাজের এবং সংসারের যেটা আচরণ-বিধি বা ধর্ম, তার ব্যত্যয়ে ব্যক্তির আসে পাপ-যন্ত্রণা। স্বনামধন্য পণ্ডিত-সমালোচক ড° সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর বঙ্কিম-আলোচনার ভূমিকায় সুখ ও কল্যাণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল সুখ-সন্ধানী মানুষ যখন সুখস্পৃহার মূলে কল্যাণকে বিসর্জন দেয় তখনই যন্ত্রণারম্ভ। কিন্তু সেই কল্যাণবোধের সামাজিক ভিত্তি কোথায়? বঙ্কিম নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন যে ধর্মাচরণের মধ্য। গোবিন্দলাল সেজন্যই ধর্মাচরণের মধ্যদিয়েই তার যাবতীয় পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করেছে। বস্তুত, বঙ্কিমের সকল নায়ক-নায়িকাই এইভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, কেউ সন্ন্যাসী হয়ে, কেউ মৃত্যুবরণ করে।

পাপ-পুণ্য বোধ-সম্পর্কে রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সতত ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্বের পরিচয় নিলে আমরা লক্ষ করব যে, পাপের চিত্র অঙ্কন করার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল অনীহা ছিল। প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "যাহা অপবিত্র অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না— যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব"। তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্কিমচন্দ্রের পাপ সম্পর্কে মানসিক অনীহাকে বোঝানোর জন্য এই মন্তব্য যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মানস এর দ্বারা কথঞ্চিত প্রভাবিত হয়েছে সন্দেহ নেই, নতুবা তিনি 'অপবিত্র' ও 'অদর্শনীয়'কেও শিল্পের প্রয়োজনে উদ্‌ঘাটিত করতেন। রোহিণীর সংগীতে প্রয়াস ও চঞ্চল কটাক্ষের ব্যবহার ও পাশের ঘরে গোবিন্দলালের উপন্যাস পাঠের প্রয়াস প্রভৃতি দৃশ্য গোবিন্দলাল-রোহিণীর সম্ভোগ-তাড়িত ক্লিন্ন জীবনের অবসাদগ্রস্থতার করুণ ছবিটি ফুটিয়ে তোলে ; কিন্তু কোন অবস্থায় তাঁদের এই মানসিক ক্লান্তি দেখা দিয়েছিল তার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা না থাকায় চরিত্র দুটির পরিণতির ছবিটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। শিল্পীর পাপের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা অথবা ঔদাসীন্য তাঁর সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলে না। নিশাকরের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ, যার প্রতিক্রিয়াতে গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু— আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। অস্বাভাবিক এজন্য যে, বঙ্কিম এই ঘটনার জন্য আমাদের প্রস্তুত করেননি। রোহিণী যেহেতু রোহিণী অর্থাৎ পাপী, সুতরাং যেভাবেই হোক তাকে মরতেই হবে— বঙ্কিমের এই পূর্বসিদ্ধান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন, নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিল্পের প্রধান শর্তগুলিকে অবলীলায় লঙঘণ করেছে। রোহিণীর পরিণতি নিয়ে স্বয়ং শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটিই করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস-সৃষ্টির পেছনে কোনো 'সামাজিক মতলব' না থাকার যে কথাটি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমরা বলব বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাসই সেই 'সামাজিক মতলবে' লেখা।

বঙ্কিমের দুটি মন্তব্য এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জগতটিকে বুঝতে তা সাহায্য করবে —

ক. "রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, রোহিণী ভ্রমর নহে— এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে— এ ভোগ, এ সুখ নহে— এ মন্দার-ঘর্ষণপীড়িত বাসুকি নিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ড নিঃসৃত সুধা নহে।"

খ. "যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী— ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী

বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।"

(পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ/কৃষ্ণকান্তের উইল)

নবীন লেখকদের উদ্দেশ্য বঙ্কিম এক প্রবন্ধে বলেছিলেন — "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"

শিল্পী বঙ্কিমকে বুঝতে উক্তিটি সাহায্য করবে।

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। আইন করে বিধবা বিবাহ চালাবার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন । বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে অসহিষ্ণু বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র একজায়গায় বঙ্কিম লিখেছেন, 'যখন পাড়ায় বিধবাবিবাহের হুজুক উঠেছিল, তখন সে [রোহিণী] বলিয়াছিল 'পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।' এখানে 'হুজুক' শব্দটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে 'হুজুক' বলে বিদ্যাসাগরের প্রতিই কটাক্ষ করেছেন বঙ্কিম। আমাদের মনে প্রশ্নজাগে, বঙ্কিমচন্দ্র কি স্থির করে নিয়েছিলেন যে বিবাহেচ্ছু বিধবাদের পরিণাম রোহিণীর মতোই হবে? মনুশাসিত সেকালের সমাজে, পুরুষ-প্রভুত্বের কালে রোহিণীর মতো সুন্দরী বিধবাদের নীতির অলঙঘ বাঁধনে বেঁধে রাখার কথা হিন্দুসমাজের কুলপতিরা ভাববেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রেনেসাঁসের যুক্তিবাদে, ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্রও একই রকম ভাববেন কেন— এ প্রশ্নের উত্তর-অনুসন্ধানেই আমরা অনুধাবন করতে পারব বঙ্কিম-অন্তর্লোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতার চালচিত্রটি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশিষ্ট মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, আধুনিকতা-রক্ষণশীলতা, পাপ-পুণ্য বোধের দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগতে বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর শিল্পকর্মে এই দ্বন্দ্বের ছায়াপাত ঘটেছে। অনেক সমালোচক অবশ্য মনে করেন যে বঙ্কিমের শিল্পীসত্তাকে বঙ্কিমের নীতিবাদী দৃষ্টি কখনো গ্রাস করেনি। আমরা এই মতটিকে কেন সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আপনারা আধুনিকতা-অনাধুনিকতা, পাপ-পুণ্য, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমের দ্বিধা-জড়িত দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করুন এবং আমাদের আলোচ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে তার কতটা ও কীরূপ প্রতিফলন ঘটেছে তা অনুধাবন করুন।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

কঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজমের দ্বারা একদা দারুণভাবে প্রভাবিত হলেও পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষবাদের পথ থেকে বঙ্কিমের সরে আসার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন? (৫০ টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

.....

বঙ্কিমচন্দ্রের কালের বাঙালি সমাজ যখন অবিমিশ্র ভাবে আধুনিক নয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র যোলো আনা আধুনিক হবেন, এমন ধরে নেওয়া কতটা যুক্তি পূর্ণ ? (৬০ টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

.....

একজন আধুনিক লেখক কি নীতিবাদী হতে পারেন না ? (৫০ টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন যথার্থ আধুনিক লেখক বলা যায় কি ? আপনার মতামত যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করুন।

২. বঙ্কিমের কালের কয়েকটি সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্কিমের ধ্যানধারণা কেমন ছিল ? বঙ্কিমের সৃষ্টিতে তার প্রতিফলন কীভাবে হয়েছে বিচার করে দেখুন।

৩. বঙ্কিমের অন্তর্লোকের দ্বৈততার স্বরূপটিকে নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৪. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের পরিণতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তথা রক্ষণশীল মনোভাব কতটা দায়ি বিচার করুন।

## ১৪.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

জীবনের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অল্প পরিমাণে কঁৎ-এর পজিটিভিজমের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রখর যুক্তিবাদী। কিন্তু পরবর্তীকালে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। প্রগতিশীলতা-রক্ষণশীলতা বিষয়ে তিনি চিরকাল দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। সামাজিক মতামতের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতহীন যুক্তিবাদী তিনি ছিলেন না। একটা নীতিবাদী সংস্কার বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর মধ্যে, যার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর শিল্পকর্মে। নীতিপ্রবণতার জন্যই, অতবড় শিল্পী হয়েও বঙ্কিম প্রায়শই শিল্পের দাবিকে নস্যাৎ করেছেন। এ নিয়ে অবশ্য যেমন পাঠক মহলে তেমনি পণ্ডিত মহলেও মতপার্থক্য আছে।

## ১৪.৪ প্রাসঙ্গিক টীকা

**রেনেশাঁস** : **নবজাগরণ**

**পজিটিভিজম** : আস্তিক্যবাদ, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

**মার্কস** : কমিউনিজম বা সাম্যবাদের জনক। প্রথাগত শিক্ষায় ইস্তফা দিয়ে তিনি The Rhenish Gazette নামে একটি উদারপন্থী পত্রিকার সম্পাদক হন। এঙ্গেল্‌সের সহযোগে তিনি Manifesto of the Communist Party রচনা করেন। তাঁর সুবিখ্যাত Das Capital গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পরে এঙ্গেল্‌স প্রকাশ করেন।

**বেন্থাম** : বিখ্যাত রাজনীতি-শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক। যে কাজ সবচেয়ে বেশি মানুষের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল আনে, সেই কাজই শ্রেষ্ঠ এই নীতির তিনি প্রচারক, যার পোশাকি নাম Utilitarianism বা উপযোগবাদ।

**মিল** : প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক। পুরো নাম জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি ফরাসি দার্শনিক কঁৎ-এর মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি বেন্থামের উপযোগবাদ তত্ত্বের উন্নতিসাধন করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপাল অব পলিটিকাল ইকনমি'।

**কঁৎ** : প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজমের বিশ্ববিখ্যাত প্রবক্তা।

## ১৪.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ১৪.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

# বিভাগ - ১৫

# কৃষ্ণকান্তের উইল

# 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা

**বিষয়বিন্যাস**


১৫.১ উদ্দেশ্য (Introduction)

১৫.০ ভূমিকা (Objectives)

১৫.২ বিবিধ আলোচনা

১৫.২.১ উপন্যাসের পাঠান্তর

১৫.২.২ বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল

১৫.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১৫.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১৫.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১৫.০ ভূমিকা (Introduction)

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সঙ্গে পরিমার্জিত গ্রন্থের পাঠের বেশকিছু পার্থক্য আছে। এই পাঠভেদ ঘটেছে মূলত রোহিণীকে নিয়ে। বঙ্গিমচন্দ্রের মূল পরিকল্পনার রোহিণী অর্থাৎ 'বঙ্গদর্শনে'র রোহিণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনও হয়েছে অন্তত দুবার। সেই সঙ্গে আরও দুএকটি ঘটনারও পরিবর্তন হয়েছে। 'উপন্যাসের পাঠান্তরে' আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচিত হওয়ার পাঁচ বছর আগে বঙ্কিম রচনা করেন তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। উপন্যাস দুটির বিষয়বস্তু প্রায় এক। মনস্তত্ত্ব-সংগত চরিত্র বিশ্লেষণের দিক দিয়ে অথবা উপন্যাসের কলাকৌশলের বিচার করলে অবশ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করবে। আমরা সংক্ষেপে উপন্যাসদুটির তুলনামূলক আলোচনা করব।

আপনারা মনে রাখবেন, মূল উপন্যাসদুটি পাঠ করা একান্ত জরুরী।

## ১৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এমন দুটি বিষয়ের আলোচনা, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

উপন্যাসকে বুঝতে যা আপনাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। বিষয় দুটি হল—

ক. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র তুলনামূলক আলোচনা।

খ. 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

এই অধ্যায় আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক-মানসিকতার গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করতে, সেই সঙ্গে কাহিনি ও চরিত্রের মূল পরিকল্পনা থেকে বঙ্কিম কতটা ও কেন সরে এসেছিলেন তা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

## ১৫.২ বিবিধ আলোচনা

এবার আমরা বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হব।

### ১৫.২.১ উপন্যাসের পাঠান্তর

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮২ সালের পৌষ থেকে ফাল্গুন— এই তিনমাস প্রকাশিত হয়। সাময়িক বিরতির পর বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হলে ১২৮৪ সালের বৈশাখ থেকে উপন্যাসটি আবার ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ওই বছরই মাঘ মাসে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়। এর মাস ছয়েক পরে, আগস্ট ১৮৭৮ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সঙ্গে পরিমার্জিত গ্রন্থের পাঠের অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। এই পাঠভেদ মূলত উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র রোহিণীকে নিয়ে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী বিষয়ে মূল পরিকল্পনা থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছেন। তারপরে ৪র্থ সংস্করণে (নভেম্বর ১৮৯২) রোহিণী চরিত্রে একটা পাকাপাকি বদল অর্থাৎ মৌলিক বদল ঘটে গিয়েছে। এইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ সংস্করণ। রোহিণী চরিত্রের এই অদল-বদলের সঙ্গে উপন্যাসটির শিল্পগত ঔৎকর্ষের বিষয়টি গভীরভাবে যুক্ত। এই অধ্যায়ে আমরা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সঙ্গে পরিমার্জিত গ্রন্থের পাঠের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করব।

'বঙ্গদর্শনের' রোহিণী আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রায় যৌবন-অতিক্রান্তা — "তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতি বৎসর মাত্র দেখাইত।" (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৮২৮)। সংশোধিত গ্রন্থে রোহিণীর বয়সের উল্লেখ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন —

"রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ— রূপ উছলাইয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ।"

'বঙ্গদর্শনের' রোহিণী অর্থাৎ মূল পরিকল্পনার রোহিণী সুস্পষ্টভাবে কালিমালিপ্ত, প্রথম থেকেই যে লোভী, ইন্দ্রিয়াবিলাসী এবং নীতিবোধ বর্জিত। 'বঙ্গদর্শনে'র রোহিণী নির্জলা একাদশী করত না, মাছ খেত, বিধবা-বিবাহের হুজুক যখন পাড়ায় উঠেছিল তখন অলজ্জিত কণ্ঠে সে ঘোষণা করেছিল, "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি"। পাড়ার মেয়েরা যেখানে গোপনে গানের মজলিশ বসাত, রোহিণী সেখানে টপ্পা, পাঁচালি, কীর্তন কবিগান করত। রোহিণীর আরও এক গুণের পরিচয়ও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন, "শুনা গিয়াছে, রোহিণী 'ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র' অনেক জানিত। সুতরাং মেয়ে মহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না।"

বেশি বয়সে কামনার জ্বালা, সেইসঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্র ও মেয়েমহলে পসার, সবমিলিয়ে রোহিণীর যে ছবি ফুটে উঠেছে তা মনোরম তো নয়ই বরং বেশ স্থূলই বলা চলে। সংশোধিত সংস্করণে রোহিণীর পরিচয় কিন্তু এত স্থূল নয় —

"রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতে পেড়ে ধুতি পরা, আরও কাঁধের উপর চারুবিনির্মিত কালভুজঙ্গিনীতুল্য কুন্তলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী করবী।... চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল— অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল।"

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম দিকে যে রোহিণীর সাক্ষাৎ পাই তার সঙ্গে শেষের দিকের রোহিণীর আচরণে অসঙ্গতি প্রচুর। 'বঙ্গদর্শনে'র রোহিণী প্রগল্‌ভা, ইতর, চপলমতি এবং দুশ্চরিত্রা। কিন্তু বইয়ের প্রথমদিকের রোহিণী সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া।

রোহিণীর উইলচুরির প্রসঙ্গ 'বঙ্গদর্শনে' অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মানন্দের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে হরলাল যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন রোহিণী স্বতঃবৃত্ত হয়ে উইল পরিবর্তনের ভার নেয় এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ একহাজার টাকা অগ্রিম গ্রহণ করে। এখানে বিধবা-বিবাহের কোনো প্রশ্নই নেই, যা আছে বইয়ের পাঠে। যেভাবে উপযাচিকা হয়ে রোহিণী উইল চুরির ভার নিয়েছে তাতে তার অর্থলোলুপ চেহারাটি স্পষ্ট হয়েছে।

বইয়ে কিন্তু উইলচুরির প্রস্তাব রোহিণীর কাছ থেকে আসেনি। চতুর হরলাল তার পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতার দাবিতে রোহিণীকে উইল চুরি করতে বলেছে। তখন রোহিণী দৃঢ়কণ্ঠে হরলালকে বলেছে, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।" রোহিণী তারজন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিশ্বাসঘাতদের কাজ করতে সম্মত নয়। পরে অতি সুকৌশলে হরলাল বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব করায় রোহিণী সম্মত হল। রোহিণী চরিত্রের চতুরতার আভাস এখানেও আছে, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে রোহিণী দুষ্কর্মটি করতে সম্মত হয়েছে অন্য এক আশায়, অর্থলোভে নয়।

'বঙ্গদর্শন' পাঠে অপহৃত উইল নিয়ে হরলালের সঙ্গে রোহিণীর বিবাদ বাধল। সে উইল নিজের হাতে রাখতে চায় বলে হরলালকে বলেছে "আমি ত চিরকাল আপনারই আজ্ঞাকারী।" এখানেও বিবাহের প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু সংশোধিত সংস্করণে দেখি, (পঞ্চম পরিচ্ছেদে) রোহিণী চুরি করা উইল কোনো গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে এসে হরলালকে বলেছে, "আপনারই জন্য ইহা রহিল"। হরলাল টাকার প্রলোভন দেখালে রোহিণী সটান উত্তর দিয়েছে— "লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।" ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। আর এটাও স্পষ্ট যে 'বঙ্গদর্শনের'র রোহিণীর মতো এই রোহিণী অর্থগৃধু নয়, বরং কামনা-বাসনাময়ী সংসার-লোভী এক নারী, যে জীবনকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে চায়। অর্থের চেয়েও বড় কোনো মোহ এই নারীর থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেজন্য হরলাল যখন বলে যে কোনো চোরকে যে গৃহিণী করতে পারবে না, তখন প্রবঞ্চিতা আশাহতা নারীর নিষ্ফল ক্রোধে ফুঁসে ওঠে রোহিণী—

"আমি চোর! তুমি সাধু! ... যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখে আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে?.."

এখানে রোহিণী স্পষ্টবক্তা, কিছুটা দুঃসাহসিনীও বটে। বিবাহের শর্তে এবং ভাবিস্বামী যাতে বিষয়ে বঞ্চিত না হয় এই উদ্দেশ্যে যে চুরি করতে প্রস্তুত, কিন্তু ভ্রষ্টা রমনীর কোনো লক্ষণ তার মধ্যে অমরা দেখি না।

রোহিণীর যে অখ্যাতি ছিল, 'বঙ্গদর্শনে' যা বর্ণিত হয়েছে তাতে গোবিন্দলাল তাকে বারুণীর ঘাটে ক্রন্দনরতা দেখে কদাপি সমবেদনা প্রকাশ করত না। বইয়ের পাঠে দেখি, গোবিন্দলাল রোহিণীর ব্যাপিকাসুলভ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েও তার জন্য 'একটু দুঃখ' অনুভব করেছে।

'বঙ্গদর্শনে' বর্ণিত হয়েছে যে রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে হরলালের কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছে। সংশোধিত সংস্করণে কিন্তু এই স্বীকারোক্তি নেই। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যে রোহিণীর মুখে প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনে গোবিন্দলাল বারুণীর জলে আত্মবিসর্জন করে। আর সংশোধিত সংস্করণে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নির্দেশে ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন করে শান্তি পেয়েছে। ঈশ্বরধ্যানে গোবিন্দলাল 'ভ্রমরাধিক ভ্রমরকে' লাভ করেছে। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাস এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের পাঠের উপসংহার বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের পাঠ থেকে পৃথক। নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টভাবেই এটা দেখাতে চেয়েছেন যে রোহিণীর সাময়িক গৌরব লাঞ্ছনার মধ্যে শেষ হয়েছে, অবৈধ সম্পর্কের পরিণতিও এমনই লাঞ্ছনাময়। ভ্রমর কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অপরাজেয় মহিমার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দলাল যে শেষ পর্যন্ত ভ্রমরেরই এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। রোহিণী ও গোবিন্দলালের পরিণতি, বিশেষকরে রোহিণীর আকস্মিক মৃত্যু এবং রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়ে উপন্যাসের জটিল সমস্যার সহজ সমাধান শিল্পসম্মত হয়েছে বলে মনে হয় না।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের লেখক একজন নন, দুজন। একজন মুক্তমনা, আধুনিক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। অন্যজন রক্ষণশীল, নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র। ফলত রোহিণীও একজন নয়, দুজন। বইয়ের প্রথমদিকের রোহিণী এবং শেষের দিকের রোহিণী ভিন্ন। লক্ষণীয়, 'বঙ্গদর্শনে' এই দ্বৈততা নেই; না লেখকের, না রোহিণীর। 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম থেকেই সমাজ সংরক্ষক, রক্ষণশীল, নীতিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাধান্য। সেজন্যই 'বঙ্গদর্শনে' তিনি রোহিণীকে আগাগোড়া দুশ্চরিত্র, লোভী ও কামুক এক নারী করে এঁকেছেন। তাই কোনো বড় রকমের অসংগতি 'বঙ্গদর্শনে' নেই, যে অসংগতি আছে প্রচলিত সংস্করণের পাঠে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব পূর্বাপর ছিল। এ দ্বন্দ্ব শুধু তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে নয়, শিল্পের ক্ষেত্রেও। বঙ্কিমচন্দ্রের দোটানা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈততার খুব স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে যদি আমরা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর, বিশেষ করে দুইক্ষেত্রের প্রথম দিককার দুই রোহিণীর তুলনা করি। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার রোহিণী, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মূল পরিকল্পনার রোহিণী প্রথম থেকেই কালিমালিপ্ত, প্রথম থেকেই সে লোভী, কামুক, স্বার্থপর এবং নীতিবোধ বর্জিতা এক নারী। শুধু তা-ই নয়, সে চোরও। সে বিগত যৌবনা। রোহিণী সম্পর্কে বঙ্কিম বলেছেন, "রোহিণী চোর, লোভী, ব্যাপিকা।... সুতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না। গোবিন্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ তাহকে পরিত্যাগ করিতেন।" উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে, প্রথম সংস্করণেই বঙ্কিম রোহিণী চরিত্রের কালি খানিকটা মুছে দিয়েছেন। রোহিণী চরিত্রের মৌলিক বদল ঘটেছে চতুর্থ সংস্করণে। পত্রিকার ইতর, দুশ্চরিত্রা রোহিণীর সঙ্গে বইয়ের প্রথমদিককার রোহিণীর বিস্তর ফারাক। আবার বইয়ের প্রথমদিকের রোহিণী শেষের দিকে অনেকটা বদলে গেছে। এই অসংগতি প্রত্রিকায় নেই। কারণ পত্রিকার লেখক আগাগোড়া রক্ষণশীল ও নীতিবাগীশ। এই লেখকের মধ্যে দ্বৈততা নেই, আধুনিকতা-প্রগতিশীলতার যে দ্বন্দ্বটি বইয়ের লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আছে।

'উপন্যাসের পাঠান্তর' পাঠকালে উপরোক্ত বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে। এ-বিষয়ে অবশ্য আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

'বঙ্গদর্শনে' রোহিণীর বয়ঃক্রমের উল্লেখ বঙ্কিম কীভাবে করেছেন। (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

.....

'লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই'।

রোহিণী কার কাছে কী চেয়েছে? (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার রোহিণীর সঙ্গে বইয়ের রোহিণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত যে পার্থক্য রয়েছে তা আলোচনা করুন।

২. 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সংশোধিত সংস্করণের যে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পাঠভেদ দেখা যায় তাতে উপন্যাসের শিল্পগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে কি?

৩. উইল চুরির প্রসঙ্গ 'বঙ্গদর্শন' ও বইয়ের সংশোধিত পাঠে কী ভাবে বর্ণিত হয়েছে আলোচনা করুন।

৪. 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম দিকে যে-রোহিণীর সাক্ষাৎ পাই, তার সঙ্গে শেষের দিকের রোহিণীর আচরণে বড় অসঙ্গতি নেই। অসঙ্গতি আছে সংশোধিত পাঠে অর্থাৎ বইয়ের রোহিণী-চরিত্রে। এই অসঙ্গতির কারণ নির্দেশ করুন।

[সংকেতসূত্র : দ্বিতীয় অধ্যায় মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।]

## ১৫.২.২ বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল

'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) 'বিষবৃক্ষের ' পাঁচ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি উপন্যাসই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত পূর্ণাবয়ব পারিবারিক সামাজিক উপন্যাস বলে বিভিন্ন সমালোচক দাবি করেন। যদিও 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে সূক্ষ্মবিচারে এক শ্রেণিভুক্ত করা যায় না, কারণ 'বিষবৃক্ষ' যে অর্থে সামাজিক উপন্যাস, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিন্তু তা নয়। তা সত্ত্বেও এই দুই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর সাদৃশ্য আছে। প্রবৃত্তিদমনে অসমর্থ পুরুষের দুর্নিবার রূপতৃষ্ণা ও অবৈধ প্রেমের প্রতি আকর্ষণ কীভাবে শান্ত-স্নিগ্ধ-সুখী গৃহকোণে অশান্তির ঝড় তোলে, বঙ্কিমচন্দ্র তার মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়েছেন এই দুটি উপন্যাসে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের গভীর স্তরে অবতরণ করে মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় প্রদেশের ছবি তুলে এনেছেন। সে ছবি ভয়ানক, নগ্ন কিন্তু বাস্তব। 'এই জীবন লইয়া কি করিব'— এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত ও জর্জরিত 'বিষবৃক্ষের' নায়ক নগেন্দ্র এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নায়ক গোবিন্দলাল। দুজনেরই আছে সুন্দরী সুশীলা পতি-অন্তপ্রাণা পত্নী। তবু কেন অন্য নারীর রূপ-কুহকে বিভ্রান্ত হল তারা? এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে গেছে যেমন নগেন্দ্র, তেমনি গোবিন্দলাল। কিন্তু তাদের এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত তাদের হাহাকারেই পরিণত হয়েছে; জীবন-সমস্যার জটিল-অন্ধকারময় ঘূর্ণাবর্ত থেকে কোনো আলোকোজ্জ্বল পথে তাদের উত্তরণ ঘটেনি। অবৈধ প্রেম তাদের দাম্পত্যজীবনকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথ পরমাসুন্দরী পত্নী সূর্যমুখীকে গভীরভাবে ভালবাসত। কিন্তু তরুণী বিধবা কুন্দননন্দিনীর প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছে। নিজ চিত্তকে কিছুতেই সে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তারই ফল নগেন্দ্র-কুন্দননন্দিনীর বিবাহ এবং সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ। সবশেষে কুন্দননন্দিনী আত্মহত্যা করেছে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন হয়েছে বটে, কিন্তু এ-মিলন বাইরের। ট্র্যাজেডির মৌন হাহাকার দুজনের মধ্যে যে বিভেদ রেখা টেনে দিল তা কিছুতেই মুছে যাবার নয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলালের পরিণতিও একই। গোবিন্দলালের প্রারম্ভ যেমন নগেন্দ্র, রোহিণীর প্রারম্ভও তেমনি কুন্দননন্দিনীতে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে রোহিণী কুন্দননন্দিনীর মতো আত্মহত্যা করেনি, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এক ভগ্নপ্রায় মানুষ গোবিন্দলাল নিজেই গুলি করে হত্যা করেছে রোহিণীকে। প্রেম কি চিরন্তন নয়, নারী সৌন্দর্য কেন আকর্ষণ করে— নগেন্দ্র বা গোবিন্দলাল কেউ জীবনে এর উত্তর পায়নি।

'বিষবৃক্ষে'র পাঁচ বৎসর পর প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' চিত্রের পূর্ণতায়, বিশ্লেষণের গভীরতায় এবং কলাকৌশলের বিচারে 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দুটি উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বক্তব্য, যে জীবন-জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বিষবৃক্ষ' রচনায় প্রণোদিত করেছিল, সেই জিজ্ঞাসারই উত্তর বঙ্কিম খুজেছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও। 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থ সমাপ্তিতে শেষ ছত্রে বঙ্কিম লিখেছেন— "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি গৃহে গৃহে অমৃত ফল ফলিবে।" কিন্তু বিষবৃক্ষে তো অমৃত ফল ধরার কথা নয়। নিজের

সুখী গৃহকোণে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিন নগেন্দ্র এবং গোবিন্দলাল তার বিষফলই তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল শেষপর্যন্ত। এই উপন্যাসদ্বয়ের মূলকথা নরনারীর আদিম সম্পর্কের জটিলতা। চিত্তসংযমে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা স্ত্রী-পুরুষের জীবনকে কীভাবে বিষময় করে তোলে তা দেখানোর জন্য বঙ্কিম প্রায় সমসাময়িক পারিবারিক জীবনের কাহিনি নিয়েছেন। সে কাহিনি বড়ই ট্র্যাজিক। যদিও কুন্দনন্দিনী রোহিণী নয়, সুর্যমুখীও ভ্রমর নয়, নগেন্দ্রও নয় গোবিন্দলাল, কিন্তু উদ্দাম লালসা ও দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষা তাদের সংসারে ও জীবনে যে আগুন জ্বেলেছে সে আগুনে তারা সকলেই দগ্ধ হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আলোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপনাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন—

"এই দুইখানি উপন্যাসই গভীররসাত্মক, ও উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়। উভয় উপন্যাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ— অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণীরূপ-মুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা। উভয়ত্রই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, গভীর অথচ সংযত ভাব-প্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঘটনাবহুল, রসবৈচিত্র্যপূর্ণ নাটরে দৃশ্যের ন্যায় এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, বিবৃদ্ধি ও পরিণতির ক্রমপর্যায় আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অনুসরণ করি। ...এখানে বঙ্কিম মানবহৃদয়ের গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, সত্যের নগ্ন-মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যবিধাতা মানবমর্মের মধ্য দিয়া যে গভীরকৃষ্ণ অথচ রক্তরঞ্জিত নিয়তির রেখাটি টানিয়া দেন, তাহার গতি-রহস্যটি খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। .... বিষাদময় ট্র্যাজেডির মধ্যেও মানবমনের লঘু-তরল বিকাশগুলির চিত্রদিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি জীবনকে একটা অবিচ্ছিন্ন ধূসর বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেন নাই, তাহার মধ্যে আলো-ছায়ায় যথাযথ বিন্যাস করিয়াছেন।"

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আলোচনাকালে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনাটি স্মরণে রাখতে হবে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারিবারিক ট্র্যাজেডি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের আলোচনায় সেজন্য স্বাভাবিক ভাবেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এসে যায়। 'বিষবৃক্ষে'র পাঁচ বছর পরে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়। দাম্পত্য জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেমের আর্বিভাব কীভাবে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে শান্ত-সুখী জীবনকে নষ্ট করে দেয়, বঙ্কিম বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার বর্ণনা করেছেন। উভয় উপন্যাসই ত্রিকোণ প্রেমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক গল্প। পরিণতিও একই। 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি শিল্পোত্তীর্ণ রচনা। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শিল্পী বঙ্কিমের পরিণতমনের পরিপক্ক রচনা। 'বিষবৃক্ষে'র সঙ্গে তুলনা সংক্ষেপে এভাবে করা যেতে পারে

ক. 'বিষবৃক্ষে' চরিত্রের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে বঙ্কিমের কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তেমন ত্রুটি-বিচ্যুতি কম। 'বিষবৃক্ষ' সীমিত কল্পনার সৃষ্টি।

খ. 'বিষবৃক্ষে' নায়ক-নায়িকার জীবন প্রায় বাহ্য সম্পর্ক শূন্য। বাইরের জগতের নানান বাধা-বিপত্তি যে মানুষের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জটিলতর করে তুলতে পারে, বঙ্কিম সেগুলোকে বর্জন করেছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কিন্তু বাহ্যজগতের শক্তিকে অকারণে ক্ষীণ করে দেখানো হয়নি, বরং কাহিনি ও চরিত্রের উপর তার নায্য প্রভাবই দেখানো হয়েছে। যেমন কৃষ্ণকান্তের পৌনঃপুনিক উইল পরিবর্তনের ঘটনা।

গ. কুন্দননন্দিনী অপেক্ষা রোহিণী অনেকবেশি জীবন্ত এবং রক্ত-মাংসের চরিত্র বলে মনে হয়। সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরও অধিক জীবন্ত হয়েছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে বিখ্যাত পণ্ডিত সমালোচকদের কয়েকটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হল। গ্রন্থদুটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে এগুলো আপনাদের সাহায্য করবে।

ক. " 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'— ইহাদের বিষয়-বস্তু ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটি প্রায় একরূপ ; কিন্তু বঙ্কিম যে রূপ নিপুণতার সহিত ইহাদিগকে বিভিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের পাত্র-পাত্রী ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহা উচ্চাংগের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অসাধারণ কলাকৌশলের পরিচায়ক।"

*শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

খ. "'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমরের অভিমান প্রবণতা ও অন্যায় সন্দেহ গোবিন্দলালের পতনের দায়িত্বভার উভয়ের মধ্যেই ভাগ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ'-এ লেখক সূর্যমুখীকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ রাখিয়াছেন, এবং অধঃপতনের সমস্ত দায়িত্ব নগেন্দ্রর স্কন্ধেই ফেলিয়াছেন। এরূপ এক পক্ষের দোষ বাস্তব জগতে যে বিরল তাহা নহে। তবে উপন্যাসে ইহা সূর্যমুখীর চরিত্র-হিসাবে মুখ্যত্ব কতকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছে।"

*শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

গ. "...বিষবৃক্ষ' সীমিত কল্পনার সৃষ্টি। সমগ্র উপন্যাসের পরিসর পূর্ণ হয়ে রয়েছে দুটি পলায়ন ও প্রত্যাবর্তনের কাহিনীতে। এ-পরিসর পূর্ণ করার জন্য দীর্ঘ পত্রাবলী, কক্ষদৃশ্য বর্ণনার আতিশয্যও প্রয়োজন হয়েছে। তার

কারণ গোটা ব্যক্তির সমস্যা সম্বন্ধে 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমের শিল্পগত ধারণা বা শিল্পীভাবনা স্পষ্ট ছিল না।"

*সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়*

ঘ. "সে-ই [কুন্দননন্দিনী] হয়ে উঠেছে একমাত্র বঙ্কিমী নায়িকা যার মধ্যে গতিশীলতা নেই। সে যেন শুধু সেই স্বপ্ন-বাণীর বিপরীতে ঘটনাকর্ষণে কেমন করে চলে গেল, এই ব্যাপারটিকে রূপায়িত করার শৈল্পিক উপায় মাত্র।"

*সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়*

ঙ. "বিষবৃক্ষ নামের দ্বারাই মনে হতে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিক ভাবে একটা সামাজিক মতলব তাঁর [বঙ্কিমচন্দ্রের] মাথায় এসেছিল। কুন্দননন্দিনী সূর্যমুখীকে নিয়ে যে-একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্মের পক্ষে ভাল নয়, এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল এ আমি বিশ্বাস করি নে— ওটা হঠাৎ পুনশ্চ-নিবেদন। বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ রূপদ্রষ্টা রূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।"

*রবীন্দ্রনাথ*

চ. "এটা [বিষবৃক্ষ] যে পরিমাণে মানুষের মতিভ্রংশ হবার এবং বিবেকোদ্ধার করার কাহিনী সে পরিমাণে একটি ব্যক্তিত্বের সমস্যা নয়।"

*সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়*

ছ. "'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিম বাস্তব প্রণালীর অনুসরণ করিয়া তাঁহার চিরপ্রিয় রোমান্সের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করেন নাই, তাঁহার দৃষ্টি ও নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে রোমান্সের একটি অতিসূক্ষ্ম রঙ্গীন যবনিকার ব্যবধান রাখিয়াছিলেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এই সূক্ষ্ম যবনিকাও পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

*শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ বেশি মর্মস্পর্শী হয়েছে কি? (৩০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র খণ্ড ও পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত। (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব 'বিষবৃক্ষে' রক্ষিত হয়নি, হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'। এ-বিষয়ে আপনার মতামত কী? (৬০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর বিচ্ছেদ-সংঘটনে সূর্যমুখীর কতটা দোষছিল। (৩০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. কুন্দননন্দিনী ও রোহিণীর চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২. গোবিন্দলালকে নগেন্দ্র অপেক্ষা পরিণত সৃষ্টি বলা যায় কি ?

৩. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কি 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রচনা? আপনার মতামত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৪. আপনার মতে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ত্রুটি গুলি কী কী ?

## ১৫.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এতক্ষণ আমরা দুটি বিষয়ে আলোচনা করেছি। 'উপন্যাসের পাঠান্তরে' আমরা দেখিয়েছি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের

উইল' পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে অনেকখানি পাল্টে যায়। আমরা দেখিয়েছি, বঙ্কিম-মানসের দ্বৈততা তথা জটিলতার জন্যই এই পরিবর্তন হয়েছে। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে আমরা আলোচনা করেছি পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে রচিত উপন্যাসদুটির বিষয়বস্তু এক হলেও তুলনামূলক বিচারে কেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ই শ্রেষ্ঠ।

## ১৫.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ১৫.৫ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ - ১৬

# কৃষ্ণকান্তের উইল

# 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র চরিত্র বিচার

**বিষয়বিন্যাস**


১৬.০ ভূমিকা (Introduction)

১৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

১৬.২ চরিত্র মালা : প্রধান চরিত্র

১৬.২.১ রোহিণী

১৬.২.২ গোবিন্দলাল

১৬.৩ চরিত্র মালা : অপ্রধান চরিত্র

১৬.৩.১ কৃষ্ণকান্ত রায়

১৬.৩.২ হরলাল

১৬.৩.৩ মাধবীনাথ

১৬.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১৬.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১৬.০ ভূমিকা (Introduction)

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রধান চরিত্র তিনটি— রোহিণী, গোবিন্দলাল ও ভ্রমর। এই চরিত্র তিনটির পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও জটিলতা উপন্যাসের মূল বিষয়। আবার, কৃষ্ণকান্ত, হরলাল, মাধবীনাথের মতো চরিত্রগুলিও উপন্যাস-কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমরা একে একে উপন্যাসের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব।

## ১৬.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টি লেখকের এক নিগূঢ় রহস্যময় ক্ষমতার প্রকাশ। কোন গোপন মায়াবী শক্তিতে যে লেখক কাল্পনিক নরনারীর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেন, কেমন করে অমেয় জীবনী শক্তিতে তারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা বহুলাংশেই ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণের অতীত। উপন্যাস নিছক গল্পবলার উপলক্ষ মাত্র নয়, তা আসলে ওই উপন্যাসধৃত নরনারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিবর্তনের ইতিবৃত্ত। একারণে এই অধ্যায়ে আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়টি উপন্যাসের চরিত্র এবং সেই সূত্রে সমগ্র উপন্যাসটিকে বুঝতে ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে আপনাদের সাহায্য করবে।

## ১৬.২ চরিত্রমালা : প্রধান চরিত্র

এখন আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

### ১৬.২.১ রোহিণী

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র রোহিণী। শুধু বঙ্কিম সাহিত্যের নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য সৃষ্টি এই রোহিণী। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের শান্ত সুখী দাম্পত্য জীবনে দুষ্ট গ্রহের মতো প্রবেশ করে বালবিধবা রোহিণী অশান্তির ঝড় তুলেছে। তিনটি জীবন সে ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে। রোহিণী চরিত্র, তার পরিণতি বাংলা সাহিত্যের সমালোচক মহলে যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা চেতনা সে ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী তা বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে অবশ্যই। আমরা আমাদের আলোচনায় রোহিণীর চরিত্রের সামগ্রিক দিকটিকে ধরার চেষ্টা করব।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর সঙ্গে বই আকারে প্রকাশিত উপন্যাসের রোহিণীর বিস্তর ফারাক। বলা যায় বঙ্কিম যেন বই-এর রোহিণীকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। পত্রিকার রোহিণীই বঙ্কিম মানসের প্রকৃত রোহিণী। সুতরাং পত্রিকার রোহিণীর স্বরূপ কী ছিল তা জেনে নেওয়া এ-ক্ষেত্রে জরুরী। পত্রিকার রোহিণী যৌবন অতিক্রান্তা, বয়স আঠাশ-ঊনত্রিশ। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে এই বয়সী মেয়েকে যৌবনবতী বলা যেত না। এ-ছাড়াও এই রোহিণী 'ছিটা ফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র' জানত। যৌবন অতিক্রান্তা বিধবা রমণীর কামনার জ্বালা, তন্ত্রে-মন্ত্রে অভিজ্ঞতা, বিধবা সত্ত্বেও বিবাহেচ্ছা— সব মিলিয়ে যে রোহিণীকে বঙ্কিম পত্রিকার পাতায় এঁকেছেন তা সুখপ্রদ নয়। বঙ্কিম তাকে সৎ করে আঁকেননি, সে একবাক্যে লোভী, নীতিবোধবিবর্জিতা, কালিমালিপ্ত নারী। সে শুধু অর্থলোভী নয়, নির্লজ্জ ও ইতর। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন— "রোহিণী চোর, লোভী, ব্যাপিকা। ... কোন ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে কথা কহিত না।" সুতরাং এই রোহিণীর পরিণতিতে মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু বই-আকারে প্রকাশিত উপন্যাসের প্রথম সংস্করণেই বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর মূল পরিকল্পনা থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন এবং চতুর্থ সংস্করণে তো পাকাপাকি ভাবেই বদলে ফেলেছেন রোহিণীকে। এই

রোহিণী একেবারে অন্য ধাতুতে গড়া। বঙ্কিম বলেছেন— "এই রোহিণীতে আমার কিছু প্রয়োজন আছে।" এ কোন রোহিণী? —রোহিণীর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে—

"রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ রূপ উছলিয়া পরিতেছিল— শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধ্যব্যর অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।"

সে ছিল রন্ধনে দ্রৌপদী, চুল বাঁধতে, কন্যা সাজাতে গ্রামের একমাত্র অবলম্বন। সে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। অন্য নারীর তুলনায় এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। সাজ-পোষাক, সৌন্দর্য, আচার আচরণ-সব দিক থেকে বঙ্কিম তাকে সে যুগের বিধবাদের তুলনায় আলাদা করে এঁকেছেন।

রোহিণী বাল্য-বিধবা। অসামান্য রূপবতী। সামাজিক সংস্কার, পাপপুণ্যের সাজানো মুল্যবোধের বিরুদ্ধে মূর্তিমতী বিদ্রোহ যেন সে। রোহিণী নিজেই বলেছে— "আমি পাপপুণ্য জানি না, আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপপুণ্য মানি না" প্রচলিত রীতিনীতি যেমন সে মেনে নেয়নি, বিধবা সত্ত্বেও কামনা-বাসনাকে অস্বীকার করেনি। কখনো বিড়ালের উপর বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষের experiment করে কখনো বা কোকিলের কুহুতানকে লক্ষ্য করে কটাক্ষের ইঙ্গিত দিয়ে সে তার ব্যর্থ, নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনে কিছুটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করত। কিন্তু সে ব্যাভিচারিণী বা নীচজাতীয়া নারী নয়। উইল চুরির প্রস্তাব সে নিজে দেয়নি হরলালকে। কোনো প্রগল্‌ভতাও দেখায়নি বরং চুরির প্রস্তাবে শিহরিত হয়ে বলেছে— "আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।" সে বিশ্বাসঘাতিনী নয়, লোভীও নয়। টাকার প্রতি মোহ নেই তার। কিন্তু তবুও সে হরলালের বিবাহের প্রস্তাবে চুরি করতে সম্মতি দিয়েছে। রোহিণী চতুরা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না বুদ্ধমতী নারী। হরলালের উদ্দেশ্য বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। তবুও সে রাজি হয়েছে বিবাহের লোভে, দুর্নিবার জীবন পিপাসায়। তার জীবনের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছে হরলাল। এই হরলালই যখন তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে বলে—

"আমি যাই হই— কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

তখন স্পষ্টবক্তা, দুঃসাহসিকা রোহিণী নিষ্ফল ক্রোধে নির্দ্বিধায় বলেছে—

"আমি চোর! তুমি সাধু। ... যে শঠতার চেয়ে শঠতা নেই, যে মিথ্যার চোয়ে মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্বরে মুখে আনতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? ..."

তৃষ্ণার্ত, আহত বাঘিণীর মতো গর্জে উঠেছে রোহিণী—

"তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে তোমাকে আজ যা দিয়ে ঘর ঝাঁট দিই তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"

এই পর্যন্ত ঘটনায় রোহিণীকে ভ্রষ্টা রমণী বলে অন্তত আমাদের মনে হয় না। হরলালকে বিয়ে করতে রাজি থাকলেও তার প্রতি কোনো প্রেম বা আকর্ষণ রোহিণীর ছিল না। 'কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর' গোবিন্দলালই প্রথম তার জীবনে আলোড়ন তুলেছে। পাপ-পুণ্যের সংস্কারতো তার ছিলই না, উপরন্তু গোবিন্দলালকে দেখার পর তার হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা জাগ্রত হয়ে তাকে নিত্যদিন দগ্ধ করেছে। তার নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণাদীর্ণ দিনগুলোতে গোবিন্দলালের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে তীব্র প্রণয়জ্বালা। নিজের জীবনকে ভ্রমরের সুখী আনন্দময় জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সে ভেবেছে— "কোন পুণ্যবলে তাহাদের কপালে এ সুখ— আমার কপাল শূন্য।" সুখী বিবাহিত জীবনের কামনা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু কুলটা নারীর মতো গোবিন্দলালের ক্ষতি সে চায়নি। নিদারুণ অনুশোচনায়, গোবিন্দলালের প্রতি আকর্ষণবশতঃ সে আসল উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে অথবা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে বলা যেতে পারে। তার নির্ভীক স্বগতোক্তি লক্ষণীয় —

"দুষ্কর্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎ কর্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।"

রোহিণীর ধরা পড়ার কলঙ্ক, চুরির অপবাদ, লোকনিন্দা, শাস্তি, গোবিন্দলালের সহানুভূতি— সব ক্ষেত্রেই বঙ্কিচন্দ্রের সহানুভূতি রোহিণীর প্রতি রক্ষিত হয়েছে। রোহিণীর নিম্নোক্ত স্বগতোক্তিটি লক্ষ করা যেতে পারে —

"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি— আমায় রক্ষা কর— আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও...।"

বঙ্কিম রোহিণীর সম্পর্কে তার "স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ হৃদয়"— এর কথা বলেছেন। কামনার জ্বালার কথা বলেননি। আমরাও দেখেছি গোবিন্দলালের সহৃদয়তা রূপমুগ্ধ রোহিণীর হৃদয়ের রুদ্ধ ভালবাসার দ্বার উন্মুক্ত করলেও, ভ্রমরের সুখী বিবাহিত জীবনকে ধ্বংস করে গোবিন্দলালকে একান্ত নিজের করে পাবার চিন্তা সে করেনি। কিন্তু প্রেম সমাজনীতি বা কোনো বন্ধন মানে না। একদিকে দুর্দমনীয় জীবনতৃষ্ণা অন্যদিকে বিবেকের দংশন— দুয়ের সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত নিদারুণ জীবন পিপাসাই জয়ী হয়েছে। সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বে কুমতির জয় দিয়েছেন। তাই প্রেমাস্পদ গোবিন্দলালকে ইহজীবনে পাবার আশা নেই বুঝে রোহিণী আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু বারুণীর জলে নিমগ্না রোহিণীকে গোবিন্দলাল শুধু বাঁচায়নি প্রেমের স্বীকৃতিও দিয়েছে। তার বঞ্চিত, অন্ধকার জীবনে প্রেমের দীপ্ত দীপশিখা জ্বলে উঠেছে, তাই— "রোহিণীর বাঁচিতে সাধ জন্মিল।" কিন্তু বঙ্কিম জানিয়েছেন "অবৈধ প্রণয়ে বাঁচার আশা কম।" রোহিণীর মৃত্যুর সূত্রপাত এখান থেকেই। চরিত্রের অবনতিও এখান থেকেই ঘটেছে। গোবিন্দলাল ঘটিত মিথ্যা কলঙ্ক, ক্ষীরি চাকরাণীর কুৎসা রটনা রোহিণীকে অতঃপর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করেছে।

রাত্রিদিন যে নিদারুণ তৃষ্ণায় তার হৃদয় কাতর সে অন্তর্জ্বালায় সে জর্জরিত, সেই জ্বালায় সে ভ্রমরকেও জ্বালাতে চেয়েছে। ভ্রমরকে গয়না দেখিয়ে শান্ত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে 'সোনায় পা দিতে নেই' বলে গিলটি করা গয়নাগুলি যেভাবে কুড়িয়ে সে পুটুলি বেঁধেছে তাতে তার ঈর্ষা ও প্রতিশোধ স্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে নির্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতাও প্রকাশ পায়। কলঙ্ককে যেন সে তার অভীষ্ট লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। রোহিণীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে এখান থেকেই। যদিও এখানেও তার চরিত্রে কোনো স্বভাব-লাম্পট্যের পরিচয় আমরা পাই না, যা দ্বিতীয়খণ্ডের রোহিণীর মধ্যে লক্ষিত হয় এবং যার পরিণতিতে তার মৃত্যু ঘটে।

উপন্যাসের দ্বিতীয়খণ্ডে রোহিণীর চরিত্রগত পরিবর্তন অনেক বেশি। তার চরিত্রের চূড়ান্ত অবনতি দেখানো হয়েছে শেষে। চিত্রানদীতীরে প্রসাদপুরের কুঠিতে 'হাপ পরদানসীন' রোহিণীর যে পরিচয় বঙ্কিম দিয়েছেন তার পূর্বাভাস সমগ্র উপন্যাসে নেই। রোহিণীর নিশাকর-দর্শন, রূপমুগ্ধতা, মুহূর্তের দেখায় গোবিন্দলালকে বিস্মৃত হয়ে নিশাকরের প্রতি আসক্তি— সব মিলিয়ে রোহিণীর দোলাচল মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন বঙ্কিম এভাবে—

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? ... দেখিতেও সুপুরুষ, গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরসা, কিন্তু এর মুখ চোখ ভালো। বিশেষ চোখ, —আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো?"

রোহিণীর এ- জাতীয় আকস্মিক পরিবর্তন পাঠককে বিভ্রান্ত করে। সুন্দর পুরুষ মাত্রেই যে রোহিণীর আকর্ষণ ঘটবে তার জন্য বঙ্কিম পাঠককে প্রস্তুত করেননি। রূপবান গোবিন্দলালকে দেখে প্রেম পিপাসার্ত যে রোহিণী আত্মবিসর্জন দিতে গিয়েছিল, সেই রোহিণীও সংযমহারা হয়ে, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্যা হয়ে মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের ফাঁদে পা দেবে তা যেমন মেনে নিতে কষ্ট হয় তেমনি পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যুও পাঠককে দ্বিধাবিভক্ত করে। রোহিণীর পরিণতি নিয়ে সমালোচনার শুরুও সেজন্যই। রোহিণী তার জীবনে সমাজনীতির তোয়াক্কা করেনি, বিধবা হয়েও বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করেছে। বিবাহিত গোবিন্দলালের প্রতি তীব্র আকর্ষণের জন্য ভ্রমরের সুখী দাম্পত্য জীবনে আগুন জ্বালিয়ে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দলালের সঙ্গে দেশত্যাগী হয়েছে কিন্তু সে একনিষ্ঠ নয় তা উপন্যাসে প্রথমাবধি বর্ণিত হয়নি। তাই তার পরিণতি বাংলা সাহিত্যে এক অন্তহীন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে রোহিণীর পরিণতি সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেছেন —

"রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু রইলো না। ...সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া চাই এবং হলোও সে। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং

পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্যও আক্ষেপ করিনে কিন্তু করি তার অকারণ জবরদস্তি অপমৃত্যুতে।"

শরৎচন্দ্রের বক্তব্য এই যে নীতিবাগীশ বঙ্কিম 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ অনাবশ্যক ভাবে নিশাকরকে এনে রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তা করতে গিয়ে শিল্পকে হত্যা করেছেন। ড০ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন 'Bad Art' কিন্তু সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতো অনেক সমালোচক রয়েছেন যাঁরা রোহিণীর মৃত্যুতে কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পাননি। আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি রোহিণী চরিত্রাঙ্কণে বঙ্কিম পরিপূর্ণ দ্বিধামুক্ত ছিলেন না। উপন্যাসের প্রথম দিককার রোহিণী এবং শেষের রোহিণী একেবারেই আলাদা। যে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবেসে সমাজ-ধর্ম-ন্যায়-নীতিকে অস্বীকার করেছে সেই রোহিণী মুহূর্তের ভাললাগায় নিশাকরকে দেখে রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করেছে অভিসারে। এই রোহিণী নির্দ্বিধায় বলেছে —

"আমি যদি ভুলবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।"

এ কোন রোহিণী? বঙ্কিম রোহিণী চরিত্রের এই মৃগয়াবৃত্তির পরিচয় উপন্যাসের প্রথমখণ্ডে দেননি। এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের অনেক বিদগ্ধ সমালোচক অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে রোহিণী একনিষ্ঠতো ছিলই না, গোবিন্দলালের প্রতি যে তার প্রেম, তা রূপলালসা ও আসঙ্গলিপ্সা ছাড়া আর কিছু নয়। ভোগপ্রমত্ত চিত্তে সে ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করতে চেয়েছে। ড০ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও বলেছেন—

"ক্লিওপেট্রার যে প্রেম তা যত ঐশ্বর্যবানই হোক একনিষ্ঠ নয়। রোহিণী চরিত্র আলোচনায় রমণী হৃদয়র এই বৈশিষ্ট্যটুকু মনে রাখতে হবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের রোহিণীকে সে ভাবেই এঁকেছেন। রোহিণী সম্পর্কে আগাগোড়া উপন্যাসে স্থানে স্থানে তিনি অনেক নিন্দাবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। কখনো বলেছেন 'রোহিণী লোক ভাল নয়', 'রোহিণীর অনেক দোষ'। এছাড়াও 'ভুজঙ্গী', 'প্রেতিনী', 'রাক্ষস', 'পিশাচী' ইত্যাদি বিশেষণেও ভূষিত করেছেন। দ্বিতীয়খণ্ডে বঙ্কিম রোহিণীর মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে —

"রোহিণী দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান, পটলচেরা চোখ। রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান।"

তাই রোহিণীর নিশাকর আসক্তি। বিশ্বাসঘাতিনী হতে না চাইলেও চরিত্রগত লাম্পট্যই তাকে বাধ্য করেছে বিশ্বাসঘাতিনী হতে। বঙ্কিম আরও বলেছেন —

"নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে— সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে— কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।" অর্থাৎ কামনার জ্বালাতেই রোহিণী পুরুষচিত্ত জয় করতে চেয়েছে, প্রেমে কোনো নিষ্ঠা তার ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা রমণীর বিবাহেচ্ছা, সমাজ নীতি বিগর্হিত বলেই মনে কবতেন। সুতরাং প্রশ্ন জাগে নীতির প্রশ্নেই কি বঙ্কিম রোহিণীর এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। আমাদের ধারণা, উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তক্ষেপ অনেক বেশি। শরৎচন্দ্রও তাঁর সমালোচনায় সমাজ রক্ষাকারী নীতিবাদী বঙ্কিমের এই হস্তক্ষেপের কথাই বলেছেন। শরৎচন্দ্র রোহিণীর মৃত্যুকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে নীতির প্রশ্ন তুলেছেন, শিল্পগত ত্রুটির কথা বলেননি ততটা।

বঙ্কিমচন্দ্র যেন ইচ্ছাকৃত ভাবেই রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রসাদপুরের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দেননি। এমনকি তাদের নিভৃত আলাপ, অবৈধ জীবন যাপনের বিস্তৃত চিত্র অঙ্কন করেননি। পাপের আলোচনায় তাঁর কুণ্ঠা সর্বত্র। বঙ্কিম শুধু জানিয়েছেন —

"সেখানে উভয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না।"

তাই উপন্যাসর শেষাংশের রোহিণী যে আচরণ করেছে তাতে তাকে 'পাপীয়সী' বলাই যায়। এবং পাপের সমুচিত দণ্ড যে সে পাবে তাও স্বাভাবিক। পেয়েছেও সে। তার চরম বেদনার্ত "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ বিদায় দেও" সত্ত্বেও গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটেছে। ড০ সেনগুপ্ত বলেছেন —

"নিপুণ মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে স্তরে স্তরে ক্রমবিকশিত রোহিণীর জীবন হঠাৎ শেষ হল প্রসাদপুরে এসে। দ্রুত কাহিনী সমাপ্ত করতে লেখক রোহিণীকে অবিশ্বাসিনী করে পিস্তলের মুখে সঁপে দিলেন। অথচ গোবিন্দ-রোহিণীর প্রসাদপুরের জীবনের বিস্তৃত বিবরণে কিছু কাল ব্যয়িত হলেও দুজনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই পরিণতিয়ই ঘনিয়ে আসত— তার সব সম্ভাবনা বীজাকারে থেকে গিয়েছিল। তবুও যা পেলাম রোহিণীর সেই মৃত্যু তাতে শিল্পের স্খলন।"

আমরাও ড° গুপ্তের মতোই মনে করি রোহিণীর মৃত্যুতে 'শিল্পের স্খলন' ঘটেছে। ড° গুপ্ত রক্ষণশীলতা ও নীতিবাগীশতার স্থান এতে খুঁজে পাননি। কিন্তু আমরা মনে করি সমাজরক্ষক নীতিবাগীশ বঙ্কিমের হাত ছিল বলেই রোহিণীর মৃত্যু শিল্পগত ত্রুটি হয়েছে। রোহিণীর মৃত্যু হয়তো হতই কারণ গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি কোনো প্রেম ছিল না, ছিল রূপতৃষ্ণা এবং প্রসাদপুরের যে জীবনের আভাস মাত্র বঙ্কিম দিয়েছেন তাতেও আমরা দেখেছি গোবিন্দলালের জীবন ভ্রমরময়। সুতরাং এ-জীবন যে বেশিদিন রোহিণীকেন্দ্রিক হয়ে থাকবে না তা স্বাভাবিক কিন্তু বঙ্কিম যে কারণে রোহিণীর মৃত্যু দেখিয়েছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। আনুপূর্বিক রোহিণীর চরিত্রে সেই লাম্পট্য ছিল না।

তবুও জীবনের দীপ্তিতে, ঔজ্জ্বল্যে রোহিণী যে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ সৃষ্টি তা স্বীকার করতেই হয়। শেষ পর্যন্ত তার আকুল আবেদন "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ", বেঁচে থাকার জন্য এই প্রার্থনাকে শুধু কামতৃষ্ণা

বলা যায় না। জীবনে কোনো আশাই তার পূর্ণ হয়নি। তার জীবনতৃষ্ণা অতৃপ্তই থেকে গেছে। তাই তার আর্তনাদ 'মারিও না! মারিও না' পাঠককে অস্থির করে। রোহিণীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই। রোহিণী এ-জন্যই বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

**বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য কীর্তি রোহিণী চরিত্র**

শুধু বঙ্কিম-সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেইরোহিণী চরিত্রটি একটি অত্যুজ্জ্বল সৃষ্টি। রোহিণী চরিত্রটি, বিশেষ করে তার পরিণতি বাংলা সাহিত্য-জগতে অন্তহীন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একদল সমালোচক মনে করেন রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের যাবতীয় লজিক উপেক্ষা করে রোহিণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়েছেন। অন্য দিকে আরেকদল সমালোচক মনে করেন যে রোহিণীর মৃত্যু স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে, রোহিণী চরিত্রের পরিণতি শিল্পী বঙ্কিমের দক্ষতারই পরিচয় দেয়। সে যাই হোক, রোহিণী তার সুতীব্র জীবনতৃষ্ণা নিয়ে, তার প্রেম-কামনা-ঈর্ষা-লোভ নিয়ে যেভাবে উপস্থিত হয়েছে বা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে বাংলা কথা সাহিত্যে, বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা প্রভৃতি অসামান্য নারী চরিত্রগুলির সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের অমরসৃষ্টি 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনীর পূর্বসূরী এই রোহিণী।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

১. হরলালের উইল চুরির প্রস্তাব রোহিণীর প্রথমে প্রত্যাখ্যান ও পরে গ্রহণ করার কারণ কী? (৩০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

২. গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ কি শুধুই জৈবিক তাড়না ? না কি গোবিন্দলালের প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেম ছিল? (৮০টি শব্দ)

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. নিশাকরের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ কতটা শিল্পসম্মত হয়েছে যুক্তিসহ বিচার করুন।

২. রোহিণী চরিত্র সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল নীতিবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় কি? যুক্তি-সহ আপনার মতামত বিশ্লেষণ করুন।

৩. রোহিণীর সাজপোষাক ও গুণাবলির যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. ভ্রমরের প্রতি রোহিণীর ঈর্ষার প্রকাশ উপন্যাসে কোথায় কীভাবে ঘটেছে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন।

৫. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের রোহিণী এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসের রোহিণী এক নয়। রোহিণী চরিত্রের পরিবর্তন কোথায় এবং কেন হয়েছে বিচার করুন।

৬. রোহিণীর পরিণতি কতটা শিল্পসম্মত হয়েছে? আপনার মতামত যুক্তিসহ তুলে ধরুন।

## ১৬.২.২ গোবিন্দলাল

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলাল জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রমরের স্বামী। গোবিন্দলাল শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন এবং কর্তব্যপরায়ণ। বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—

"তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে— কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে।"

গোবিন্দলাল রূপবান যুবা। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের। কিন্তু গোবিন্দলালের নিজেরই অজান্তে তার হৃদয়ের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণাই তার সংসার ছারখার করে দিয়েছে। তার স্ত্রী ভ্রমর রূপবতী নয় কিন্তু তার সরলতা, স্বামী নির্ভরশীলতা, বালিকা সুলভ আচরণ গোবিন্দলালকে অভিভূত করে রেখেছিল। সে কখনোই স্ত্রীকে অবহেলা করেনি।

গোবিন্দলাল সৌন্দর্যপ্রিয়ব্যক্তি। তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিদর্শন বারুণী পুষ্করিণী তীরে সুন্দর মনোরম উদ্যান নির্মাণ। সৌন্দর্যপ্রিয়তা, পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক বৃত্তিগুলো সক্রিয় হলেও তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল না বললেই চলে। বারুণী পুষ্করিণী তীরে ক্রন্দনরতা অপরূপ রূপলাবণ্যে ভরপুর বাল্যবিধবা রোহিণী সহজেই তাকে আকর্ষণ করেছিল। যদিও ভগিনী জ্ঞানেই গোবিন্দলাল তার

দুঃখ দূর করতে চেয়েছিল এবং চুরির অপবাদ ও দণ্ড প্রাপ্তি থেকেও রক্ষা করতে চেয়েছিল কিন্তু রোহিণীর তাঁর প্রতি তীব্র আকর্ষণের কথা বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি— "যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে।" 'ভুজঙ্গী' রোহিণী তাকে রূপপাশে বন্দী করলেও গোবিন্দলাল শুরুতে তার বুদ্ধি বিবেচনা ত্যাগ করেনি তাই রোহিণীকে সে দেশত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু গোবিন্দলালের অন্তরের অতৃপ্ত সুপ্ত রূপলালসা ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়েছে এবং রোহিণীর প্রতি সাময়িক অনুকম্পা পরিণত হয়েছে তীব্র আকর্ষণে। ভ্রমর কর্তৃক রোহিণীকে মৃত্যুর পরামর্শ দান এবং রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা এবং গোবিন্দলাল কর্তৃক প্রাণ ফিরে পাওয়ায় শেষপর্যন্ত তাদের তিনজনের জীবন মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। রোহিণীর জীবনপিপাসা, গোবিন্দলালের রূপ তৃষ্ণা— এই দুয়ের টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত গোবিন্দলাল ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা করেছে —

"হা নাথ ! নাথ ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর ! —তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব— ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও— আমি তোমার বলে আত্মজয় করি।"

কিন্তু দুর্বল চিত্ত গোবিন্দলাল 'আত্মজয়' করতে পারেননি। তার অনন্ত রূপতৃষ্ণা ভ্রমর নিবারণ করতে না পারলে রোহিণী তার 'নিদাঘের নীল মেঘমালার মত' রূপ নিয়ে গোবিন্দলালের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্য অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত গোবিন্দলাল রোহিণীর দৃষ্টি পথের বাইরে চলে যেতে চেয়েছে, কারণ—

"... মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।"

এই আন্তরিক শুদ্ধতা তখনো পর্যন্ত গোবিন্দলালের বর্তমান ছিল সে জন্য সমাজ বন্ধন এবং পারিবারিক সম্পর্ককে কে ছিন্ন করে, নীতি ধর্ম বিসর্জন দিয়ে রোহিণীর বহ্নি শিখায় আত্মসমর্পন করতে চায়নি। নৈকট্য মানুষের দুর্বলচিত্তে মোহের সঞ্চার করে এই বিশ্বাসে স্থানান্তরে বন্দরখালিতে চলে গেছে গোবিন্দলাল। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। গোবিন্দলালের অনুপস্থিতিতে রোহিণীকে কেন্দ্র করে ক্ষীরি চাকরাণী প্রমুখদের কুৎসা রটনা এবং তারই ফলস্বরূপ ভ্রমরের নিকট রোহিণীর গিলটি করা গহনা প্রদর্শনে গোবিন্দলালের প্রতি বিচার বুদ্ধিহীন ভ্রমরের মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে, ফলে সত্যাসত্য বিচার না করেই সে স্বামীকে পত্র মারফত জানায় যে স্বামীর প্রতি ভক্তি বা বিশ্বাস কোনোটাই তার নেই এমনকি স্বামী দর্শনে কোনো সুখও নেই। বজ্রাঘাত সদৃশ পত্র প্রাপ্তির পর গোবিন্দলাল ফিরে আসে কিন্তু অভিমানী ভ্রমর তখন পিত্রালয়ে ! স্ত্রীর প্রতি রাগে দুঃখে অভিমানে গোবিন্দলাল তাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু—

"ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না । ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায় নাম থাকে।"

তাই ভ্রমরকে ভুলবার উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে রোহিণীর চিন্তা স্মৃতি পথে উদয় হয়। ক্ষুদ্র রোগ উপশমের জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয় গোবিন্দলাল। যে রোহিণীর স্মৃতি গোবিন্দলাল ভুলে থাকতে চেয়েছিল অথচ আলৌকিক রূপপ্রভা নিয়ে যে তার হৃদয়ে সর্বদাই ছায়া সদৃশ ছিল সেই রোহণীর স্মৃতিই শেষ পর্যন্ত বাসনায় পরিণত হয়। ভ্রমরের অনুপস্থিতিতে গোবিন্দলালের কর্তব্যজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান লোপ পায়। শেষে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু এবং মায়ের কাশী গমনের সংকল্প তার শেষ বন্ধনকেও ছিন্ন করে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —

"গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল— কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে।"

পাপের প্রথম সোপানে নেমে পুণ্যাত্মা যা ভাবে গোবিন্দলালও তা-ই ভেবেছিল যে এই রূপ মুগ্ধতায় কোনো পাপ নেই, কোনো দোষ নেই —

"রূপে মুগ্ধ ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি?"

সুতরাং "আলুলায়িত কুন্তলা, অশ্রু বিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা" ভ্রমরের কাতর অনুরোধের কোনো মূল্যই থাকেনি তার কাছে। সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বে কুমতির জায় হয়েছে সর্বত্র। রোহিণী যার হৃদয়ে, 'কাল ভোমরা' তার ভালো লাগবে কি করে? সে ভেবেছে "এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু রূপের সেবা করিব"। রূপের পূজারী গোবিন্দলাল তার 'অসার আশাশূন্য' জীবন ইচ্ছামত কাটানোর উদ্দেশ্যে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করেছে। গোবিন্দলাল জানত, যে অমূল্য প্রেম সে পরিত্যাগ করল তা সে কোনোদিন ফিরে পাবে না তবুও রোহিণীর সঙ্গেই জীবন কাটানোর সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্যহীন জীবন পরিণামের দিকে ভেসে গেছে। রোহিণীর রূপের জয় হয়েছে। কিন্তু গোবিন্দলালের মোহভঙ্গ হতেও সময় লাগেনি। প্রসাদপুরের রুদ্ধ কক্ষে ভ্রমরের জন্য কাঁদবার পথ থাকলেও ফিরে আসার কোনো পথ গোবিন্দলালের ছিল না । এই অধঃপতন থেকে এই কলঙ্কিত জীবন থেকে ফিরে আসার কোনো পথই রাখেননি বঙ্কিমচন্দ্র। ভ্রমরের কাছে সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করাও সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। আত্মমর্যাদাবোধ তার প্রখর ছিল তাই যে সম্পত্তি ভ্রমরের তা সে গ্রহণ করতেও চায়নি। ভয়ে, পাপবোধে, লজ্জায় ভ্রমরের কাছে মুখ দেখানোর সাহসও তার ছিল না। কিন্তু ভ্রমরকে ত্যাগ করে রোহিণীকে গ্রহণ করেই গোবিন্দলাল তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল— "রোহিণী ভ্রমর নহে-- এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে, এ ভোগ, এ সুখ নহে— এ মন্দার ঘর্ষণ পীড়িত বাসুকিনিশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা নহে।" সুতরাং নীলকণ্ঠের মতো বিষ যে পান করেছে তা তার কণ্ঠেই লেগে রইল। সে অনুভব করেছে —

"ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।"

সেজন্যই প্রসাদপুরে রোহিণী গোবিন্দলালের যে জীবন-ছবি দেখি তা সুমধুর নয়। গোবিন্দলাল সেতার বাজিয়ে বা নভেল পড়েই জীবন কাটিয়েছে। তার অন্তরের ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণাই মনে হয় ধীরে ধীরে তাকে ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করেছিল।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

গোবিন্দলালের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রোহিণীর পরিণতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকের মতামত —

বিদগ্ধ পণ্ডিত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীকে গুলি করে হত্যা প্রসঙ্গে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন —

"প্রণয় তরঙ্গে ভাটা না ধরিলে, অবিশ্বাসিতার প্রথম চেষ্টাতেই যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করিবে ইহা একটু অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গোবিন্দলাল একটা বর্ধমান বিতৃষ্ণার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে যুদ্ধ করিতেছিল এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বই তাহাকে তাহার অজ্ঞাতসারে এরূপ একটা সাংঘাতিক পরিণতির জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।"

কিছুক্ষণের সাক্ষাতে নিশাকরের প্রতি আকর্ষণ, নদী তীরে অন্ধকারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরিণতিতে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু খুবই দ্রুত গতিতে ঘটেছে। রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকার চরম দণ্ড দিয়েছে গোবিন্দলাল। দণ্ড সে নিজেও পেয়েছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

**গোবিন্দলাল সম্পর্কে ভিন্ন মত —**

গোবিন্দলালের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রোহিণী হত্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন —

"প্রসাদপুরের কুঠি বাড়িতে গোবিন্দলালের বেশ নাটকীয় অনুশোচনা দেখতে পাই বটে, ভ্রমরের স্মৃতির রোমন্থনও দেখি। ...সুতরাং বুঝতে আমাদের বাকি থাকে না যে প্রসাদপুরের কুঠিতে গোবিন্দলালের অনুশোচনা দেখতে যতই ভাবগম্ভীর হোক, আসলে ও হল ভোগী পুরুষের ভোগান্তিক অবসাদ যাপন এবং শৌখিন-আত্ম-তিরস্কার। হঠাৎ আর একটি মোহিনীর ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগল ঠোঁটের

কাছাকাছি এসে গেলে অনুশোচনাও কেটে যাবে, স্মৃতিমাত্র-ভ্রমরও মন থেকে মুছে যাবে।”

রোহিণীর প্রতি প্রেম না থাকা সত্বেও তার সঙ্গে জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে। অন্তর ভ্রমরময় হওয়া সত্বেও ফিরে যাওয়ার কোনো পথ তার ছিল না। এটাই গোবিন্দলালের জীবন-ট্রাজেডি। অনুশোচনা- কাতর গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর অনিবার্য মৃত্যু সংঘটিত হবার পর সে নিরুদ্দেশ জীবন কাটিয়েছে ছয় বৎসর। ছয় বৎসর পর নিঃস্ব রিক্ত গোবিন্দলাল অর্থসাহায্য চেয়ে সেই ভ্রমরেরই কাছে পত্র লিখেছে লজ্জা, ভয় অহংকার বিসর্জন দিয়ে। “আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি, আমায় তুমি স্থান দেবে কি?”—তার এই উক্তিতে ভাগ্যহত, অনুশোচনাগ্রস্ত গোবিন্দলালের ফিরে আসার আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অভিমানিনী ভ্রমরের ক্ষমাহীন দাম্পত্য জীবনের আদর্শ তাকে প্রত্যাখ্যান করলে— তার জীবনের শেষ অবলম্বনও চলে যায়। এর চাইতে চরম শাস্তি আর কী হতে পারে। ভ্রমরের মৃত্যুর মুহূর্তে তাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হলেও ভ্রমরের শেষ প্রার্থনা ছিল জন্মান্তরে সে যেন সুখী হতে পারে— অর্থাৎ পরজন্মে সে স্বামী হিসেবে গোবিন্দলালকে চায়নি— শুধু চেয়েছে সুখী হতে। এও গোবিন্দলালের কৃতকর্মেরই ফল। তার দুঃখ যন্ত্রণার কেউ অংশীদার হয়নি। এরপর গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। করেছেও সে। সন্ন্যাস-জীবনে ভগবৎ পাদপদ্ম জীবন সমর্পণ করে সে ভ্রমরাধিক ভ্রমর লাভ করেছে। ভোগলিপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মায়া-মোহহীন জীবনে ত্যাগের মহিমার মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ করেছে গোবিন্দলাল।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

গোবিন্দলালের চরিত্র আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের নগেন্দ্রর কথা মনে আসে। দুজনেই সুপুরুষ, শিক্ষিত রুচি সম্পন্ন। দুজনের জীবনেই বিবাহোত্তর প্রেম জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী এবং গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনে কুন্দননন্দিনী ও রোহিণীর আবির্ভাবে সমস্যার সূত্রপাত। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের পদস্খলনের প্রধান কারণ দুজনের সংযমের অভাব। প্রবৃত্তি তাড়িত মনকে সংযত করতে যে মানসিক শিক্ষা আবশ্যক তা তাদের ছিল না। তাই দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া সত্বেও দুজনেই সংযম হারা হয়েছে। নতুন ও অনন্তের যে অংশ অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত— সেই নতুনের রূপমোহে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল ভেসে গেছে। কিন্তু সমস্যা এক হলেও দুজনের চরিত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নগেন্দ্রর শিক্ষিত মন কখনো সমাজ বহির্ভূত প্রেমকে গ্রহণ করতে চায়নি। নগেন্দ্র তার আকাঙ্ক্ষাকে সমাজ বন্ধনে থেকেই তৃপ্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমরকে ত্যাগ করে অবৈধ প্রেমে মত্ত থেকেছে, সমাজ বন্ধন তুচ্ছ করে। নগেন্দ্রনাথের মোহ সাময়িক ভুলবশত ঘটেছিল যা সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের

পর কেটে যায় এবং দুজনের মিলনের পথও প্রসারিত হয় কিন্তু গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না। ভ্রমর ও রোহিণী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শান্তি লাভ করলেও গোবিন্দলালকে তাই অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ভগবৎ পাদপদ্মে মন স্থাপন করে শান্তি লাভের চেষ্টা করতে হয়েছে। তবে গোবিন্দলাল নগেন্দ্র অপেক্ষা অনেক পরিণত সৃষ্টি। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ড০ ক্ষেত্র গুপ্তের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল—

"...যে নৈতিকতাকে লালন করেছে ব্যক্তি হৃদয়ে তার জন্ম উনিশ শতকের নব্য মানববাদী শিক্ষায়, চিত্তের মুক্তি বোধে এরা আধুনিক মানুষ বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক পুরুষ। দাম্পত্যে নিষ্ঠা শুধু নারীর কর্তব্য, পুরুষের জন্য অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা -- এই মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল ধারণার মূর্ত প্রতিবাদ -- নগেন্দ্র গোবিন্দ।"

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

একজন বিশিষ্ট সমালোচক নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালকে বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম আধুনিক পুরুষ' বলেছেন। গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে মন্তব্যটি কতটা যুক্তিযুক্ত? (৬০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ কি কেবলই রূপতৃষ্ণা, না কি প্রেম? (৬০টি শব্দ)

.....

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. গোবিন্দলালের পরিণতি অর্থাৎ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া কতটা শিল্পসম্মত হয়েছে? আপনার মতামত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করুন।

২. গোবিন্দলাল কি একজন প্রেম-পিপাসু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, না কি ভোগলোলুপ শরীর-সর্বস্ব পুরুষ মাত্র? আলোচনা করুন।

৩. ভ্রমর ও রোহিণীর টানাপোড়েনে গোবিন্দলাল কীভাবে বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : পূর্বোক্ত আলোচনা এবং মূল উপন্যাস গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন]

### ১৬.২.৩ ভ্রমর

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলালের অপরিণতবয়স্কা স্ত্রী ভ্রমর। ভ্রমর বঙ্কিমচন্দ্রের মানসকন্যা। ভ্রমর রূপবতী নয়, কালো কিন্তু তার গুণ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। সে পতিপরায়ণা, পতিনির্ভরা। গোবিন্দলাল ছাড়া আর কিছুই সে বোঝে না। সংসার অনভিজ্ঞা অভিমানিনী বালিকা সে। গোবিন্দলালের সঙ্গে আট বৎসর বয়সে তার বিয়ে হয়। বাল সুলভ আচরণ, সরলতা, চাপল্য দিয়ে সে গোবিন্দলালকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক তার গড়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের দাম্পত্য জীবনের ঘটনাগুলি খুব লঘু ভাবেই এঁকেছেন। তবে বলা যায় গোবিন্দলালের দাম্পত্য জীবন সুখেরই ছিল। কিন্তু ভ্রমর গোবিন্দলালের সুপ্ত রূপ লালসা চরিতার্থ করতে পারেনি। তাই বাল্যবিধবা অসামান্য রূপবতী রোহিণী অনায়াসেই গোবিন্দলালের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছে। সহজ সরল ভ্রমরের স্বামীর প্রতি ছিল অগাধ বিশ্বাস। বিচার বুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল তার। সে সিদ্ধান্ত নিত আকস্মিক প্রেরণায় কিন্তু তার পরিণতির কথা চিন্তা করবার মতো স্থির বুদ্ধি তার ছিল না । 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখীর মতো সংসার-অভিজ্ঞ হলে হয়তো ভ্রমরের জীবন পরিণতি অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু ভ্রমর সূর্যমুখী নয়। তাই গোবিন্দলাল চুরির অপবাদ থেকে রোহিণীকে রক্ষা করলে সে পতিব্রতা স্ত্রীর মতোই গোবিন্দলালের পরদুঃখকাতরতায় মুগ্ধ হয়েছে। কোনো সংশয় বা আশঙ্কা তার মনে জাগেনি। কিন্তু গোবিন্দলালের প্রতি বাল্যবিধবা রোহিণীর আকর্ষণের কথা শুনে সে অসহিষ্ণু বালিকার মতো আচরণ করেছে। ক্ষণিকের ভাবনায় সে রোহিণীকে বারুণী পুকুরে ডুবে মরবার পরামর্শ দিয়েছে। তার সাত রাজার ধন মানিককে কেউ কেড়ে নেবে তা সে সহ্য করবে কী করে ? তার এই আচরণে বিচক্ষণতার অভাব লক্ষিত হয়। ফলে তার এই পরামর্শদান তার জীবনে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। বারুণী পুকুরে রোহিণীর ডুবে মরার প্রচেষ্টা ও গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীর পুনর্জীবন প্রাপ্তি ভ্রমরের ভাগ্য বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দর এবং রহস্যময় ইঙ্গিতে ভ্রমরের ভবিষ্যৎ পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন---

"... গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্ল রক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপন করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন। সেই সময়ে ভ্রমর, একটা

লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরই কপালে লাগিল।"

ভ্রমরের মনে তখনই সংশয়ের কালো মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে যখন গোবিন্দলাল তার কাছে হৃদয়ের দুর্বলতা গোপন করেছে। বালিকা হলেও গোবিন্দলালের অর্ধাঙ্গিনী সে। স্বামীর অস্থিরতা, উদাসীনতা তার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। তাই—

"কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ — বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল— কোথাও কিছু নাই— অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে— ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলিল।"

কিন্তু 'নিদাঘের নীল মেঘমালার মত' রোহিণীর যে রূপ গোবিন্দলালের হৃদয়ে অঙ্কিত সেখানে ভ্রমরের স্থান হবে কী করে ? গোবিন্দলাল ভ্রমরের প্রতি কর্তব্যবোধে, রোহিণীকে ভুলে থাকবার জন্য বন্দরখালি চলে গেছে। স্বামী সোহাগিনী ভ্রমরের যাবতীয় ভালবাসা ছিল গোবিন্দলাল কেন্দ্রিক। সুতরাং স্বামীর অনুপস্থিতিতে পীড়িত হয়েছে ভ্রমর। কৃষ্ণহীনা রাধার মতোই তখন তার সংসার জীবনশূন্য মনে হয়। স্বামীর অদর্শনে কাতর ভ্রমরের ক্ষীরি চাকরাণীর নিকট কুৎসা শ্রবণে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলেও স্বামীকে সে অবিশ্বাস করেনি। কুৎসা রটনার উপযুক্ত জবাব সে দিয়েছে। যে স্বামী তার শিক্ষক, ধর্মজ্ঞ যে তার জীবনের সত্যস্বরূপ তার বিরুদ্ধে কোনো কথা সে সহ্য করেনি। তার কোমল হৃদয় অবাঞ্ছনীয় কাহিনি শ্রবণে শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু সত্য চাপা থাকে না। সেই অমোঘ সত্যটি যখন পল্লবিত, বিকশিত বর্ধিত হয়ে তার কানে পৌঁছেছে তখন তার কাছে সমস্ত সংসার দুলে উঠেছে। স্বামীই ছিল তার একমাত্র বিশ্বাস। তাই স্বামীর প্রবঞ্চনায় তার সহ্য শক্তি রহিত হয়েছে। তার উপর রোহিণীর কাছে গিলটি করা গয়না দেখে সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। রাগে দুঃখে, সে তার অন্তরের জ্বালা, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্বামীর কাছে লেখা চিঠিতে। বিবেচনাহীন ও সাংসারিক বুদ্ধিহীনা বালিকা ভ্রমর বুঝতেও পারেনি এর পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অবিশ্বাস ও অভিমানই তাদের দাম্পত্য জীবনে ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে। এ-প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকেরাও একমত। ড° শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ভ্রমরের অবিশ্বাস এই উপন্যাসের 'প্রধান ও শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি'। তাঁর মতে এই ভুলের ফলেই গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ভাগ্যস্রোত ভিন্ন খাতে বয়ে গেছে এবং গোবিন্দলালকে রোহিণীর প্রতি পুরোপুরি আকর্ষিত করেছে। ভ্রমরের এই অবিশ্বাসের পিছনে কাজ করেছে বাইরের লোকেদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সহানুভূতির অভাব ও পরচর্চাপ্রিয়তা।

ভ্রমরের অবিশ্বাস ও অভিমানই কি তাদের দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয়ের মূল কারণ না কি এই বিপর্যয় অনিবার্য ছিল তাদের জীবনে— আপনারা এ সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলুন।

অবিশ্বাসে, অভিমানে ভ্রমর চিঠিতে লিখেছে—

"যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।"

বালিকা সুলভ অস্থিরতা ও কল্পিত আদর্শবাদে বিশ্বাসী ভ্রমর স্থির বিবেচনা বুদ্ধির অভাবে গোবিন্দলালকে এই চিঠি লিখেছে এবং অভিমানবশত পিত্রালয়ে চলে গেছে। কিন্তু এর পরিণতিতে তার দাম্পত্যের শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন হয়ে গেছে। গোবিন্দলালকে যদি সে বন্দরখালি যেতে না দিত তবে হয়তো তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটত না। গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু সমাজবন্ধন, নীতিনিয়ম, পারিবারিক সম্পর্ক, নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিতে পারছিল না, কিন্তু ভ্রমরের চিঠি তাকে বন্ধন মুক্ত করে দিয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত গোবিন্দলাল ভ্রমরের চিঠি পাওয়ার পর তার উপর বিদ্বেষে, ক্ষোভে রোহিণীকেই ধ্যান-জ্ঞান মনে করেছে, রূপজ মোহে ধরা দিয়েছে সে। রোহিণীর স্মৃতি তখন বাসনায় রূপান্তরিত হয়েছে। কর্তব্যের বন্ধন শিথিল হলে আনুগত্যও কমে যায়। জমিদার কৃষ্ণকান্তের চতুর্থবার উইল পরিবর্তন এবং মাতার কাশী গমনের সংকল্প ভ্রমর গোবিন্দলালের দাম্পত্য বন্ধনকে একেবারেই ছিন্ন করেছে। ক্রন্দনরতা, আলুলায়িত কুন্তলা, বিবশা বালিকা ভ্রমরের কোনো প্রার্থনা, কোনো অনুনয়ই আর গোবিন্দলালের হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেনি। ভ্রমরের কাতরোক্তি 'ক্ষমা কর, আমি বালিকা' গোবিন্দলালকে নিবৃত্ত করেনি। ভ্রমর তার সমস্ত সম্পত্তি গোবিন্দলালের নামে লিখে দিয়েছে শুধু মাত্র তাকে নিজের করে পাবার আশায়, কিন্তু গোবিন্দলাল 'পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশ বর্ষীয়া বনিতা'কে কিছুতেই পূর্বগৌবরে গ্রহণ করতে পারেননি। নিষ্প্রেম, কঠোর, নির্মম, প্রবৃত্তি তাড়িত গোবিন্দলাল শুধুমাত্র তার প্রতি ভ্রমরের অবিশ্বাসের অজুহাতে তাকে ত্যাগ করেছে। তখন গভীর দুঃখে হতাশায়, দেবতাকে সাক্ষী রেখে সতীত্ব গৌরবে ভ্রমর অমোঘ সত্যটি উচ্চারণ করেছে —

"বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর। —কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও— একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। ... আমি যদি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমার আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে। ... যদি একথা নিস্ফল হয়, তবে জানিও— দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই— রোহিণীর নও।"

ভ্রমরের সতীত্ব গৌরব, তার প্রেমই তার অহংকার। সেই অহংকার, সেই অধিকারেই সে বলতে পেরেছে 'তুমি আমারই রোহিণীর নও।' কিন্তু গোবিন্দলালের পরিবর্তন হয়নি। কাশীগমনের অজুহাতে রোহিণীর সঙ্গে প্রসাদপুরে জীবন শুরু করেছে সে। ভ্রমরের 'ননীর পুত্তলী' সন্তান বেঁচে থাকলে গোবিন্দলাল হয়তো কখনোই তাকে পরিত্যাগ করত না। সন্তানহারা স্বামী পরিত্যক্তা ভ্রমর কঠিন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। রূপান্তর ঘটেছে তার। অসুস্থ ভ্রমর পিত্রালয়ে বাস কালে মনে মনে গোবিন্দলালের মঙ্গলকামনা করলেও প্রসাদপুরে বিশ্বাসঘাতিনী রোহিণীকে হত্যা করে যে গোবিন্দলাল পলাতক— সেই হত্যাকারীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি। ছয় বৎসর পর আশ্রয়ের জন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরকে চিঠি লিখলে ক্ষমাহীন, স্নেহহীন কাঠিন্যে ভ্রমর তাকে নিজ গৃহে ফিরে আসতে বলেছে, সম্পত্তি ভোগ করার কথাও বলেছে, কিন্তু দেখা করতে চায়নি তার সঙ্গে এবং সাক্ষাতের সম্ভাবনাও যে নেই সে কথাও জানিয়েছে। পতি-বিমুখ ভ্রমর দুর্ভাগ্যপীড়িত স্বামীর প্রতি স্নেহ মমতার কথাও বলেনি। ভ্রমর যদি 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সূর্যমুখী হতো তবে ক্ষমায় প্রেমে তার সংসার অন্যরকম হতে পারত। দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হলেও জোড়া লাগতে পারত। কিন্তু ভ্রমর সূর্যমুখীর মতো ক্ষমাশীলা নয়। গোবিন্দলালকে সে তাই নিদারুণ কাঠিন্যে আঘাত করেছে বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী দেখা যায় না। তাই যে ভ্রমর ছিল পতিনির্ভরা সাধ্বী স্ত্রী; শিষ্যা, স্বামী ছিল যার ধ্যান জ্ঞান, কামনা-বাসনা, স্বামীর বিশ্বাসেই ছিল যার বিশ্বাস -- সেই ভ্রমর গোবিন্দলালের অকরুণ নির্মমতায়, কঠিন আঘাতে স্বামীর প্রতি বিমুখ হয়ে কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠেছে। মাসিক পাঁচশো টাকা স্বামীর জন্য অনুমোদন করেছে, সে কারণ 'অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা।' নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে হাস্য চপল, বালিকা বধূ ভ্রমর। সময়ের কাঠিন্যে, নির্দয়তায় মানসিক যন্ত্রনায় ক্ষত বিক্ষত মৃত্যুপথযাত্রী ভ্রমর একেবারে শেষে শুধু দেখতে চেয়েছে গোবিন্দলালকে। একদিন সতীত্ব গর্বে, স্পর্ধা ভরে গোবিন্দলালকে যে কথা সে বলেছিল তার জীবনে তাই সত্য হয়েছে। ফিরে এসেছে গোবিন্দলাল। কিন্তু ভ্রমর আর চপলমতি বালিকা নয়, ক্ষমাহীন মমতাহীন ভ্রমর মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর পদধূলি মাথায় নিয়ে পরজন্মে সুখী হবার আশীর্বাদ চেয়েছে। পরজন্মে সে গোবিন্দলালের স্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেনি, স্বামীর মঙ্গলের জন্য কোনো প্রার্থনা উচ্চারিত হয়নি তার কণ্ঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলাল প্রসঙ্গে বলেছেন যে গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরের কাছে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করত তাহলে ভ্রমর তাকে ক্ষমা করত, কারণ—

"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী- রমণী ঈশ্বরের কীর্তির, চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক; পুরুষ ছায়া।"

কিন্তু ভ্রমরের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি সত্য হয়নি। গোবিন্দলাল যদিও সরাসরি কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি, কিন্তু ফিরে এসেছিল। কিন্তু ভ্রমর

শেষ অবধি অবিচল থেকেছে। ক্ষমা করেনি সে স্বামীকে। একমাত্র মৃত্যুই তাকে শান্তি দিয়েছে।

আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি ভ্রমর বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কন্যা। বঙ্কিমের যাবতীয় সহানুভূতি পেয়েছে ভ্রমর। সে যেন পারিবারিক জীবনের সংহতিরূপিনী শক্তি। রোহিণী তা নয়, তাই তার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। ভ্রমর জীবনে অমানুষিক দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছে, তার জীবন পরিণতিও সুখের হয়নি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সহানুভূতি পেয়েছে সে। গোবিন্দলালও ভ্রমরকে ত্যাগ করার পর অনুভব করেছে যে, সে যা হারাল তা আর ফিরে পাবে না। ভ্রমরের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হয়ে ভগবৎ পাদপদ্মে মনোনিবেশ করে ভ্রমরাধিক ভ্রমর লাভ করেছে গোবিন্দলাল।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

**ভ্রমরের চরিত্রালোচনায় সূর্যমুখী প্রসঙ্গে কিছু কথা —**

ভ্রমরের চরিত্রালোচনায় সূর্যমুখীর কথা বারে বারেই এসে পড়ে। ভ্রমরের জায়গায় সূর্যমুখী হলে তার জীবনেতিহাস অন্যরকম হতো। লক্ষণীয়, ভ্রমরের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স নয় বৎসর । সতেরো বৎসর বয়সে গোবিন্দলাল তাকে পরিত্যাগ করে। নয় বৎসরের বালিকার সাংসারিক অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। তাছাড়া গোবিন্দলালের সঙ্গে তার সে অর্থে কোনো গভীর সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। বালিকা সুলভ চাপল্যে সে গোবিন্দলালকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। তুলনায় সূর্যমুখী পরিণত, স্থির, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী এবং ব্যক্তিত্বশালিনী। সর্বোপরি স্বামীর প্রতি আস্থাশীল। স্বামীকে সুখী করতে সে কুন্দননন্দিনীর সঙ্গে তার বিয়েও দিতে চেয়েছিল। ভ্রমরের মতো বালিকার কাছ থেকে এ-জাতীয় উদারতা আশা করা যায় না। পতি প্রেমের গভীরতাই যে উপলব্ধি করে নি, সংসারের ভালো মন্দ যে বোঝে না তার পক্ষে দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। সূর্যমুখীর মতো বিচক্ষণও সে নয় তাই স্বামীর পদস্খলনের কারণ অনুধাবনও সে করতে পারেনি। বাইরের ঘটনা-রটনা তাই সহজেই ভ্রমরের মনে সংশয় জাগাতে পেরেছিল কিন্তু সূর্যমুখীর ব্যক্তিত্ব তাকে বাইরের রটনায় বিচলিত করেনি।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

ভ্রমর রূপবতী নয় কিন্তু গুণবতী। ভ্রমরের যে সকল গুণ গোবিন্দলালকে মুগ্ধ করে রেখেছিল তার পরিচয় দিন। (৩০টি শব্দ)

.....

.....

ভ্রমরের সন্তান জীবিত থাকলে গোবিন্দলাল তাকে পরিত্যাগ করত কি ? তাতে তার জীবন কতটা অন্যরকম হতে পারত? নিজের মতামত দিন। (৪০টি শব্দ)

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. ভ্রমরের অভিমান ও অবিশ্বাস গোবিন্দলাল ও রোহিণীর করুণ পরিণতির জন্য কতটা দায়ি বিচার করুন।

২. "ভ্রমর বালিকা, তার উপর জেদী প্রকৃতির হওয়ার জন্য তাঁর আচরণের মধ্যে সব সময় সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।" —সমালোচকের এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৩. ভ্রমর চরিত্রটি দুঃখ সাধনার মধ্য দিয়ে কীভাবে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণ করুন।

৪. "রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, —রমনী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া"— বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি ভ্রমরের ক্ষেত্রে কতটা সুত্রযুক্ত বলে আপনি মনে করেন আলোচনা করুন।

## ১৬.৩ চরিত্র মালা : অপ্রধান চরিত্র

এবার আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অপ্রধান চরিত্রগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব।

### ১৬.৩.১ কৃষ্ণকান্ত রায়

জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় হরিদ্রাগ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি ভ্রাতৃবৎসল, সজ্জন, বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি আফিমসেবী, স্বপ্ন বিলাসী। তাঁর স্বপ্নবিলাস সহজেই বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত'কে মনে করায়। কমলাকান্তের মতোই কৃষ্ণকান্ত আফিমের নেশায় উদ্ভট ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। কখনো তিনি প্রত্যক্ষ করেন হরলালই তার সম্পত্তি কিনে নিয়েছে, কখনো তিনি নিজেকে জাল দলিল দাখিলের অভিযোগে জেলে বন্দী হতে দেখেন। তাঁর এই স্বপ্ন দর্শনে যেমন তার রসবোধ লক্ষিত হয়, তেমনি হিসেবি, জমিদারের বিষয়রক্ষায় কূটবুদ্ধি প্রয়োগের পরিচয়ও মেলে।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের জমিদারির বার্ষিক আয় দু-লক্ষ টাকা। বিষয় সম্পত্তি তিনি এবং তার স্বর্গত ভাই রামকান্তের উপার্জিত। রামকান্তের পুত্র গোবিন্দলাল ও তার বালিকা বধূ ভ্রমরের জীবনে বাল্যবিধবা রোহিণীর ধূমকেতুর মতো অনুপ্রবেশ কীভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে— তা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের মূল কাহিনি। কিন্তু এই কাহিনি গ্রন্থিতে জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল-এর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। জমিদার বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত বিচক্ষণ, কর্তব্যপরায়ণ সর্বোপরি স্নেহশীল। তিনি উপন্যাসে চারবার উইল পরিবর্তন করেছেন। তার এই উইল পরিবর্তন একথাই প্রমাণ করে যে তিনি সমস্ত ঘটনার উপর সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। বিষয় সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারেও তিনি বিচক্ষণ ও সততার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বারবার তার উইল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া যে কীরূপ ভয়াবহ হতে পারে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। উইল পরিবর্তন যেন নিয়তির অদৃষ্টি পাকে জড়িয়ে উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে।

কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলাল বুদ্ধিমান, সংযত এবং বিষয়ানুরাগী। সেজন্য কৃষ্ণকান্ত তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তার জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল অসংযমী, স্বার্থপর, দুর্মুখ ও পিতার অবাধ্য। কর্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃষ্ণকান্ত তার প্রথমবারের উইলে সম্পত্তির অর্ধাংশ গোবিন্দলালের নামে এবং বাকি অর্ধাংশ হরলাল, বিনোদলাল, শৈলবতী এবং গৃহিণীর নামে ভাগ করে দেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তিনি প্রথম উইলে গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। গোবিন্দলালের প্রতি কতটুকু আস্থা কৃষ্ণকান্তের ছিল তার এই সিদ্ধান্তে তা বোঝা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে কখনোই বঞ্চিত করবে না। কিন্তু প্রথম উইলে বিনোদলাল ও হরলালের ভাগে তিন আনা করে বর্তালে ক্ষিপ্ত হরলাল পিতাকে তীক্ষ্ম বাক্যবাণে জর্জরিত করে। কৃষ্ণকান্ত তৎক্ষণাৎ তাঁর কর্তব্য স্থির করেন এবং পুরনো উইল ছিঁড়ে ফেলে নতুন উইল করেন। এতে হরলালের প্রাপ্তি হয় এক আনা এবং বিনোদলালের পাঁচ আনা। এতে ক্রুদ্ধ হরলাল কলকাতায় চলে যায় এবং পত্র মারফত বিধবা বিবাহের ভয় দেখায়। সে সময় সমাজে বিধবা বিবাহ আইনত সিদ্ধ হলেও অনেক রক্ষণশীল পরিবারই তা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে আহত কৃষ্ণকান্ত সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে হরলালকে ত্যাজপুত্র করবেন ঠিক করলে হরলাল বিধবা বিবাহের সংবাদ দেয়। এতে মর্মাহত কৃষ্ণকান্ত নতুন উইল করে হরলালকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি পুত্র স্নেহে অন্ধ ছিলেন না। কিন্তু হরলালের শিশুপুত্রকে তিনি বঞ্চিত করেননি। তিনি যা মনস্থ করতেন তাই করতেন। সিদ্ধান্তে অটল কৃষ্ণকান্তের দৃঢ় মনোবলও নীতি জ্ঞানের পরিচয় তার বারবার উইল তৈরিতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু স্বার্থপর, ধূর্ত হরলাল উপায়ন্তর না দেখে বাল্যবিধবা রোহিণীকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে জাল উইল প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত করে। এই জাল উইলের সূত্রেই কাহিনিতে রোহিণীর প্রবেশ এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অসামান্য রূপবতী রোহিণীকে দেখে গোবিন্দলালের সুপ্ত রূপলালসা জাগ্রত হয় এবং গোবিন্দলাল সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা বধূ ভ্রমরকে বিস্মৃত হয়ে রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঘটনা

পরম্পরায় গোবিন্দলালের অধঃপতন হতে থাকে। কিন্তু গোবিন্দলালের এই পরিবর্তন কৃষ্ণকান্তের আগোচর থাকে না। যে গোবিন্দলাল ছিল তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, যে গোবিন্দলাল ছিল তার আশা ভরসা তার এই স্খলনে বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত আন্তরিক আঘাত পান। পরিবারের মঙ্গল সাধনে তিনি গোবিন্দলালকে শাসন করতে চান কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাহেতু তা সম্ভব হয় না। কিন্তু অসুস্থ হলেও তিনি তার কর্তব্য বিস্মৃত হননি তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি চতুর্থবার তার উইল পরিবর্তন করেন এবং গোবিন্দলালের অর্ধাংশ ভ্রমরের নামে লিখে দেন। জমিদার কৃষ্ণকান্ত ভেবেছিলেন এতে গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে ফিরে আসবে ; তার ভাঙা সংসার জোড়া লাগবে। কিন্তু তিনি ধারণাও করতে পারেননি এর ফলে গোবিন্দলালের পতন আরো দ্রুত হতে পারে। আত্মভিমানী, অহংকারী, মোহাবিষ্ট গোবিন্দলাল যে স্ত্রীর সম্পত্তির ভাগীদার হতে চাইবে না তা স্বাভাবিক। তাই এই উইলের অজুহাতেই ভ্রমর ও গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়েছে, পরিণতিতে ভ্রমরের জীবন হয়েছে বিষময়। রোহিণী, ভ্রমর, গোবিন্দলাল কেউই শান্তি পায়নি। রোহিণী ও ভ্রমর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শান্তি খুঁজেছে এবং গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্ত করেছে তার ভুলের  এবং ভগবানের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে ভ্রমরাধিক ভ্রমর লাভ করেছে।

যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকান্ত তার উইল শেষবার পরিবর্তন করেছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি, বরং তার ভয়াবহ পরিণামে তিনটি জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। এখানেই কর্তব্যপরায়ণ সংসার সচেতন, স্নেহপরায়ণ কৃষ্ণকান্তের পরাজয়। তবে একথা ঠিক যে তিনি ছিলেন রায় পরিবারের মূল স্তম্ভ, তাই তাঁর মৃত্যুতে পরিবার বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। মানুষ হিসাবে তিনি খাঁটি ছিলেন। তাই সুদক্ষ জমিদার কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু দেশবাসীর কাছে ইন্দ্রপতন সমতুল্য।

### ১৬.৩.২ হরলাল

হরলাল জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কাহিনিতে জটিল আবর্ত সৃষ্টিতে হরলালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। হরলাল স্বার্থান্ধ, দুর্মুখ, কপটাচারি, পিতার অবাধ্য। কৃষ্ণকান্ত হরলালের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি কর্তব্যপরায়ন, নিষ্ঠাবান ও সৎ জমিদার। তিনি তার সম্পত্তি উইল করে সমানভাবে পুত্র-কন্যা, গৃহিণী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালের মধ্যে ভাগ করে দেন। সম্পত্তি যেহেতু কৃষ্ণকান্ত এবং তার ভাই স্বর্গত রামকান্তের উপার্জিত সেজন্য তিনি তার উইলে গোবিন্দলালকে অর্ধাংশ এবং বাকি অর্ধাংশ পুত্র-কন্যা এবং গৃহিণীর নামে ভাগ করেন। এতে হরলালের ভাগে তিন আনা বর্তায়। এই বন্টনে ক্ষিপ্ত হরলাল পিতাকে কটুক্তি করে, গালিগালাজ করতে ছাড়ে না। ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয়বার উইল করেন। তাতে হরলালের ভাগে এক আনা পড়ে। অবাধ্য হরলাল কলকাতায় গিয়ে পত্র মারফত পিতাকে বিধবা বিবাহের ভয় দেখায়। সেকালে

বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হলেও রক্ষণশীল অনেক পরিবার তা মেনে নিতে পারেনি। তাই হরলালের ধারণা ছিল এতে কৃষ্ণকান্ত হয়তো তার মত পাল্টাতে পারেন। কিন্তু অটল কৃষ্ণকান্ত তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন জানালে হরলাল বিধবা বিবাহের সংবাদ পাঠায়। কৃষ্ণকান্ত তার উপযুক্ত জবাব দেন তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। এতে ফল হয় ভয়ানক। কপট হরলাল উপায়ন্তর না দেখে বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে উইল জাল করার কুপ্রস্তাব দেয়। টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায় সে। কিন্তু দরিদ্র হলেও ব্রহ্মানন্দ অসৎ নন। তাই প্রথমে তার প্রস্তাবে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি উইল জাল করতে কুণ্ঠিত হন। তখন হরলাল কপটতার, নীচতার আশ্রয় নেয় এবং ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভাইজি অসামান্যা রূপবতী রোহিণীকে বিবাহের প্রলোভন দেখায়। অর্থলিপ্সু, আত্মকেন্দ্রিক হরলাল কৌশলে রোহিণীর দুর্বলতার সুযোগ নেয়। রোহিণীকে কোনো এক সময় সে দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সেই উপকারের ঋণ পরিশোধের দাবিতে সে রোহিণীকে উইল চুরির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রোহিণী বিশ্বাসঘাতকতা করতে সম্মত না হলে হরলাল তাকে অর্থের লোভ দেখায়। কিন্তু এতেও রোহিণী সম্মত হয় না। শেষে সুযোগ সন্ধানী হরলাল তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে। রোহিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় সে। এতে রোহিণীর মনের সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হয়। সুখী সুন্দর বিবাহিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা রোহিণীর হৃদয়ে সুপ্ত ছিল তাই সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ইচ্ছায় সে জাল উইল প্রতিস্থাপনে রাজি হয়। চতুরা রোহিণী জাল উইল রেখে আসল উইল চুরি করলেও তা কিন্তু হরলালকে দেয় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকার করে হরলাল। কার্যসিদ্ধির পর নীচ হরলাল রোহিণীকে জানায় —

"আমি যাই হই — কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

প্রবঞ্চক হরলাল আভিজাত্য গৌরবে রোহিণীকে বিবাহে অসম্মত হয় কিন্তু তার প্রবঞ্চনার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয় রোহিণী। ক্রুদ্ধা ফনিণীর মতো সে হরলালকে ধিক্কার দেয়। কর্তব্য পরায়ন, নিষ্ঠাবান জমিদার কৃষ্ণকান্তের ছেলে হয়েও সে ইতর বর্বরের মতো আচরণ করেছে। মিথ্যাচারি শঠ হরলাল কিন্তু অভিষ্ট সিদ্ধ না হওয়াতে ক্ষিপ্ত হয় না বরং আশাহতা রোহিণীর ধিক্কারের পর সে মৃদু হেসে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এর পর দীর্ঘ সময় উপন্যাসে তার দেখা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর আমরা আবার তাকে দেখি। পিতার শ্রাদ্ধাদির পর উইল পড়া হয়। কিন্তু তাতে আর কোনো পরিবর্তন করার উপায়ই নেই বুঝতে পেরে হরলাল স্বস্থানে ফিরে যান। মূল উপন্যাস কাহিনিতে হরলালের যদিও কোনো স্থান নেই কিন্তু গোবিন্দলাল ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে রোহিণীর অনুপ্রবেশ এবং শোচনীয় পরিণতির মূলে হরলালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বার্থসিদ্ধির জন্য অজ্ঞাতসারে যে বহ্নিশিখা সে জ্বালিয়েছে তা দাবানলের রূপ ধরে ভস্মীভূত করেছে সকলকে।

### ১৬.৩.৩ মাধবীনাথ

মাধবীনাথ সরকার গোবিন্দলালের বালিকা বধূ ভ্রমরের পিতা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে "... মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মত ভেদ ছিল অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করত। অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই।"

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের পরিণাম সংঘটনে ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাধবীনাথ বিচক্ষণ, চারদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তিনি অত্যন্ত চতুর। তিনি স্নেহবৎসল পিতাও। ভ্রমরের সুখের জন্য তিনি পারেন না এমন কাজ নেই। বাল্যবিধবা রোহিণীর রূপে উন্মত্ত হয়ে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পরিত্যাগ করে প্রসাদপুরে নতুন জীবন আরম্ভ করে। এর ফলে যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে ভ্রমর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাধবীনাথ বিষণ্ণবদন শীর্ণকায় কন্যার অবস্থা দেখে অত্যন্ত আঘাত পান । যন্ত্রণায় দুঃখে প্রথমে তিনি অশ্রুপাত করলেও, তাঁর যন্ত্রণা ধীরে ধীরে ক্রোধে পরিণত হয়। প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর আদরের কন্যা ভ্রমরের উপর এই অত্যাচার যে করেছে তার সমুচিত দণ্ড বিধান করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁর 'অপরাজিতা ফুল'-এর মতো কন্যার এই নিষ্করুণ অবস্থা স্নেহ বৎসল পিতা সহ্য করবেন কী করে! মাধবীনাথও সহ্য করেননি। তিনি তখন মনে মনে সংকল্প করেন "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্বনাশ করিয়াছে — আমি তাহার এমনই সর্বনাশ করিব।"

অসুস্থ কন্যাকে রাজগ্রামে নিয়ে এসে তিনি তার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু বুকের ভেতর যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে তা নেভাতেই শুরু হয় তাঁর গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অনুসন্ধান। সুচতুর মাধবীনাথ অনুমান করেন যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষ অবশ্যই রোহিণীর সংবাদ জেনে থাকবেন। সরাসরি না হলেও চিঠি পত্রে নিশ্চই যোগাযোগ আছে। দরিদ্র ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয়ই অর্থ সাহায্যও পেয়ে থাকেন রোহিণীর কাছ থেকে । তাই মুহূর্তেই মাধবীনাথ তার কর্তব্য স্থির করেন এবং হরিদ্রাগ্রামের পোস্ট-অফিসে উপস্থিত হন। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মাধবীনাথ কাজ হাসিলের জন্য অর্থের লোভ দেখান পোস্টমাস্টার ও পিওনকে। তাতেও কাজ না হলে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ভয় দেখান। ব্রহ্মানন্দের যাবতীয় চিঠি-পত্র টাকা-পয়সা যে যশোহরের প্রসাদপুর থেকে আসে তা সহজেই জানতে পারেন তিনি। যে কৌশলে তিনি সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তাতে তার চাতুর্য, বুদ্ধিমত্তা, কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় মেলে। এরপর মাধবীনাথের লক্ষ্য হয় অসহায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ। সহজ সরল বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দকে সহজেই চোরাই নোট রাখার ভয় দেখিয়ে রোহিণী গোবিন্দলালের খবর বের করে নেন তিনি।

এরপরই মাধবীনাথ নিশাকরের মাধ্যমে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সংবাদ গ্রহণের সংকল্প করেন। গোবিন্দলালের কাছে ভ্রমরের সম্পত্তির পত্তনির প্রসঙ্গে

নিশাকর প্রসাদপুরে তাদের গৃহে উপস্থিত হয়। মাধবীনাথ কল্পনাও করেননি নিশাকরের অনুপ্রবেশে গোবিন্দলাল-রোহিণীর পরিণতি এত ভয়াবহ হবে। প্রসাদপুরে রোহিণীর সঙ্গে যে সুন্দর জীবনের আশায় গোবিন্দলাল এসেছিল তার সে ভুল সহজেই ভেঙে গিয়েছিল। সে অনুভব করেছে যে রোহিণীর প্রতি তার আকর্ষণ শুধুই রূপতৃষ্ণা। তার অন্তর ভ্রমরময়, রোহিণীর সেখানে স্থান নেই। তাই নিশাকরের মুখে ভ্রমরের নাম শুনে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত গোবিন্দলাল একেবারে ভেঙে পড়ে। ক্ষণিকের দেখায় রূপবান নিশাকরের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ ও নির্জন নদী তীরে সাক্ষাৎ গোবিন্দলালকে হিতাহিত জ্ঞানে শূন্য করে। এরই ফলস্বরূপে তার পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু হয়। মাধবীনাথ এই পরিণতি চাননি। কিন্তু মাধবীনাথ এ-ঘটনার পর কিংকর্তব্য বিমূঢ় হলেও কর্তব্য জ্ঞানে ব্যাহত হননি।

রোহিণী হত্যার ছয় বৎসর পর গোবিন্দলাল ধরা পড়লে মাধবীনাথের কৌশলে, চাতুর্য-বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে কোর্টে। ভ্রমরকে তিনি কথা দিয়েছিলেন গোবিন্দলালকে রক্ষা করবেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতি মতোই সাক্ষীদের অর্থদ্বারা বশীভূত করেন। ফলে বিচারে গোবিন্দলাল নির্দোষ প্রমাণিত হন।

মাধবীনাথের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পিছনে সক্রিয় ছিল তার কন্যার প্রতি স্নেহ কিন্তু স্নেহান্ধ মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে রক্ষা করলেও, শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি তার সঙ্গে কথাও বলেননি। কর্তব্যপরায়ণ মাধবীনাথ বারুণী পুষ্করিণী তীরে মূর্ছিত, অসুস্থ গোবিন্দলালকে দেখে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেও পরস্ত্রী হত্যাকারী, ভ্রমরের জীবন-ধ্বংসকারী গোবিন্দলালকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। ক্ষমা করেনি ভ্রমরও। তাই পরজন্মে ভ্রমর শুধুই সুখী হতে চেয়েছে। যে সুখ সে ইহজন্মে পায়নি, শুধু সেইটুকু আশীর্বাদ চেয়ে ভ্রমর চির বিদায় নিয়েছে।

মাধবীনাথ চেয়েছিলেন ভ্রমর ও গোবিন্দলালের পুনর্মিলন ঘটাতে। হয়তো ভ্রমর বেঁচে থাকলে তা সম্ভব হতো, কিন্তু ভ্রমরের ক্ষমাহীন কাঠিন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। সুতরাং তার কৌশল, চাতুর্য গোবিন্দলালকে সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত করলেও ভ্রমরকে তিনি বেঁধে রাখতে পারেননি। এখানেই তার পরাজয়।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

কৃষ্ণকান্ত রোহিণীর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে দেশের বাইরে বার করে দিতে চেয়েছিলেন কেন? (৩০টি শব্দ)

.....

.....

.....

হরলাল রোহিণীকে কীসের প্রলোভন দেখিয়ে চুরি করতে রাজি করিয়েছিল? (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

হরলাল কৃষ্ণকান্তকে বিধবা বিবাহের ভয় দেখিয়েছিল কেন? (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

মাধবীনাথ হরিদ্রাগ্রামের পোস্টমাস্টার ও পিওনের কাছে কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন? (৩০টি শব্দ)

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. কৃষ্ণকান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কাহিনিতে জটিলতা সৃষ্টিতে হরলালের ভূমিকা কতটুকু বিচার করুন।

৩. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের পরিণাম সংঘটনে মাধবীনাথের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. মাধবীনাথের অপত্য স্নেহই রোহিণীর পরিণতির মূল। —বিচার করুন।

## ১৬.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

গোবিন্দলাল ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে বালবিধবা রোহিণীর প্রবেশ কীভাবে তাদের জীবন ধ্বংস করেছে তা 'কৃষ্ণকান্ত উইল' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। সেজন্য প্রথমে আমরা রোহিণী চরিত্র আলোচনা করেছি।

রোহিণীর চরিত্র আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি রোহিণীর জীবন তৃষ্ণা কীভাবে ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় এনেছে। প্রসঙ্গত আমরা উপন্যাসের প্রথম খণ্ড

ও দ্বিতীয় খণ্ডের রোহিণীর চরিত্রগত পার্থক্যের বিষয়েও আলোচনা করেছি। রোহিণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডে লালসায় পরিণত হয় -- এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচকের মতামত উল্লেখ করে আমরা রোহিণীর চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। গোবিন্দলালের চরিত্রালোচনায় আমরা সুপ্ত রূপতৃষ্ণা কেমন করে তার মনকে পরিবর্তন করেছে তা বিশ্লেষণ করেছি এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। ভ্রমরের বালিকা সুলভ চাপল্য, অবিশ্বাস, অভিমান তার দাম্পত্য জীবনকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। ভ্রমরের চরিত্র আলোচনায় আমরা তার চরিত্রের সার্বিক দিক ধরার চেষ্টা করেছি।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কৃষ্ণকান্ত, মাধবীনাথ, হরলাল প্রমুখেরা অপ্রধান চরিত্র হলেও উপন্যাস কাহিনিতে তাদের প্রভাব অপরিসীম। জমিদার কৃষ্ণকান্তের বারবার উইল পরিবর্তন কাহিনিতে জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণকান্তের অবাধ্য স্বার্থপর পুত্র হরলাল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় উইল জাল করতে চেয়েছে। সেই সূত্র ধরেই কাহিনিতে রোহিণীর প্রবেশ। ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ উপন্যাসের পরিণতি সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নিশাকরকে প্রসাদপুরে পাঠিয়েছেন তিনি। ফলস্বরূপে রোহিণীর ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি এবং শেষে গোবিন্দলালের গুলিতে মৃত্যু। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির আলোচনায় আমরা এই দিকগুলোই দেখানোর চেষ্টা করেছি।

## ১৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

## ১৬.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

সপ্তদশ বিভাগের শেষে সংযোজিত হয়েছে।

* * *

বিভাগ - ১৭

# কৃষ্ণকান্তের উইল

# 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শিল্পরীতি

**বিষয়বিন্যাস**


১৭.১ ভূমিকা (Introduction)

১৭.০ উদ্দেশ্য (Objectives)

১৭.২ শিল্পরীতির বিচার

১৭.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

১৭.৪ উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

১৭.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১৭.৫.১ সংক্ষীপ্ত উত্তর দিন/টীকা লিখুন

১৭.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


## ১৭.০ ভূমিকা (Introduction)

'কৃষ্ণকান্তের উইল' আপাতদৃষ্টিতে একটি সরল প্রেমের কাহিনি মনে হলেও আখ্যান গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা তথা শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসে বর্ণনা বাহুল্য নেই। এ ব্যাপারে বঙ্কিম আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় এই উপন্যাসে বঙ্কিমের ভাষা প্রাঞ্জল ও ঋজু। কিন্তু যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মনোলোককে ফুটিয়ে তুলতে পারে, এই উপন্যাসে সেটা নেই। তবে বঙ্কিমের লেখার বড় গুণ যে স্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি ও অনুভূতির গভীরতা তার স্বাদ উপন্যাসের ভাষায় পাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি শিল্পোত্তীর্ণ সৃষ্টি।

## ১৭.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই বিভাগে আপনারা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের শিল্পরীতির বিষয়ে বিশদভাবে জানবেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচেতন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এর বাখ্যান গঠনও খুব সহজ-সরল নয়। সেজন্য আমরা প্রথমে উপন্যাসের আখ্যান গঠনের বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর আমরা উপন্যাসটির ভাষা, সংলাপ, পদপ্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করব। এই বিভাগে উপন্যাসের শিল্পরীতির বিষয়ে আপনাদের নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

আপনাদের সাহায্যার্থে, বিভাগের শেষের দিকে আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকদের নির্বাচিত উদ্ধৃতি সংকলিত করেছি।

## ১৭.২ শিল্পরীতির বিচার

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। বঙ্কিম যখন তাঁর দ্বিতীয় যুগের উপন্যাসগুলি ('চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ') লিখছেন, তখন তিনি আগের তুলনায় অধিক শিল্প সচেতন হয়ে উঠেছেন। দেখা গেছে, তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাসে নিয়তির অলঙ্ঘ্য পরিণতি সম্পর্কে যে বিশ্বাস ছিল, দ্বিতীয় যুগের উপন্যাস রচনার সময় তা অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই যুগে মানুষের শক্তিতে ক্রমে আস্থাবান হয়ে উঠেছেন বঙ্কিম। এই সময় নিয়তি নয়, নীতি ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছে। এটা শুধু মতের পরিবর্তন নয়, মতের পরিবর্তনের সঙ্গে রচনারীতিতেও পরিবর্তন হয়েছে। এই বিভাগে আমরা আমাদের পাঠ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রচনারীতির বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে আখ্যান গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে জটিল আখ্যায়িকার পক্ষপাতী ছিলেন, পরে সরল অমিশ্র কাহিনির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। দেখা যায়, তাঁর প্রথম যুগের সবক'টি উপন্যাস এবং দ্বিতীয় যুগের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছাড়া অন্য সব উপন্যাস বেশ জটিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আপাতদৃষ্টিতে সরল একমুখী একটি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি বলে মনে হলেও, আখ্যান গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র এমন এক চাতুর্য প্রদর্শন করেছেন যা তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে দেখা যায় না। গোবিন্দলাল-রোহিণী-ভ্রমরের প্রেম-অপ্রেম, আকর্ষণ-বিকর্ষণের গল্পই উপন্যাসটির মূল উপজীব্য কিন্তু সে কাহিনির মূল ঘটনার নিয়ন্ত্রকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়কে কাজে লাগিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের তেরটি পরিচ্ছেদ জুড়ে বারবার উইল পরিবর্তন এবং তার নানা প্রতিক্রিয়ার ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। এই উইল রচনার মধ্যে যেমন কাহিনির নাটকীয়তা দানা বেঁধেছে তেমনি প্রধান চরিত্রগুলিও একটু একটু করে নিজেদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং প্রত্যেকবারের পরিবর্তন কাহিনির মধ্যে কেবল নানা জটিলতাই এনেছে তা নয়, চরিত্রগুলির মানসলোকের গোপনতম প্রদেশে আলোকপাত করেছে। তাঁদের সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করেছে। প্রথম উইলে কৃষ্ণকান্ত ভ্রাতৃপুত্র গোবিন্দলালকে দিয়েছিলেন ৮ আনা এবং নিজের পুত্র হরলালকে দিয়েছিলেন ৩ আনা। দুশ্চরিত্র হরলাল পিতার সঙ্গে দুর্ব্যহার করলে কৃষ্ণকান্ত তৎক্ষণাৎ উইলটি ছিঁড়ে ফেলে নতুন উইল করে হরলালকে দিলেন মাত্র ১ আনা। এতে ক্রোধিত হরলাল কলকাতায় গিয়ে পিতাকে বিধবাবিবাহের ভয় দেখালে কৃষ্ণকান্ত পুনঃরায় উইল করে হরলালকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। ধূর্ত হরলাল তখন উইল জাল করার মনস্থ করে। এই সূত্রেই হরলালের মাধ্যমে কাহিনিতে রোহিণীর প্রবেশ। তারপর রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের পরিচয় এবং ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য জীবনে জটিলাবর্ত

সৃষ্টি। গোবিন্দলালের চারিত্রিক স্খলনে বেদনাহত কৃষ্ণকান্ত মৃত্যুর আগ মুহূর্তে চতুর্থ এবং শেষবারের মতো উইল পরিবর্তন করেন, যেখানে গোবিন্দলালের অংশটুকু তিনি ভ্রমরকে দান করেন। এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হয়। কৃষ্ণকান্ত রায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে উইল পরিবর্তন করেছিলেন তা সাধিত হয় না, উপরন্তু পরোক্ষভাবে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং ভ্রমরের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের পুনর্মিলনের যে সামান্য সম্ভবনাটুকু ছিল তাও এই শেষ উইলটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এ-উপন্যাসের প্লট-পরিকল্পনায় উইল-বিভ্রাট একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল এবং সেই কৌশল গ্রহণ বঙ্কিমের শিল্প কুশলতাকেই প্রমাণ করে। উপন্যাস-কাহিনিকে পেছনে থেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কৃষ্ণকান্তের উইল। যেজন্য উপন্যাসের নামও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। তাই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে।

বঙ্কিমের প্রধান শিল্পসৃষ্টি গুলিতে নাট্যরস প্রচুর ভাবে বিদ্যমান। এই নাট্যরস প্রবণতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের খণ্ড পরিকল্পনা, পরিচ্ছেদ বিভাগ, ঘটনা, গতি সমস্তই নাট্যানুগ পরিকল্পনায় বিধৃত। গল্পের ভিতরে রহস্য উৎকণ্ঠা সৃষ্টি, সংঘাত-সংঘর্ষের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের পরিবেশ রচনা ও তারই অবিনার্য ফলশ্রুতিরূপে চরমসংকট মুহূর্ত বা ক্ল্যাইম্যাক্স ও পরে চূড়ান্ত পরিণতি সৃষ্টি করা— এধরনের নাটকীয় রীতি ও রূপ বঙ্কিম-উপন্যাসে লভ্য। সাধারণ মানুষের চরিত্রের মধ্যে অদৃষ্টের বীজ নিহিত যাকে। কখন, কীভাবে বাইরের ঘটনার সংস্পর্শে সেই বীজ ধীরে ধীরে বিশালকার বৃক্ষে পরিণত হয়, ঘটনা-সংস্থানের ন্যায়-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বঙ্কিম সে কথাটি স্পষ্ট করে তুলতে চান। সেজন্যই বঙ্কিমের কাছে ঘটনা-সংস্থানের একটা নিজস্ব অর্থ আছে। গঠন-রীতির এই নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বঙ্কিমের প্রায় সব উপন্যাসেই লক্ষ করা যায়। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস এর উজ্জ্বলতম নিদর্শন। কিন্তু এখানেই উপন্যাসের পরিণতি তথা রোহিণী চরিত্রের পরিণতি সংক্রান্ত বিতর্কিত প্রসঙ্গটি এসে যায়। ঘটনা-সংস্থানের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা উপন্যাসের শেষের দিকে এসে খানিকটা বিপর্যস্ত হয়নি কি? আমাদের সিদ্ধান্ত, হয়েছে। রোহিণী-হত্যার দ্বারা একটি জটিল সমস্যার সহজ সমাধানের পথ সৃষ্টি করতে গিয়েই বঙ্কিম তা করছেন। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে মানসিকভাবে প্রস্তুত না করেই অকস্মাৎ গোবিন্দলালের গুলিতে যেভাবে রোহিণীর মৃত্যু দেখালেন তাতে শিল্পগত ত্রুটি হয়েছে। অনেক বিদগ্ধ সমালোচক অবশ্য এইমতকে সমর্থন করেন না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উপন্যাসের চরিত্রের যে বিকাশ-বিবর্তন ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট, তাকে প্রত্যক্ষ সজীবতা দান করতে 'মিলিউ'-এর অর্থাৎ পরিবেশ বর্ণনার উপর কিছুটা নির্ভর করতেই হয়— কেবল সংলাপের সাহায্যে সেই প্রত্যক্ষতা ফুটিয়ে তোলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বর্ণিত ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও নৈসর্গিক পটভূমি ছাড়াও 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো উপন্যাসে দেখতে পাই সমাজ-পরিবারের পট-চিত্রের সুস্পষ্ট রেখা-বিন্যাস। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঘটনাবহুল উপন্যাসে 'অবজেক্‌টিভ' বর্ণনাত্মক

পরিবেশের গুরুত্ব যতখানি, 'আত্মনিষ্ঠ' অর্থাৎ হৃদয়ানুভূতির বা মনোলোকের দর্পণরূপ পরিবেশের গুরুত্ব তেমন নয়। আসলে পরিবেশ বর্ণনাকালে বঙ্কিমের আড়ষ্টতা কিছু বরাবরই থেকে গেছে, যদিও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তা আমাদের পিড়ীত করে না। নায়ক-নায়িকার বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত বর্ণনায় বঙ্কিম এই উপন্যাসে আসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। উপন্যাসের শেষের দিকে প্রসাদপুরের কুঠির পরিবেশ বর্ণনায় দুই ভোগাক্লান্ত নর-নারীর শূন্যজীবনকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চিঠিপত্রাদির ব্যবহারের বাহুল্য কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'রজনী', 'আনন্দমঠ', ও 'দেবী চৌধুরানী' ছাড়া তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসেই চিঠিপত্রের ব্যবহার আছে। এটা বঙ্কিমের আঙ্গিক-সচেতনতাকেই প্রমাণ করে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অনেক পত্রাদির ব্যবহার আছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রধান চরিত্রেরা তো বটেই অপ্রধান চরিত্রেরাও অনেক চিঠিপত্র লিখেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কোনো পত্রের ব্যবহারই কিন্তু অনাবশ্যক নয়। প্রত্যেকটি চিঠিই উপন্যাসের ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উপন্যাসে 'দৃষ্টিকোণ' (Point of View) -এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে বিবৃত কাহিনির সঙ্গে তার কথকের সম্পর্কের বিষয়টি নিছক আঙ্গিকগত ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঔপন্যাসিকের জীবনসংক্রান্ত মূল্য-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতর প্রশ্নটিও। বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রযুক্ত দৃষ্টিকোণ প্রধানত ('ইন্দিরা' ও 'রজনী' বাদে) 'সর্বজ্ঞ লেখক'-এর, কতকটা নিরপেক্ষ 'অবজেকটিভ' তথা নাট্যধর্মী। সব ঘটনা ও চরিত্রকেই বেশ একটা দূরত্বের ভাব বজায় রেখে অনেকখানি ওপর থেকে দেখা হয়েছে যেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের নাকগলানো মন্তব্য বা ব্যাখ্যা। পাঠককে সম্বোধন করে আলাপচারিতাও যথেষ্ট হয়। এসবের ফলে উপন্যাসের মধ্যে গড়ে ওঠা জগৎ ও জীবনের ইলিউশন যে অনেকখানি নষ্ট হয়, তাতে সন্দেহ নেই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও তা-ই হয়েছে। 'দৃষ্টিকোণে'র শিল্পিত প্রয়োগ বঙ্কিম-উপন্যাসে দেখাই যায় না বললে অত্যুক্তি হয় না।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বর্ণনা বাহুল্য নেই। এ-ব্যাপারে বঙ্কিম আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তবে বঙ্কিমের রহস্যময় সাংকেতিকতার দিকে যে প্রবণতা, তা এই উপন্যাসেও দু-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। গোবিন্দলাল যে মুহূর্তে রোহিণীর অধরে অধর স্থাপন করে ফুৎকার দিল, ভ্রমর ঠিক সেই মুহূর্তে বিড়ালকে লাঠি দিয়ে মারতে গিয়ে নিজের কপালে লাঠির আঘাত করে বসল। সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনারীতিতে একদিকে বাইরের স্থান ও পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় কৌতুকপূর্ণ মানবিক রসে ভরে ওঠে, আবার অন্যদিকে তিনি বিশ্লেষণধর্মী মন নিয়ে যে বর্ণনা করেন তা আখ্যায়িকা বা চরিত্রসমূহের মর্ম প্রকাশে সহায়ক। প্রথমটিতে পাওয়া যায় কল্পনা-প্রবণ মনের ক্রীড়াশীলতা ও অন্যটিতে পাওয়া যায় দার্শনিক-মনের বিচার-নিপুণ সংযমী মনোভাব। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' যদিও বর্ণনাবাহুল্য নেই, তবে যেখানেই বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন, পাঠকচিত্ত সেই বর্ণনার সূত্র ধরে কাহিনির

অন্তর্জগতে প্রবেশের আমন্ত্রণ পেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে বারুণী পুষ্করিণী বিশাল বড় ভূমিকা আছে। বঙ্কিম যেজন্য বারুণী পুষ্করিণী ও তার পুষ্পোদ্যানের বিশদ বর্ণনাই দিয়েছেন। রোহিণী ও ভ্রমরের রূপবর্ণনাতেও বঙ্কিম অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমের বর্ণনাতে রোহিণী ও ভ্রমরের বাহ্যিক রূপটাই শুধু ফুটে ওঠেনি, তাদের মনোজগতটিই পাঠকের সামনে ফুটে উঠেছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের বর্ণনারীতি-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন —

"উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও উচ্ছ্বসিত কল্পনা-লীলা প্রথম খণ্ডের সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে ভ্রমর-গোবিন্দলালের পরস্পরের প্রতি পরিবর্তিত ব্যবহারের বর্ণনায় একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। অতি অল্পস্থানের মধ্যে এরূপ গভীর ভাবপ্রকাশ, বিশ্লেষণ ও কবিত্ব শক্তির এরূপ অসাধারণ সম্মিলন আর কোন উপন্যাসে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

এতক্ষণ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র শিল্পরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আখ্যান গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের পৌনঃপুনিক উইল পরিবর্তনের ঘটনাকে একটা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই উইল পরিবর্তনই উপন্যাসের কাহিনিতে জটিলাবর্ত সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র আর যা-ই হোন, তিনি শিল্পী। কিন্তু গঠন-রীতির যে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা বঙ্কিম-উপন্যাসে দেখা যায়, আলোচ্য উপন্যাসের শেষের দিকে, রোহিণীর মৃত্যু-সংঘটনের আকস্মিকতায় তা ব্যাহত হয়েছে। ড° সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ক্ষেত্রগুপ্ত প্রমুখ সমালোচকেরা অবশ্য এ-সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। উপন্যাসে পরিবেশ রচনার প্রতি বঙ্কিম কোনো কালেই মনোযোগী ছিলেন না। তবে আলোচ্য উপন্যাসে, বর্ণনা রীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিম প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছেন।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

উপন্যাসের আখ্যান-গঠন বিষয়ে বঙ্কিমের প্রথম যুগের উপন্যাসের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের উপন্যাসের পার্থক্য কী? (৪০টি শব্দ)

.....

.....

.....

কৃষ্ণকান্ত রায় অনেকবার উইল করেছেন। প্রতিটি উইলে কৃষ্ণকান্তের পরিবারের সদস্যদের কার কতটা অংশ ছিল। (৫০টি শব্দ)

.....

.....

.....

রোহিণী ও ভ্রমরের রূপবর্ণনাতে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা বিচার করুন। (৬০টি শব্দ)

.....

.....

.....

উপন্যাসে পরিবেশ বর্ণনায় বঙ্কিম কতটা দক্ষ ছিলেন? আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (৪০টি শব্দ)

.....

.....

.....

এবার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি নিয়ে আলোচনা করব। উপন্যাসের নির্মাণ-শিল্পের মূল আশ্রয় তার ভাষা। উপন্যাসের প্রকরণগত যে বিভিন্ন উপাদান— কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি— সবকিছুরই মূল ভিত্তি এই ভাষা। বলা বাহুল্য যে, ভাষা উপন্যাসের ভাব প্রকাশের নিছক এক যান্ত্রিক বাহনমাত্র নয়, কেবল জীবনের বহিরঙ্গ অবয়বকে গড়ে তোলার শিল্পসৌন্দর্যহীন উপায় মাত্র নয়, এর অতিরিক্ত আরো গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ এক মাত্রা যোজনা করে উপন্যাসের ভাষা। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ভাষাবিন্যাসের একটি সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা গদ্যে সাহিত্যিক যুক্তি এনেছিলেন। প্রবন্ধের গদ্যভাষা যুক্তি-তথ্য নির্ভর মননধর্মী ভাষা। এ গদ্য উপন্যাসের আদর্শভাষা হতে পারে না বুঝেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।" উপন্যাস-শিল্পী বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষারীতিতে তাই দেখা যায় কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ, যেমন, সংক্ষিপ্ত সরল বাক্য, প্রশ্নসূচক বাক্যের প্রাচুর্য, পাঠককে সম্বোধনসূচক মধ্যম পুরুষের ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের প্রয়াস, ভাষায় নাট্যোপযোগী চমক ও আকস্মিকতার প্রয়োগ ইত্যাদি। বঙ্কিমের সব উপন্যাসের ভাষাতেই এই লক্ষণগুলি বিদ্যমান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রোমান্সধর্মী কাহিনি ও পরিবেশ-বিন্যাসের উপযোগী ভাষা সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে অনবদ্য, কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মতো

উপন্যাসে, যেখানে পারিবারিক জীবনের বিন্যাস আছে, সেখানে বাস্তবধর্মী বিন্যাসে বঙ্কিমের ভাষা অসার্থক না হলেও ভাষার যেই শক্তির পরিচয় যেন লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের পাঠ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে ব্যক্তির মনোলোকের গূঢ় বিশ্লেষণ-ধর্মী বাস্তবতার যে ছবি পাঠকের প্রত্যাশিত, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবরণধর্মী ভাষায় সে ছবি যেন ঠিক ফুটে ওঠেনি। যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা এই ধরনের উন্মোচনের যোগ্যবাহন, তা দু-একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদে, আলোচ্য উপন্যাসে প্রযুক্ত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাষায় সহজতা আনার কথা বলেছিলেন। ভাষার রীতি-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেছিলেন বা ভেবেছিলেন, তাঁর রচনার মধ্যে তিনি কিন্তু তা মেনে চলতে পারেননি। বঙ্কিমের ভাষার সংস্কৃত সম্পৃক্তি তাঁর ভাষাকে সহজ না করে অনেক সময়ই দুরূহ করে তুলেছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের উপন্যাসের ভাষা ক্রমেই দুরূহ তৎসম-কণ্টকিত সমাসবদ্ধ ও অলঙ্কার বহুল প্রয়োগ যথাসম্ভব বর্জন করে সহজ প্রত্যক্ষ ও ঋজু হয়ে উঠতে চেয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' পর্বের পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে সত্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে বঙ্কিমের ভাষা পূর্বের তুলনায় কতকটা প্রাঞ্জল ও ঋজু হয়ে উঠেছে।

**লক্ষণীয় প্রসঙ্গ**

ভাষার Style সম্পর্কে বঙ্কিমের এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

"প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা।

একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম থাকিতে পারে, ... ইহার মধ্যে কোন নামটি ব্যবহার করিব ? যেটি

সবাই জানে, ... অনর্থক কতকগুলো সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিও না— অনেকে বুঝিতে পারে না।" বঙ্কিমের এই চিন্তা তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কি? বিচার করুন।

তবু বঙ্কিমের ভাষাতে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগের কথাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। তৎসম শব্দে গঠিত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার তাঁর গদ্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অনেকক্ষেত্রেই সন্ধিবদ্ধ শব্দে সেই সমাসবদ্ধ পদ সৃষ্টি হয়ে শব্দটি জটিলও (complex) হয়ে উঠেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' 'পক্কবিম্ববিনিন্দিত', 'মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য' ইত্যাকার পদের প্রচুর প্রয়োগ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মধ্যম এবং উত্তমপুরুষে বক্তব্য উপস্থাপিত করার ভঙ্গি, লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষণ পদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র একটা অংশ দেখা যাক :

"তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদগণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, [আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন।] সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে,...। আজি এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।"

এখানে মধ্যম পুরুষের প্রয়োগে লেখক পাঠকের নিকটতর সম্পর্কে এসেছেন। এই পদ্ধতিতে বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের এবং পাঠকের সঙ্গে লেখকের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। বঙ্কিম এই পদ্ধতির অপরাজেয় শিল্পী। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে উত্তম পুরুষের প্রয়োগও হয়েছে দু-একটি স্থানে। এই উপন্যাসে লিঙ্গ-অনুযায়ী বিশেষণ পদের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। যেমন— 'অনন্তপ্রভাবশালিনী', 'প্রভাতশুক্রতারারূপিণী', 'রূপতরঙ্গিনী'।

সমালোচকেরা বরাবর বঙ্কিমী-গদ্যকে সাধুকরে দেখানোর প্রয়াস করেছেন। অথচ সাধু গদ্যের পথে বঙ্কিমের দ্বিধা তাঁর প্রথম উপন্যাসেই দেখতে পাই। বঙ্কিম যখন পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন, তখন সেখানে চলিত ও মৌখিক বাক্‌ভঙ্গির প্রাধান্য ক্রমে বেড়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মধ্যবিত্ত জীবনচিত্রণে চলিত শব্দ বেশি প্রাধান্য পাবে, এমন হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রিয়া বা সর্বনাম, তৎসম শব্দমিশ্রণে তৈরি সাধুগদ্য চলিতের সুরকে মুছে ফেলতে পারেনি। প্রথমে চলিত শব্দ, শব্দাংশ, বাক্যাংশ লক্ষ করা যাক —

গোওয়ালা-ফোওয়ালা, গালিপাড়া, বাতাসখাওয়া, ঠমক, হাঁড়িফাটা, বদ্‌জাত, আবাগী, ভিজেবেড়াল, হাতধোওয়া, ঝিমান, টাকা হজম করা, বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, উছলে পড়া, দালে কাটি দেওয়া, কালামুখো ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে এইসব শব্দেরা বাক্যে অনর্থ ঘটিয়েছে—

"রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গ ক্ষুব্দ কৃষ্ণচড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল — বলিতে লাগিল, 'এই কেশ— আপনি কাঁচি আনিতে বলুন।"

এখানে একটি চলিত শব্দে (কাঁচি) রোহিণীর চুলের জন্য সংস্কৃত উপমালোক থেকে নির্বাচিত উপমার গাম্ভীর্য নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কখনো বর্ণনায় আছে— গোবিন্দলাল ভেবেছে "রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে"। গোবিন্দলালের এই ভাবনা সাধু গদ্যরীতি আশ্রয়ী, কিন্তু তার আদেশ আবার চলিত ঘেঁষা : "তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি।" পরের বাক্যেও 'ফুঁ' শব্দটি ব্যবহৃত। সংলাপে চলিত, বর্ণনায় সাধু, আবার বর্ণনায় চলিত — এই ক্রমের মধ্যে বঙ্কিমের লেখন ভঙ্গিতে একটা দ্বিধা লক্ষ করি। আবার দুছত্র পরে 'ফুৎকারে'র দুবার প্রয়োগ বঙ্কিমের দ্বিধাকে নিশ্চিত করে। বঙ্কিম-গদ্যের এই দোটানা তাঁর সব উপন্যাসেই বিদ্যমান—

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার একটি বড় গুণ তাঁর লেখায় স্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি, অনুভূতির গভীরতা। তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে ছায়া ফেলে যায় কবি ও দার্শনিকের কল্পনা

ও প্রত্যয়। ফলে তাতে ছড়িয়ে থাকে রসের হাসি, চিন্তার আলো। এই আলোর ছটায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভাষা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এছাড়া, এই উপন্যাসে নাট্যধর্মী সংলাপ রচনাতেও বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

**আত্মসমীক্ষামূলক প্রশ্ন**

বঙ্কিম-উপন্যাসের ভাষার সাধারণ লক্ষণগুলি কী কী? (৪০টি শব্দ)

.....

.....

.....

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বাস্তবধর্মী ভাষা-প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র কি পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন? (৪০টি শব্দ)

.....

.....

.....

উপন্যাসের প্রকরণগত বিভিন্ন উপাদান কী কী? (২০টি শব্দ)

.....

.....

.....

**নিজের ক্রমোন্নতি বিচার করুন**

১. কৃষ্ণকান্ত রায়ের পৌনঃপুনিক উইল পরিবর্তনকে বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যান-গঠনে একটা কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই কৌশল শিল্পগত বিচারে সার্থক হয়েছে কি?

২. 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' অনেক চিঠি-পত্রের ব্যবহার আছে। উপন্যাসে চিঠি-পত্রের ব্যবহার বঙ্কিমচন্দ্রের কোন শিল্পগত অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে?

৩. "কৃষ্ণকান্তের উইলে বর্ণনা বাহুল্য নেই। ... বঙ্কিমচন্দ্রের রহস্যময় সাংকেতিকতার দিকে যে প্রবণতা তাহা এই কঠোর বাস্তব উপন্যাসেও দুই-একটি ক্ষুদ্র ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সমালোচকের মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ করুন।

৪. মধ্যম পুরুষ এবং উত্তম পুরুষে বক্তব্য উপস্থাপিত করার ভঙ্গি বঙ্কিমী গদ্যের

অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এই বিশিষ্ট রচনারীতির শিল্পগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৫. আপনার মতে বঙ্কিমীগদ্যের সবচেয়ে বড় গুণ কী? উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

[সংকেতসূত্র : উপরোক্ত আলোচনা মনোযোগ সহকারে পড়ুন]

## ১৭.৩ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের শিল্পরীতির বিচার করেছি। উপন্যাসের প্রকরণগত বিভিন্ন উপাদান, যথা কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র বিন্যাস, পরিবেশ বর্ণনা, ভাষা বিন্যাস— ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাফল্য-ব্যর্থতা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসকে কেন্দ্রে রেখে বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। উপন্যাসের নির্মাণ শিল্পের মূল আশ্রয় যেহেতু ভাষা, সেজন্য আমরা বঙ্কিম-উপন্যাসের ভাষারীতির সাধারণ লক্ষণ এবং আলোচ্য উপন্যাসে বঙ্কিমের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই আলোচনার দ্বারা আমরা আপনাদের সামনে এই সত্যটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যথার্থ শিল্পী এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম শিল্পী। আমরা মনে করি মূল উপন্যাসটি পাঠ করে তার সঙ্গে উপরোক্ত আলোচনাটি মিলিয়ে পড়লে বিষয়টি অনুধাবন করতে আপনাদের সুবিধা হবে।

## ১৭.৪ উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

১. "সে যুগে ধনাঢ্য ভূস্বামীরা রক্ষিতার সংখ্যা ও সম্পদ নিয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। কিন্তু গোবিন্দলাল প্রতিক্ষণ বিদ্ধ হয়েছে পাপবোধে, গভীর যন্ত্রণায়। নারী সম্পর্কে পুরুষের সব স্বাধীনতাই যেখানে সমাজ স্বীকৃত সে ক্ষেত্রে গোবিন্দলালের নীতি-দংশনের উৎসে কাজ করেছে নবকালের প্রেমবোধ— সেখানে পুরুষ ও নারীর সমানস্বাধীনতা, সমান দায়িত্ব।"

*—ক্ষেত্র গুপ্ত*

২. "বঙ্কিমের মননের সঙ্গে যে যৌক্তিক বোধের যোগ নিবিড় সেই কার্যকারণ পরম্পরাবোধ, এই উপন্যাসে ['কৃষ্ণকান্তের উইল'] যেমন শিল্পসার্থক হয়েছে তেমন বোধকরি আর কোনো উপন্যাসে নয়।"

*—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়*

৩. "একটি সৎ চরিত্রবান আদর্শ পুরুষ রূপজ মোহে নিজেকে সমর্পণ করলে তার জীবনে পতন ও শূন্যতা যে কত দ্রুত এবং কী নিদারুণ ভাবে আসতে পারে, সেই চিত্রই অতি নিপুণ হাতে অঙ্কিত করেছেন বঙ্কিম এই উপন্যাসে।

*—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য*

৪. "রোহিণী মরিল তাহার মত ইতর ও লালসাময় প্রেম বাঁচিতে পারে না বলিয়া। রোহিণীর অন্য কোনও সুখী পরিণাম, উপন্যাসের চরিত্রকল্পনা ও বিষয়বিন্যাসের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সম্ভব মনে হয় না।"

*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

৫. "রূপবান গোবিন্দলালকে দেখে যে রোহিণী একদিন বাণবিদ্ধ কুরঙ্গীর মতো আর্ত হয়ে প্রাণবিসর্জনের সংকল্প করেছে, কিন্তু সংযম হারা হয়ে, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কোনো হঠকারী আচরণ করে বসেনি, সেই রোহিণীই যে হঠাৎ এমন কাঁচা কিশোরীর মতো দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে নিশাকরের ফাঁদে পা দেবে, এ জন্যও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রস্তুত করেননি।"

*—সত্যেন্দ্রনাথ রায়*

৬. "রোহিণী যে আয়তলোচন মৃগ দেখলেই তার প্রতি শরসন্ধান করবে, সুন্দর পুরুষ দেখলেই স্থানকালপাত্র ভুলে তার পশ্চাদ্ধাবান করবে, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের প্রস্তুত করেননি।"

*—সত্যেন্দ্রনাথ রায়*

৭. "সে [রোহিণী] পাপিষ্ঠা, তাই পপিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া চাই এবং হ'লও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যুতে . . . ।"

*—শরৎচন্দ্র*

৮. "রোহিণীর চরিত্রাঙ্কন কালে বঙ্কিম নারী-সম্পর্কিত আধুনিক ধনবাদী সংস্কৃতির শিক্ষালব্ধ ধারণা ও যে-পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন সেই সমস্ত-ঐতিহ্যাশ্রিত জীবন-চেতনার দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েছেন। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে অবশ্য বঙ্কিমের শিল্পীপ্রতিভা রোহিণীর চরিত্রাঙ্কনে আপন প্রকাশ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে।"

*—জয়ন্তকুমার ঘোষাল*

৯. "রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রহিল না।"

*—শরৎচন্দ্র*

১০. "রোহিণী প্রথম উপস্থাপনা থেকে শেষ পরিণাম পর্যন্ত এক অখণ্ড ন্যায়-পরম্পরায় গঠিত। সে ন্যায়-পরম্পরাকে খণ্ডিত করার ক্ষমতা বুঝি বিধাতারও ছিল না।"

*—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়*

১১. ". . . রোহিণীর প্রসঙ্গে প্রেমের প্রশ্ন উত্থাপন করলে রোহিণীকে অনেকখানি সীমায়িত পরিসরের মধ্যে টেনে আনা হয়। রোহিণীর তৃষ্ণা কেবলমাত্র প্রেম-তৃষ্ণা নয়। রোহিণীর তৃষ্ণাকে এককথায় নাম দেওয়া যেতে পারে জীবনতৃষ্ণা।"

*—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়*

১২. "দাম্পত্যে নিষ্ঠা শুধু নারীর কর্তব্য, পুরুষের জন্য অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা— এই মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল ধারণার মূর্ত প্রতিবাদ নগেন্দ্র-গোবিন্দ। নিজেদের সুখ দিয়ে জীবন দিয়ে সে কথার প্রমাণ তারা রেখে গেল।"

*—ক্ষেত্র গুপ্ত*

১৩. "দ্রুত কাহিনী সমাপ্ত করতে লেখক রোহিণীকে অবিশ্বাসিনী করে পিস্তলের মুখে সঁপে দিলেন। অথচ গোবিন্দ-রোহিণীর প্রসাদপুরের জীবনের বিস্তৃত বিবরণে কিছুকাল ব্যয়িত হলে দুজনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই পরিণতিই ঘনিয়ে আসত, —তার সব সম্ভাবনা বীজাকারে থেকে গিয়েছিল। তবুও যা পেলাম, রোহিণীর সেই মৃত্যু— তাতে শিল্পের স্খলন ; সেখানে লেখকের রক্ষণশীল নীতিবাগীশতা আবিষ্কারের সুযোগ নেই।"

*—ক্ষেত্র গুপ্ত*

১৪. "রোহিণীর অতর্কিত মৃত্যু, লেখকের প্রথমাবধি উদ্দেশ্যানুযায়ী হইলেও, Bad art ; কেননা এই পরিণতির জন্য লেখক পাঠকের মনকে যথেষ্ট ভাবে প্রস্তুত করেন নাই।"

*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

১৫. "গ্রন্থের সর্বত্রই একটা সংযত ভাব-প্রকাশ, একটা পরিমিত সামঞ্জস্যবোধ, একটা নির্দোষ ঘটনা-বিন্যাসশক্তি, ও একটা বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় ক্ষিপ্রগতি ও উজ্জ্বল বুদ্ধির নিদর্শন দেদীপ্যমান। গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ যেন নিয়তির অদৃশ্য রজ্জুর এক একটি পাক; তেমনই এই বন্ধন যেন কাটিয়া কাটিয়া আমাদের হৃদয়ে গভীরতর ভাবে বসিয়াছে।"

*—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*

১৬. "এই উপন্যাসে একদিকে অকৃত্রিম আন্তরিক প্রণয়, অপরদিকে দুরন্ত রূপবহ্নি প্রজ্বলিত করে বঙ্কিম দেখাতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত কে কার কাছে কি ভাবে পরাজিত হয়, অথবা কি ভাবে জয়লাভ করে।"

*—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য*

১৭. "লেখকের পূর্ব-পরিকল্পনার জের যদি রোহিণীকে ক্রমশ ইতরতার দিকে, পতনের দিকে না ঠেলত, লেখক যদি ক্রমাগত রোহিণীর মূল্যহ্রাস না ঘটাতেন, রোহিণীকে পিশাচীতে পরিণত করার দায় গ্রহণ না করতেন, তাহলে এ কাহিনী অনেকটাই পাল্‌টে যেত।"

*—সত্যেন্দ্রনাথ রায়*

১৮. "বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ে প্রথমদিকে রোহিণীতে যে সব বদল ঘটালেন, শেষের দিকে রোহিণীতে তার সঙ্গে সংগতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করলেন না। চরিত্র পাল্টালেন, প্লট পাল্টালেন না।"

*—সত্যেন্দ্রনাথ রায়*

১৯. "ক্লিওপেট্রার যে প্রেম তা যত ঐশ্বর্যবানই হোক একনিষ্ঠ নয়। রোহিণীর চরিত্র আলোচনায় রমণী হৃদয়ের এই বৈশিষ্টটুকু মনে রাখতে হবে।"

*—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত*

## ১৭.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১. 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নায়িকা কে, রোহিণী না ভ্রমর? বিচার করুন।

২. 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের নিরপেক্ষ শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে কি? দুটি খণ্ডের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বিষয়টি বিচার করুন।

৩. 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা ও নৈতিকসত্তার দ্বন্দ্ব দেখা যায় কি? এই দ্বন্দ্ব কীভাবে উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝিয়ে দিন।

৪. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কয়েকটি গৌণ চরিত্র আলোচনা করে দেখান যে সেগুলি উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা-ধারায় কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে।

৫. জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের বারবার উইল পরিবর্তন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ঘটনাধারায় যে সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করেছে তা বিশ্লেষণ করুন।

৬. "রোহিণী মরিল তাহার মত ইতর ও লালসাময় প্রেম বাঁচিতে পারে না বলিয়া। রোহিণীর অন্য কোনও সুখী পরিণাম, উপন্যাসের চরিত্রকল্পনা ও বিষয় বিন্যাসের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, সম্ভব মনে হয় না।" সমালোচকের এই মন্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য বিচার করুন।

৭. যে রোহিণী চরিত্র-বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব শিল্পসৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার পরিণতি আকস্মিক, অসংগত ও শিল্পবিরুদ্ধ হয়েছে। এ-বিষয়ে আপনার মতামত যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করুন।

৮. "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে জটিল আখ্যায়িকার পক্ষপাতী ছিলেন, পরে সরল অমিশ্র কাহিনীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যায়। প্রথমযুগের সবকয়খানি উপন্যাস, দ্বিতীয় যুগের এক 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছাড়া অন্যসব উপন্যাস জটিল।" — 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের গঠন কৌশল তথা শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করে উপরোক্ত মন্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করুন।

৯. "একটি সৎ চরিত্রবান আদর্শ পুরুষ রূপজ মোহে নিজেকে সমর্পণ করলে তার জীবনে পতন ও শূন্যতা যে কত দ্রুত এবং কী নিদারুণভাবে আসতে পারে, সেই চিত্রই অতি নিপুণ হাতে অঙ্কিত করেছেন বঙ্কিম এই উপন্যাসে।" এই মন্তব্যের আলোকে গোবিন্দলাল চরিত্রটি বিচার করুন।

১০. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের চরিত্রসমূহের তীব্র মানসিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশ কীভাবে হয়েছে, বোঝান।

১১. গোবিন্দলাল ও রোহিণীর জীবনের ট্র্যাজেডির সঙ্গে বারুণী পুষ্করিণী ও তার রমনীয় পরিবেশের কীরূপ যোগ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখান।

১২. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কে? বিচার করুন।

## ১৭.৫.১ সংক্ষিপ্ত উত্তরদিন / টীকা লিখুন

ক. "রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে— সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।" —প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য নির্দেশ করুন।

খ. টীকা লিখুন -- যামিনী, নিশাকর, পোস্টমাস্টার।

গ. উপন্যাসের 'পরিশিষ্ট' অংশের প্রয়োজনীয়তা বিচার করুন।

ঘ. "একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি ; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।" —উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

ঙ. 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের ক্ষীরি চাকরানী চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

চ. "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও— আজ আমার ফুলশয্যা। --প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উক্তিটির তাৎপর্য নির্দেশ করুন।"

ছ. "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।" —উক্তিটির আলোকে বক্তার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিন।

## ১৭.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)


১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা— সত্যেন্দ্রনাথ রায়

৪. বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং— ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. বঙ্কিমচন্দ্র : আধুনিক মন— ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. বঙ্কিমচন্দ্র— সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি— ক্ষেত্র গুপ্ত

৮. বঙ্কিমবিদ্যা— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

৯. উপন্যাস শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র— অরূপকুমার ভট্টাচার্য

১০. বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা— জয়ন্তকুমার ঘোষাল

১১. বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্— নবেন্দু সেন

১২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস— সুকুমার সেন।

* * *